অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ

নালক। বুড়ো আংলা। রাজকাহিনী। শকুন্তলা। ক্ষীরের পুতুল





শিশুসাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট। তিনি তো শুধুই লেখেন না, ছবিও লেখেন।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বড়, না শিশুসাহিত্যিক 'ওবিন ঠাকুর' তাঁকে ছাপিয়ে গেছেন, এ এক বিষম বিতর্কের বিষয়।
অবনীন্দ্রনাথের অনেক বই, অনেক ছবি। কিন্তু তাঁর সেরা বই, ছোটদের মহলে সমাদৃত বই কোনগুলি এ প্রশ্ন করলে যে পাঁচটি লেখা একনিঃশ্বাসে সাত থেকে 'সত্তুরে' ছোটরা বলে যাবেন, তারা হল—নালক, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী, শকুন্তলা এবং
ক্ষীরের পুতুল!
অবনীন্দ্রনাথ বা ওবিন ঠাকুরের এই পাঁচটি সেরা 'ছবি'র লেখা নিয়েই পত্র ভারতীর নিবেদন 'শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ'।

শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

অতুলনীয় অবনীন্দ্রনাথ। কারও সঙ্গে মেলানো যায় না তাঁকে। অনন্যতায় উজ্জ্বল। শুধু ময়মনসিং-মশুয়ার রায়চৌধুরী পরিবারেই শিশুসাহিত্যের চর্চা চলেনি, চলেছে জোড়াসাঁকোতেও। অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো-বাড়ির সেরা ছোটোদের লিখিয়ে নন, সামগ্রিকভাবে শিশুসাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট তিনি।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ-সৌদামিনীর তৃতীয় সন্তান। গুণেন্দ্রনাথের পিতা গিরীন্দ্রনাথ। মহর্ষির তিনি অনুজ, দ্বারকানাথ-দিগম্বরীর চতুর্থ সন্তান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের আপনজন, স্নেহ-মধুর খুড়ো-ভাইপোর সম্পর্ক। 'রবিকাকা'-র প্রেরণাতেই শুরু হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যচর্চা। জোড়াসাঁকোর বালক-লেখকদের কথা ভেবে একদা পরিবারের বধূমাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পত্রিকা-প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। বেরিয়ে ছিল 'বালক'। 'বালক'-এ ঠাকুরবাড়ির অনেকেই লিখেছেন, লেখেননি অবনীন্দ্রনাথ। 'বালক' যখন প্রকাশিত হয়, অবনীন্দ্রনাথের তখন বছর চোদ্দো বয়েস। লেখায় নয়, মগ্ন ছিলেন তখন তিনি ছবি আঁকায়। ছেলেবেলাতেই শুরু হয়েছিল তাঁর চিত্রচর্চা।

ছবি-আঁকার প্রতি দিনে দিনে আগ্রহ বেড়েছে। আর্ট স্কুলের ছাত্র, হ্যাভেল-গিলার্ডি ও পামারের কাছে নিয়েছেন চিত্রচর্চার প্রশিক্ষণ। ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন নিজেকে।

আর্টিস্ট অবনীন্দ্রনাথ আকস্মিক মন দিয়েছিলেন সাহিত্যচর্চায়। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ভিন্নতর জগতে তাঁর এই পরিক্রমা। শুরুতেই প্রবল সাফল্য। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। যেমন করে মুখে মুখে গল্প শোনান, তেমনভাবেই লিখে ফেলতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'রবিকাকা'-র কথায় 'এক ঝোঁকে' অবনীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেছিলেন 'শকুন্তলা'। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বাল্য গ্রন্থাবলী'-র প্রথম বই হয়ে বেরিয়েছিল শকুন্তলা। দ্বিতীয় বই রবীন্দ্রনাথের 'নদী'। তৃতীয়টিও অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'।

'শকুন্তলা'-র উৎস প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য। 'ক্ষীরের পুতুল'-এর গল্পটি অবনীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন কবি-পত্নীর রূপকথার খাতা থেকে। রবীন্দ্রনাথের

কথাতেই একটি খাতায় রূপকথার গল্প সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন মৃণালিনী দেবী। 'নালক'ও 'শকুন্তলা'-র মতো প্রাচীন সাহিত্যাশ্রিত। জাতক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'রাজকাহিনী'-র গল্প-উৎস খুঁজতে আমাদের যেতে হবে টডের রাজস্থানে। 'বুড়ো আংলা'-র উৎস খুঁজতে তো পৌঁছে যেতে হয় সুইডেনে। দেশি-বিদেশি যে কাহিনী-ই অবনীন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছেন, আপন মনের মাধুরীতে তা সব সময়ই হয়ে উঠেছে আশ্চর্য মৌলিক। 'বুড়ো আংলা' পড়তে গিয়ে কখনোই মনে হয় না, দেশান্তরের গল্প। রিদয় একান্তই আমাদের ঘরের ছেলে।

অবনীন্দ্রনাথের গল্প বরাবরই মুখের ভাষায়, কথকতার ভঙ্গিতে লেখা। গল্প-বলার এই মেজাজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তৈরি আশ্চর্য সব ছবি। শব্দ সাজিয়ে ছবি তৈরিতে অবনীন্দ্রনাথ অনবদ্য। নিজেই তো বলেছেন, 'ওবিনঠাকুর ছবি লেখে।'

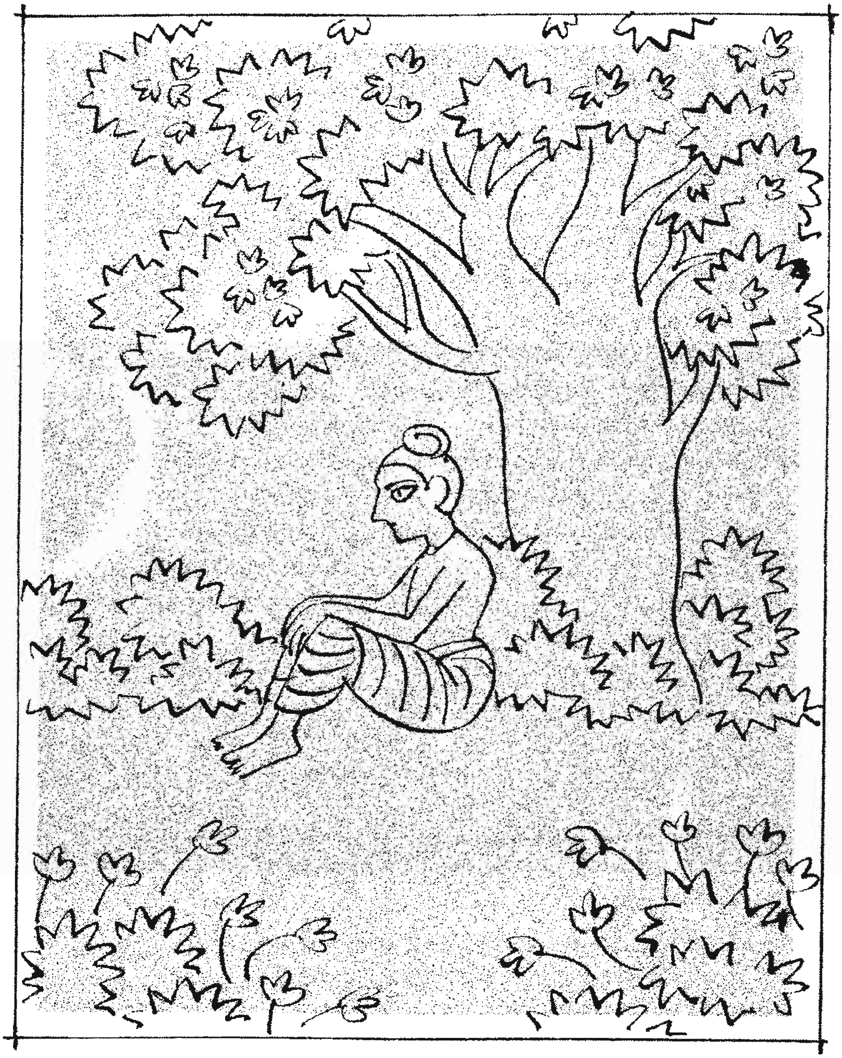
ভাষা যেন কথা বলে। কখনও দুঃখে মুষড়ে পড়ে, কখনও আনন্দে নৃত্য করে। মাধুর্যময় গতিশীল গদ্যে অবনীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি বই লখেছেন। 'হানাবাড়ির কারখানা'-র পাশাপাশি রয়েছে পুঁথি-যাত্রাপালা, অনেক গল্প, কিছু ছড়াও। লোকায়ত ছড়া-সংগ্রহে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আছে আরও কয়েকটি বই। তাঁর 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' ঠাকুরবাড়ি-সম্পর্কে জানার প্রধান অবলম্বন। এই বই দুটি অবশ্য অনুলিখিত রচনা। অবনীন্দ্রনাথ মুখে মুখে বলেছিলেন, লিখে রেখেছিলেন রাণী চন্দ।

অবীন্দ্রনাথের অনেক বই। নয় খণ্ডে রচনাবলীও বেরিয়েছে। তাঁর সেরা বই, ছোটোদের মহলে সমাদৃত বই কোনগুলি এ প্রশ্নের উত্তরে এই সংকলনে গ্রন্থিত পাঁচটি বইয়ের কথাই বলবেন সকলে। বন্ধুবর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পাঁচটি বই একত্রে গ্রন্থিত করে এক চমৎকার কাজ করলেন। একালের ছোটোরা অবনীন্দ্রনাথকে জানুক, পড়ুক।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

১১ ডিসেম্বর ২০১২
কলকাতা

সূ চি প ত্র



নালক

দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধাকার এপার গঙ্গা ওপার-গঙ্গা।

নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না,গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু একটু আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক-সেদিক, এধার ওধার সে-ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি। আকাশ-জুড়ে কে যেন সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপর আলোর একটি-একটি ধাপ গেঁথে দিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেকো।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি।

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির মঠ। আর ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোধন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে বলছেন, 'মহারাজ কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম। এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়বার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘন্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উঠে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে 'জয় রানীমা' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে-দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢাল-খাঁড়া নিয়ে। রাজার দুইদিকে দুই দালান;

একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাঁদের ঘিরে যত দুয়ারী—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল-পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে, পুঁথি খুলে রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক, কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ঝাঁটা গোঁফ। সকলের হাতে এক-এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন:

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবি। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। অনন্দ কর।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল—'আনন্দ কর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর।' কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার-দেওয়া কণ্ঠ মালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকল। প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে দিতে বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়—কোনোখানে কোনো-কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না। রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর একপারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষ কোটি তারায় আর সন্ধিপুজোয় শাঁক-ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী-সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে-ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডানহাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—

যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারিদিক আলোয়-আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর এক ফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে -লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোধন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে-মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে-ঘরে শাঁখঘণ্টা, পাতালের তলে-তলে—জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত-পা চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পা দুখানি যেখানে-যেখানে পড়ল সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি-একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে উঠল, আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত-সমুদ্রের জল এনে সেই-সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির-ঝির করে ঢালতে লাগল!

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানবে মিলে সেই সাতপদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন—'দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল, বাড়ি চল!' মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল—ছেড়ে দাও মা, তারপর কি হল দেখি! একটিবার ছাড়। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!' সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ। নালককে তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন—'ওকাস অহং ভন্তে।' নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বলছেন—'লেখ অনুগ গহং কত্বা সীলং দেখ মে ভন্তে।' নালক বড়-বড় করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—'সীলং দেথ মে ভন্তে।' কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে। পাঠশালের খোড়ো-ঘরের জানলা দিয়ে একটি তিন্তিড়ী গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড়, আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটায় এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুবকুব করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন-ভন করে উড়ে বেড়ায়—একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময় গুরু বলে ওঠেন,—লেখরে লেখ!' অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খস-খস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না, তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা

করে ডেকে ওঠে। নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো-চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস শন-শন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে-মনে ডাকতে থাকে, ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি। মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক। ঝড়ও আসে, বৃষ্টি নামে , চারিদিক জলে-জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনোদিন কপাটও খোলে না, দেয়ালও পড়ে না—যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুণছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলাবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধুলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে-নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। নমো নমো গৌতম চন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়, নমো শাক্যনন্দনায়।' শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে-মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে—কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়োতে, কেউবা সাত-সমুদ্র-তোরো নদী-পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়!'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পযন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়!' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নামো নমো' বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো' অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নোমো কর, নোমো কর।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখঘন্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে—নমো নমো নমো। রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন—'সুখী হও, মুক্ত হও।'

ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঋষিকে বলছেন—'নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বলছেন—দু'ঃখ কর না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কর না? এস, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

'কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগগহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপুজয়ে।'

নির্মল আকাশের নিচে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন।

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা! গাছের নিচে দেবলঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক-ঝক করছে।

নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশথ-পাতায় মোটা-মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিক-ঝিক করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই, কেবল এক-একবার দেবলঋষি বলছেন—'তার পরে?' আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে: 'রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন রাজার দুই পাশে চার-চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান দুর্বা, শাঁখ-ঘন্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো। 'পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন—রাজপুত্রের নাম হল কি?

ব্রাহ্মণেরা বলছেন—এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেইজন্য এঁর নাম রইল সিদ্ধার্থ; রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্য এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

'রাজা বলছেন—কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণণা করে বলছেন। প্রথম শ্রীরাম আচার্য তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুইদিকেই সমান টান দেখেছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বলছেন—দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বলছেন—হ্যাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন দুইদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ঐ কথা। ভোজ দুই চোখ পাকল করে বলছেন—এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বললেন—দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যায় সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনোদিকেই যাবেন না। স্থিরনিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যেদিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ

দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।'

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে।

আর কিছু দেখা যায় না। সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝক-ঝক করছে—আকাশের নীল ঢেকে বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার-ইঁটে বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখি উড়ে উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে-ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক—যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে, শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, শাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে, শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়; আবার বসন্তে ফুলে-ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে-ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দেয়ালে-ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায় শীতের সকালে বসন্তের পহরে পহরে—কখনো কোকিলের কুহু কখনো বাতাসের হুহু, কখনো বা বিষ্টির ঝর-ঝর, শীতের থর-থর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এস, বাহিরে এস, নিস্তার কর, নিস্তার কর! ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখ চোখের জলে বুক ভেসে গেল দুঃখের বান মনের বাঁধ, ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল। আনন্দ—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো—এই আছে এই নেই; সুখ—সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন—সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল—সে তো চিরদিন থাকে না। হায়রে, সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেক না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এস—নিস্তার কর! জীবকে অভয় দাও!

নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনো বিষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনো ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে, আলো হয়ে ডাকছে—এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে

পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না জীবন-মরণ—রাতে-দিনে মাসে-মাসে বছরে-বছরে নানাভাবে নানাদিকে।

একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কি তাদের আনন্দ। হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে-তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে চল চল, চলরে চল। আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, মেঘ চলেছে শাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিধঁল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশদিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল তীরে-বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ—সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা। এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আসতে চলতে ফিরতে সুখের মাঝে শান্তির মাঝে, কাজে কর্মে আমোদ-আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন—কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না। ছোটর ছোট তার কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।

দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে মেঘের গায়ে-গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে-বনে পাখিরা গ্রামে গ্রামে চাষীরা ঘরে-ঘরে ছেলে-মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন—আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়—সকলি আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে। বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে-ঘরে আনন্দ ছেলে-মেয়ের হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন খেলানায় ঝিক-ঝিক করছে, ঝুম-ঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে-আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, শোক নেই কান্না নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ—ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না।

এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়। বয়েসের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে।

কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না—কেবল দু'খানা পোড়া কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি-গুটি একা! তার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে-মেয়ে বন্ধু-বান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে—আনন্দ থেকে দূরে আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছে থেকে সরে পালাচ্ছে গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে। সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে—'আমাকে দেখ আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই—আনি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার। তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।' দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল—নতুন যা কিছু পুরোনো হয়ে গেল, টাটকা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন—পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে, সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে শাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে-পায়ে গুটি-গুটি-অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা—সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে, সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে, সব শুষে নিয়ে, সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে-হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে—সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে! ফুল-ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে-মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনের বনে-বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে—কানের কাছে প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে,—খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোয় নিচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলোছায়া, তার মাঝে দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুর-ফুরে দখিন বাতাস—জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাইরে—সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনের পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—সারি-গানের তালে-তালে সুখসাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়ছে। সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দুরে পালিয়েছে, আসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে, সুখে

রয়েছে, শান্তিতে রয়েছে।

এমন সময় পর্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাণ্ডাশ মূর্তি —জ্বরে জর্জর, রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না—ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে, কখনো বা গায়ের জ্বালায় সে জল-জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ-দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাণ্ডাশ, হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিবে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা, সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো কাদা-মাখা জ্বরের সে পাণ্ডাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে—ধ্বক ধ্বক! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে, একবার জ্বলছে। বাতাস একবার আসছে, একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনো তিনি শুনছেন, যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায়-পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধ্বক, দ্বক! এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের-নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই-বাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখালছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিনগাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিবকিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশপিদিম,যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসীতলায় দুগগো পিদিম—যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনের পাশে, বন্ধু-বান্ধবের মাঝখানে। ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে 'এল মা ওমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়োরে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে। শূন্য-প্রাণ খালি-বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে-পাওয়া সুরে!

সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে পারে। ভরা নদীর মতো ভরপুর আনন্দ

পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎ-সংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই, কোনো ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে-দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে-ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে, না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোনখানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোন এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খনখন করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে, আছে দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুক ফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরের বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল—সে কান্না!

সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন! আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই পহরে জলে-স্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন শাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে-আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে-ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না—কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দু'খানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো বৃষ্টির এক-একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর। তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—শাদা চাদরে ঢাকা হাজার-হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে কোলে করে, বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে-ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যেদিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হন হন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহা-শ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে দূরে-দূরে, অনেক দূরে—ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার, কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপার-ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে-থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক-একটা দমকা বাতাসে রাশি-রাশি ছাই উড়ে এসে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল শাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাশ করে দিচ্ছে। ছাই উড়ছে—সব জ্বালানো সব-পোড়ানো গরম ছাই। আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা-কিছু যত-কিছু সব ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা-কিছু যত কিছু সব ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে, দূরে দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা

মেঘের মতো। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে হায় হায় হায়রে হায়! সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচু-নিচু ছোট বড় সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটি পাখি উড়ে চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কি আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; শাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্চ্ছা গেছে।

সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় শাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে-রঙে ভরিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা যাবে না? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না-রাত্রি-না-দিন না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পর্দা; তারি ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—শাদা চুল নিয়ে জ্বর কাঁপছে—পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মতো হিম সাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, শাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎ-সংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন-জন্মাতে; বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্ত-মাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা—তিনটে শিকারী কুকুরের মতো ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, দাঁতে নখে যা-কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো-টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—আগড় ভেঙে, শিকড় ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা। ছোট-বড় সব উড়ে চলছে—ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে—সব নিবে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না। আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়, জলে-স্থলে ঘরে-বাইরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের

ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি! কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-বিকুলি করছে। হাজার-হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে রক্ষা কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে! এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন আছে যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথার যেন উত্তর দিয়ে আকাশে-বাতাসে, জলে স্থলে, পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে শব্দ উঠল—বিব্ধ মহিদ্ধিকা—মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকসস লোকসস সব্বে এতে পরায়ণা।

দীপা, নাথা পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু মহাসসাসা, সরণা চ হিতোসিনো!!
মহাপ্পভা, মহাতোজা, মহাপঞ্চা, মহাব্বলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা।।

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন।

মহাপ্রভ, মহাতোজ, মহাজ্ঞানী মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকুলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে-দেখেতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে।— পৃথিবীকে সবুজে-সবুজে পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে-গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে—সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন—সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি না, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো। মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ!

যেমন আর-দিন, সেদিন তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে সেই মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর

ধারে-ধারে কত অজানা দেশের পথে-পথে—একা নির্ভয়ে।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে-সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে-ঘরে সাত রঙের আলোর মালা কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—সে রইল না, সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারের রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব। আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন—'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন—অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

ছন্দক চলেছে কপিলবাস্তুর দিকে—সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে বনের দিকে তপস্যা করতে—দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোট নদী—দেখতে এতটুকু নামটিও তার নমা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে-পার থেকে নামলেন সে পারে ভাঙন জমি—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে-পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে-গাছে ছায়া-করা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল—বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।

নদী—সে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আম-কাঁঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোট-ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে—কখনো পুব মুখে কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে-ধারে ছাওয়া-ছাওয়া মনের আনন্দে। এমন সে-সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এই খানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জামগাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে। তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশো চেলা নিয়ে আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর কতই শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চললেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে

নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে—নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনোদিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারো ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না।

রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না! রাজপথের এপার থেকে ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকান লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারী চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে—ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনো লোকের মন ভরেনি! তারা মণিমুক্তো সোনারূপো ফুলফল চালডাল স্তুপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা-প্রজা ছোট-বড়—সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে-দ্বারে পথে পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনোদিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনারূপো বসন-ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায়-রাস্তায় ছাড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোনো দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য কেবল এক মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের সব দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন। উদরক পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালী পাড়ার চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না।...লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন—'দুঃখ যায় কিসে ?'

উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন—'এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশবিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, এক শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে -ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে।

সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্বার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুণে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল।

তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখছে, গুরুবা যেমন বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন।

কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা—শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন অপস্যা কেউ কখনো করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর এক বিন্দু রক্ত রইল না—দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কিনা।

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে-একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না—যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেছে। সেদিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে-গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল। উরাইল বনে যত পাখি, যত প্রজাপতি, যত হরিণ, যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে-গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে-একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেক দিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে—বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাঁপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ-বেলার সিঁদুর আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া বসনের মতো।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে দিচ্ছে। সেইসময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন—শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে-আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চললেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন—'প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পারলেন কি?' সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বললেন, না,—এখনো না।' অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন—'প্রভু, তবে আর-একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন—দুঃখের শেষ আছে কিনা। সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—'নারে! নারে! নাইরে নাই!'

কৌণ্ডিন্য বললেন—'জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু?' সিদ্ধার্থ বললেন—'পথের সন্ধান এখনো পাইনি, কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগাযোগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীর সবল

রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর মনকে বেশি আরাম দেবে না, বেশি কস্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারবে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজে না, তেমনি শরীর মনকে আরাম আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগাযোগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য বিলাসে তাকে নিষ্কর্ম বসিয়ে রেখেও লাভ নেই—মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।'

সেদিন থেকে শিষ্যরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাইমাখা, আসন-বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধুনী ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো, খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনমতো হল না।

তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে, শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে—কখনো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দু-হাত আকাশে তুলে কখনো হেঁটমুণ্ড হয়ে দু-পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটি কুল, তারপর সারাদিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে এককোঁটা জল, তারপর তাও নয়—এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে।

শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জন। ঘন-ঘন শাল-বন সেখানটা দিনরাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় একটা আসে না; দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোট-মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুল—ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে তখন কোনে-কোনো দিন তারা যেন দেখেতে পায় -গেরুয়া কাপড়-পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো-কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছের তলা আলো সোনার কাপড়-পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন! কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনো দিন দেখেনি—পুন্না ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর।

সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক-বছর বটতলায় রোজ ঘিয়ের পিদিম নিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন। সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে

একটি সোনারচাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক-বছর সে আসছে, কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছায়ার মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে-গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের ক'মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো—যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ-কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনোদিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি কথা কন তবে যেন পুন্না বলে—দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে, আমার বাবাকে, আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভালো রেখ। বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা! পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে, সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে-মাঝে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রামগুলি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়,—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে, মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ির শাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রূপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠান্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে-ঘুরতে আস্তে-আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ—একটার পিঠে মস্ত-একগাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে 'আরে রে পুন্না রে!' ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম-পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেই দিকে চলে গেল। তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না—দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া-বসন-পরা দেবতা এসে গেছে তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে।

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন

গরুর-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে—'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন—'যদি মনে পড়ত তবে কি চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বুঝি?'

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত-থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে—দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন—তুই গোটা কতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা চল, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন—'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে-আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে-পিছনে ছেলে-কোলে পুজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু-একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন—'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে রাত পোহাতে অনেক দেরি—কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া শাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে-ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু-বনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু-একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিংপাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপ-ঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নিচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথায় আধখানা আকাশ আলো করে

দিয়েছে সকালের রঙে। সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পুজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনো বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপরে বিছিয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে-ধোয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ-পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন,—স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ দেখবই-দেখব—সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তখন 'মার'——যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায় কুকর্ম করায়—সেই 'মার'-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার শব্দে বুদ্ধের দিকে।

চারিদিকে আজ 'মার'-এর দলবল জেগে উঠেছে। তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধূলা—জল-স্থল-আকাশের দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। পুর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পর্দা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পুর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে-নিবে যাচ্ছে।

আকাশকে এক-হাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, 'মার' আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর—যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তরোয়াল, মাথার মুকুটে দুলছে 'মার'-এর প্রকাণ্ড একটা রক্ত মণির দুল, তার কানে দুলছে মোহন কুণ্ডল, তার বুকের উপর জ্বলছে অনল-মালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা।

বুক ফুলিয়ে 'মার সিদ্ধার্থকে বলছে—"বৃথাই তোমার হতে তপস্যা। উত্তিষ্ঠ—ওঠো! কামেশ্বরোহস্মি—আমি 'মার'। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহ্যবিষয়স্থং বচং কুরুস্ব—ওঠো চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা কর না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর;

তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নেই।'

সিদ্ধার্থ 'মার'-কে বললেন—'হে 'মার'! আমি জন্ম-জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি-তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এই প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

তিনবার 'মার' বললে—'উত্তিষ্ঠ, চলে যাও অপস্যা রাখ।' তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, 'না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই, রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে সে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মতো দু'পাটি শাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মার এর দল; চন্দ্র সূর্য ঘুরচে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশদিকে অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—'মার'-এর দল ঘুর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো। পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বন-বন শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো; লক্ষ-লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকের পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা আঁজলা-আঁজলা ছড়িয়ে পড়েছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশেপাশে। উরাইল-বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমন কি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে; জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুন মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শানিয়ে মশাল জ্বালিয়ে, দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘুর্ণিবাতাসে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে 'মার ডাকছে—'হান! হান!'

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মার'—এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'। তার ধুলোমাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ জোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে-দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থর-থর কাঁপছে। মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে

লাগল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন-উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল।

আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ জুড়ে উঠেছে 'মারীর আর্তনাদ, 'মার'-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ।

তখন রাত এক প্রহর। 'মার'-এর দল, 'মারী'-র দল উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্ত-আঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে—যেন দুখানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে 'মার' দু'হাতে দুটো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে—'পালাও, পালাও এখনো বলছি তপস্যা রাখ!' বুদ্ধদেব 'মার' এর দিকে চেয়েও দেখেছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না। 'মার'-এর মেয়ে 'কামনা' তার ছোট দুইবোন 'ছলা-কলা' কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাত-জোড় করে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর মন গলাবার, ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য। যে 'মার'-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ—সেই 'মার'-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে 'মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে। বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই। দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেছে।—নরকের নীচে, ঘোর অন্ধকারে, চারিদিক কালো করে দিয়ে। বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন, ধ্যান ধরে পহরের পর পহর। রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু 'মার'-এর ভয়ে তখনো পৃথিবী এক-একবার কেঁপে উঠছে—চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না। সেই সময় ধ্যান ভেঙে 'মার'কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধ দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ-হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাতরঙের আলো। সেই আলোতে জগৎ-সংসার আনন্দে জয়-জয় ধ্বনি দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। বুদ্ধের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি একূলে-ওকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারাল খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নিচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড়-বড় সব গুহা-গর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরই গাছে-গাছে-ছায়া-করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা একটিবার

বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তাঁরা আর বার হন না। দেবলঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না—রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না। সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনো আষাঢ়স্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুল তখনো আস্তে-আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোট-ছোট সবুজ পাখিগুলি এখনো যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা শাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলি নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে—সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টানছে—সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে। সেই তেঁতুলগাছের ছায়া-করা মাটির ঘরে তাঁর মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে! দেবলঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে। আজ সে কত-বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে;মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায় কি না-যায়। সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে -দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে 'যাবে গো!' বলে ডেকে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে—অনেকদূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে—নদীর জলে একটি ছোট পিদিম ঝিক-ঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকো আসবে না। নালক মনে-মনে দেবলঋষিকে প্রণাম করে বলছে—'ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।'

দেখতে-দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোট নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সেই সময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে-ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে। পুরোনো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নুতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মতো জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটি আলোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটি আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে-দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে

গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব ডুবিয়ে দিয়েছে।

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস। ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে-ধারে বাঁশঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থৈ-থৈ করছে জল! খালবিল খানা-খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে—বর্ষাকালের নূতন জলে! নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে-ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে-মনে বুদ্ধদেবকে পুজা করে মাঝ-নীদতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে-ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন।

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারি দাঁড়িয়ে গাইছে—

'এরে ভিখারি সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!'





বুড়ো আংলা

আমতলি

রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুর-ছানা বেরাল-ছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ার-ঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া—এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ,সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলি গাঁয়ের প্রজা। দুজনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বারো বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ; কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালা বন্ধ কয়েদ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে-গাছে আমারে বোল আর কাঁচা-আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলীশাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে-ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত বন যেন পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে; রোদ পাতায়-পাতায় কাঁচা-সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে! রিদয়ের কুলুপ-দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামির ফন্দি আটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদামতলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেরাল-ছানাটা কাঁঠালতলায় কাঠবেরালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল ঘরের কপলে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে-লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা হৃদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রঙ একটা ছোট কি পাখি এসে শিস দিতে লাগল—রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—'ও হিরিদয়! ও হিরিদয়!' রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিকে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিটখিট খিটখিট করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি।

সে পাখিটাকে ছুঁড়ে মারবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত দুটো মরচে-পড়া তালা-আঁটা সুঁদরি কাঠের উপরে পিতলের পাৎ আর পেরেকের নক্সা-কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল-মাটির গণেশ ছোট ঢোলক বাজাচ্ছেন, ঠিক তারি নিচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এতবড় যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদী!

এই সিন্দুকে কি যে আছে, তা রিদয় এ পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা-কিছু ভালো দামী আশ্চর্য সামগ্রী এই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা ধানের শিষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, টিপটিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন—'দেখিস, সিন্দুকে গা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!'

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক-একদিন ভাদ্দর মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে তার থেকে ভারি-ভারি রুপোর গয়না, বেনারসী শাড়ি, কাঁসারবাসন বার করে ঝেড়ে-পুঁছে যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন, কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কি, রিদয় এ পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেলে না। সে দু'পায়ের বুড়ো-আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে-ধরা তালা দুটোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও রিদয় পেরে ওঠেনি। তালা দুটোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেই সঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালাটা কি করে ভাঙা যায় ভাবতে-ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও ঢুলে এল।

সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে গণেশ মোটা-পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে-দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে-তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনো দেখেনি।

এই বুড়ো-আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি-বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে মাথাটি শাদা, শুঁড়টি ছোট-একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কানদুটি যেন ছোট দুখানি কুলো তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রুপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ-আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর; মোটা-সোটা একটি এতটুকু দুটি পায়ে আংটির মতো ছোট-ছোট ঘুঙুর, গোলগাল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্টো ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সমসকৃতে গণেশ-বন্দনা করতেন ঃ

গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব-স্থূলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর।।

হেলে শুন্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভালো খেলা খেল দয়াময়।।

এই বন্দনা শুনে সে গণেশকে মনে করেছিল না-জানি কতই বড়! একেবারে পদভরে মেদিনী কম্পমানা! মেঘ গর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে—তালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা শুঁড় দোলাতে-দোলাতে কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গণেশ যে গণেশদাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোট, ঢোলকটি মাদুলীর চেয়ে বড় নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁদুরটির চেয়ে একটু ছোট, এটা রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক-খাঁচা বিলিতি-ইঁদুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁদুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে-মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গণেশ-ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গণেশকে গিয়ে চেপে ধরে—যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা-বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল, কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারলে গণেশ এত ছোট যে চেপ্টে যাবার ভয় আছে, পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায় কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল; আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগাতে পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সেঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না; চারদিক দেখতে-দেখতে কোণে ঠেসানো চিংড়ি-মাছ-ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দু'হাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু'হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে-সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ করে কুঁড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া!

ইঁদুরটা টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন ঢুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উল্টে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই!

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু-পা আকাশে ছুঁড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন—'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি।' কিন্তু দাঁতে-শুড়ে ঢোলকে-জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে-হাঁপাতে মা-দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন। সেই সময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে-আস্তে এসে কটাস-করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে-দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন ঃ

মার-মার ঘের-ঘার হান-হান হাঁকিছে,
হুপ-হাপ দুপ-দাপ আশ-পাশ ঝাঁকিছে!
অট্ট-অট্ট ঘট্ট-ঘট্ট ঘোর হাস লাগিছে,

হুম-হাম খুম্‌-খাম ভীম শব্দ ভাষিছে!
উর্ধ্ব বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,
লম্ফ-ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ-দন্ত লাড়িছে!
পাদ-ঘায় ঠায়-ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,
খণ্ড খণ্ড লণ্ড-ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ উঠিছে!
হুল-থুল কুল-কুল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে,
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে!

দেখতে-দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়মড় করে বললেন,—এতবড় আস্পর্দ্ধা! —ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি-মাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোকে তুই, তেমনি ছোট বুড়োআংলা যক্‌ হয়ে থাক। বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাত-হাত দূরে ঠেলে ফেলে ভুল করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে-দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে উঠে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, মেঝেতে ভাঙা-গণেশের একরাশ রাঙামাটি ছাড়ানো রয়েছে। গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে সিন্দুকটা এত বড় হয়ে গেছে আর সে এত ছোট হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল। মাথার উপর কড়িকাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনো সে বড়ই আছে। যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাকে উল্টে ফেলে বললে—"ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন তুই ছোট হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি!"

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো-আঙুলের মতো ভয়ানক ছোট হয়ে একেবারে বুড়ো-আংলা হয়ে পড়েছে। রিদয় প্রথমটা ভাবলে সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু তিন-চার বার চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটুও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায় এখন?

গণেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন—যক্‌ হয়ে থাক! কিন্তু যক্‌ বলে কাকে? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোট থাকা? না, আর-কিছু ভয়ানক হবে?

অন্য ছেলে হলে ভয়ে-ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক্‌ কাকে বলে কারো কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোট হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টুবুদ্ধিও ছোট হয়ে গেছে। কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে-মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল—'ঠাকুর, এবারকার মতো

মাফ কর। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক্ কাকে বলে, বলে দাও।' কিন্তু গণেশ কোনো সাড়া-শব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারি চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোট আর ভালোমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গোঁফ-ফুলিয়ে কাছে এসে বললে—' কেমন! যেমন কর্ম তেমনি ফল! এখন থাকগে পাতালে যক্ হয়ে অন্ধকারে বসে! আর আলোতেও আসতে পাব না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না।'

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড়-একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চুপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে—'ভাই, যক্ কি রকম?'

ইঁদুর উত্তর করলে—'সেকালে লোক ছেলে-পিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক্ বসাত—জোঁক বসানো নয়, যক্ বসানো। আগে সব বাড়িতে একটা করে চোর-কুটরী ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোর-কুটরীর নিচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়োর মতো অন্ধকার জায়গায় লোক কখনো-কখনো যক্ বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্টু ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভালো কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতাল-পুরীতে এক থালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না-খেয়ে, দানধ্যান না করে যে-সব ধন-দৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নিচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—'এই যকের ধন তুমি আগলে থাক। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়।' হ্রিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে বলে উঠল—'তারপর?'

'তারপর আর কি? দু'চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে যেত। পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেই সময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা ছেলের ফাঁকা-মাথার খুলিটার মধ্যে বাস বেঁধে ধন-দৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক্ হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলি কাঁদত আর....'

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশ-পোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইঁদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে—'শুনলে তো? এখন ছেলে-ধরা তোমাকে দেখেছে কি ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এইবেলা, মানুষের কাছে আর এগিয়ো না, ধরা পড়লে মুশকিল।' বলেই ইঁদুর কুলঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে—'আর কি আমি মানুষ হব না?'

ইঁদুর হেসে বললে—'গণেশঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।'

রিদয় আরও ভয় পেয়ে শোধালে—'গণেশ গেলেন কোথা? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাপ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি

কোনো দিন সন্দেশ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছি-মিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশো দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গাস্নান করব।'

এমনি ভালোমানুষ হবার যত-কিছু প্রতিজ্ঞা কোনোটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না। কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন রিদয়ের বাড়িও তেমনি ছিল—'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে।' ঘরের দাওয়া থেকে নেমেই একহাত-অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজ-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে পেতে রাস্তা হয়েছে—পুকুর-পাড়ে যাবার গোয়ালে যাবার হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন জলে সব ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আর যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু'টুকরো নারকোল গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনো থেকে-থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড় নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক-আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেতেন বেরাল ছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উল্টে-পাল্টে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো-আংলা ডিগবাজি-খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল—'ছি-ছি! ও হিরিদয় হল কি? ছি-ছি!' অমনি কুবোপাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল—'দুয়ো, বেশ হয়েছে, দুয়ো!' আর অমনি চারদিক থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি, মুরগির ছানা, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমনি সব ঘরের আশপাশের পোষা-পাখি বুনো পাখি, মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিরে চেঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল—'ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা, দেখ-দেখ! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে! বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-বুড়ো-আংলা! ও হিরিদয় হল কি?' কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে—'কি হল' চড়াই ল্যাজ নেড়ে বললে—' একি, যক্ নাকি?'

রিদয় যখন মানুষ ছিল তখন পাখিদের কিম্বা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত না, কিন্তু যক্ হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কুঁকড়ো বললে—'কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে?'

মুরগি অমনি বললে—'যেমন দুষ্টুমি, তেমনি শাস্তি হয়েছে! চুরি কর আমার ছানা! এইবারে এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।' বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতি-হাঁস অমনি বলে উঠল—'থাক, থাক, এবার মাপ কর!'

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বলল—'তোর এমন দশা করলে কে?'

রাজহাঁস অমনি নাক-তুলে শুধোলে—'এ্যাঁঃ?'

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে-মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি হাঁস—যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসবে, এটা রিদয় সইতে না পেরে এক ঢিল ছুঁড়ে ধমকে উঠল—'প্যাঁক-প্যাঁক করিসনে বলছি—পালা!'

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি একসঙ্গে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে উঠল—'দুর হ, দূর হ! পালা।' ধাড়ি-বাচ্ছা সব পাখি চারদিকে ঘিরে এমনি চেঁচামেচি করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার যোগাড়! বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাই-পাঁশ মেখে বাঘের মতো ডোরা-টানা এক বেরাল, চান সেরে সেইদিকে আসতে লাগল—'কিও-কিও' বলতে-বলতে! বেরালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালোমানুষের মতো, মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এই ভাবে পায়ে-পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেরাল ষষ্ঠীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয়ই সে জানে, ভেবে রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেরালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেড়াল অমনি ল্যাজ গুটিয়ে সামনে দুই থাবা রেখে গম্ভীর হয়ে বসে চোখ পিট-পিট করতে-করতে যেন রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত রোদে বসে চেটে-চেটে সাফ করতে লাগল—রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জব্দ হয়েছে; সে বেরালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোলে—'বল না মেনি, গণেশ-ঠাকুর কোনদিকে গেলেন?'

মেনি বললে—'গণেশঠাকুর কাছেই এক-জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে বলছিনে বাপু।'

রিদয় আরো নরম হয়ে বললে—'লক্ষ্মীটি, বল, কোথায়? তিনি আমার কি দশা করেছেন দেখছ!'

বেরাল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ-দুটো বড় করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে—'তোমায় দেখে দুঃখ হবে না। আমার ল্যাজে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হুঁ!' বলে বেরাল একবার গা ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে 'দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কি না।' বলে যেমন বেরালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেরাল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কান দুটো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেরাল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেরাল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেরালকে ধরতে গেছে, অমনি বেরাল ফ্যাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উলটে ফেলে, তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত-খিঁচিয়ে বললে—'আমার বজ্জাতি। এখনো বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো আঁংলা কোথাকার। জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!'

বেরাল যে ইচ্ছে করলে এখনি নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দুটি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেরালের নিজ-মূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোট হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে

জল দেখে বেরাল রিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে—'ব্যাস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম—তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি! আর কখনো পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে—যাঃ। বাঘের মাসি বেরাল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়ো আঙুলের মতো দুবার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালোমানুষটির মতো আস্তে আস্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে গোয়াল-বাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপ্‌লে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে হুটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা বলছে—'হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁহুঁ!'

কপ্‌লে গাই বললে—'আমার কানে বোলতা ছাড়া? হুঁহুঁ!'

এই সময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়োরে দেখে কালো গাই লাথি ছুঁড়ে বললে—'খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।'

ধলা বললে—'আয় না, এইবার শিং ধরে নাড়া দিবি!'

কপ্‌লে বললে—'একবার বোলতা নিয়ে কাছে এস না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি।'

কালো—সে সব-চেয়ে বুড়ি, সব-চেয়ে জোরালো গাই, সে বললে—'বড় যে আমাকে ঢিল মারা হত! আবার সেদিন আমাকে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। আয়, একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুধ-দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই, যে তিনি তোর জন্যে না কেঁদেছেন। আয়, আজ একবার তার শোধ তুলব। বাপরে বাপ, কি দুষ্টু ছেলে গো! গণেশঠাকুর—তার সঙ্গে লাগা।'

রিদয় গরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল—যদি তারা গণেশঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনোদিন আর সে কারো কাছে কোনো অপরাধ করবে না? কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না! সে আস্তে-আস্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশু-পাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না! গণেশের দেখা যদিই বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই বা ঠিক কি! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারা রিদয় বেড়ার ধারে মুখ-চুন করে এসে বসল। এ-জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক্ হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না। সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমন কি ভিন-গাঁ থেকে ছেলে বুড়ো সবাই বুড়ো-আংলা দেখতে দলে-দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলো ছাপিয়ে দেবে নিচে বড়-বড় করে লিখে—'আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন—ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!' হয়তো বা কোনোদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিটমারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে যাদুঘরের কাঁচের সিন্দুকে চাবি দেওয়া হবে। রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। আর সে মানুষের ছেলেদের

সঙ্গে খেলতে পাবে না, সবাই তাকে দেখলে যক্ বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘর-বাড়ি—রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখল। খড়ের চাল, ছোট-ছোট তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোট রান্নারঘরখানি; তার চেয়ে ছোট গোয়ালঘর। ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারদিকে চারটিখানি শাক-সবজি। রিদয়দের বাড়ি নেহাত সামান্য-রকমের কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু-ক'খানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল-গাছটি নিয়ে, কি সুন্দরই ঠেকল। যেন একখানি ছবি! অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর ক'খানির উপর কি আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝক-ঝক করছে, ঝুর-ঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটছে, নদী চলেছে—কল-কল, কুল কুল, ফুর-ফুর! চারদিক আজ উলসে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে, সে যক্ হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে! গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক্ হয়ে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস-পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতালপুরীতে সে কিছুতেই যেতে পারবে না! এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর-বেঁধে উঠে দাঁড়াল। এই সময় শেওলায়-পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলী আস্তে আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলী শুধোলে—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?'

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে দাবড়ি খেয়ে টিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর দিলে—'আজ্ঞে, আমি কৈলাস পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশঠাকুরের ছি-চরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

গুগলী উত্তর করলে—'আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।'

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে—'কতদিনে সেখানে পৌঁছবেন?'

'যে কয়দিনে পারি!' বলে গুগলী রিদয়কে শুধোলে—'কৈলাস-পর্বতে তুমি কহন পৌঁছাবে?'

'বোধ হয় দু'চার দিনে।' বলে রিদয় আস্তে-আস্তে গুগলীর সঙ্গে চলল।

গুগলী খানিক চুপ করে থেকে বললে—'আমি বোধকরি দ্যেড় দিনট্যেকের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌঁছে যাব, কি বল?'

রিদয় এবার ঘাড়-নেড়ে বললে—'তা কেমন করে হবে? যে গুটিগুটি আপনি চলেছেন, তাতে ঐ হাঁসপুকুরে পৌঁছতেই তো আপনার একদিন লাগবে?'

গুগলী বললে—'ওহান থিকে না হয় বড় জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সুমুদ্দুর।'

রিদয় হেসে বললে—'তবেই হয়েছে। পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপরে সবজি-ক্ষেত, তার ওধারে তেপান্তর মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম, গ্রামের পর বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তারপরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর—যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড়দিন কি, দেড়-বছরে সেখানে পৌছুতে পারেন কিনা সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান!'

গুগলী ভাবলে রিদয় তারসঙ্গে মস্করা করছে। সে আকাশে নাক তুলে বললে—'আর তুমি ভাবছ দিন চারেকে কৈলাস-পর্বতে যাবা—এই পিঁপড়ার মতো সরু-সরু ঠ্যাং চালিয়ে? যদি দিন রাত চলে যাতি পার তথাপি চার-বছরে তুমি সেহানে পৌঁছতি পার কিনা সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পর-পর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ-নগর, সে-নগর, উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ-ঘাট, ও-ঘাট, সে-ঘাট; এ-মাঠ, ও-মাঠ, সে-মাঠ; এ-বন, ও-বন, সে-বন; তাহার পর উপত্যাকা; উপত্যাকা বাদ পাহাড়তলী, তৎপরে চিত্রকূট, ত্রিকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার সীমাচল তবে হিমাচল। তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলাগিরি, তৎপরে মানস-সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরো ওধারে কৈলাস-পর্বত। এই নদ-নদী পাহাড় জঙ্গল ভাংতি-ভাংতি সেহানে যাওয়া গঙ্গা-ফড়িংটির-প্রায় তোমার কর্ম! পক্ষীরাজঘোড়া যে, সেও সেহানে যাতি পারে না চারি হপ্তায়, তুমি তো তুমি! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বৈসা থাক; কৈলাসের আশা ছাড়ি দেও।'

রিদয় বললে—'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই!'

গুগলীও বললে—'আমিও যেহ্যনে যাত্রা করি বাইরেছি, এই বেদ্ধোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।'

ঠিক সেই সময় খোঁড়া-হাঁস পুকুর থেকে ছপ-ছপ করে উঠে এসে টুপ করে গুগলীটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'মানস-সরোবরে!' বলে হাঁস হেলতে-দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড় সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনো কথা না বলে তার সুবচনী-ব্রত করতে যে খোঁড়া-হাঁস পুষেছিলেন, তারি সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

চলন বিল

মানুষ যেমন, গুগলীও তেমনি হাঁটা-পথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটা-পথের খবরই গুগলী রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটা-পথ যেমন, তেমনি আকাশের উপর দিয়ে জলের নিচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর-দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গরু, গুগলী শামুক—এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেক দিন লাগে। মাছেরা এঁকে-বেঁকে এ-নদী সে-নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরো অল্পদিনে ঠিকানায় পৌঁছায়। আর পাখিরা নদী-ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে—সব চেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানাদিকে নানা-রকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে—এই সব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়। এ ছাড়া বড় পাখিরা যে-রাস্তায় চলে, ছোট পাখিরা সে সব রাস্তায় গেলে, তাদের বিপদে পড়তে হয়—হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল

তার ঠিক নেই!

আবার বড় পাখিদের যে-পথে কম বাতাস সে-পথে গেলে ওড়াই মুশকিল—ডানা নাড়তে-নাড়তে কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়! বাতাসের এক-একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না—শীতে জমে যাবে। কোনো রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ-ছাড়া জোয়ারভাটার মতো অনুকুল-প্রতিকুল দু'রকম হাওয়া বইছে—সেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সেজন্য যে-দিক দিয়ে গেলে বন পাবে,নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দুদণ্ড বসে জিরোতে পারে—এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল করছে। জলে ধোঁয়ায়-ঝাপসা এই সব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয়, না হলে ডানা ভিজে ভারি হয়ে, কুয়াশায় ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে, একদিকে যেতে আর-একদিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝনঝাট বাতাসের পথে আছে। কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝির মতো সব দলপতি-পাখি থাকে। পাণ্ডারা যেমন দলে-দলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে তেমনি এরাও ভালো-ভালো রাস্তার খবর নিয়ে দলে-দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর একধার থেকে আর-একধারে নানা-দেশে নানা-স্থানে।

মানুষ যখন একদেশ থেকে আর-একদেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরিব, এমন কি সন্ন্যাসী সেও এক লোটা, এক কম্বল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দুটো মোয়া, নয়তো দু মুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয়; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে—এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিম্বা জলায়, কোথাও বা চরে, ঘাটে-ঘাটে জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্চাদের জন্যে দুর থেকে পাখিরা মুখে করে গলার থলিতে ভরে খাবার আনে। আর টিয়া পাখি ঠোঁটে ধানের শিষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময়-সময় এদিকে-ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল-বেঁধে যখন তারা পাণ্ডার সঙ্গে দুর-দুর-দেশে যাত্রা করে বেরোয় তখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না—একেবারে ঝাড়া ঝাপটা হাল্কা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্যে দিয়ে বাঁশি দিতে দিতে স্টেশনে-স্টেশনে নতুন-নতুন লোক ওঠাতে-ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনি আকাশ দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে; আর এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-দেশ সে-দেশ এ-বন ও-বন থেকে যাত্রী-পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত এক-দল বেঁধে চলতে থাকে; আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে-দলে যাতায়াত করে ডাক-হাঁক দিতে-দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোট-বড় নানা পাখি!

খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে মানস-সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে-দলে বক, সারস, বুনো -হাঁস পাতি-হাঁস, বালু-হাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এই পাখির দল পুবে সনদ্বীপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দু'ভাগ হয়ে, এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহনা ধরে গঙ্গা-যমুনার ধারে-ধারে হরিদ্বারের পথ

দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে মানস-সরোবর, আর-একদল চলেছে—মেঘনা নদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিংঘাঠা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে, আসামের জঙ্গল, গারো-পাহাড় খাসিয়া-পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে-বাঁকে ঘুরতে-ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙঘা ধবলগিরির উত্তর-গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিম-মুখে মানস সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পুবে ঘুরে পড়েছে মানস-সরোবরে। আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উতর-পুব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস-সরোবরে—যেন বেড়ির দুই মুখ একটি জায়গায় গিয়ে মিলছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দরবন আর আমতলি, মাঝখানে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র সুজলা সুফলা সোনার বাঙলাদেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বেহার অঞ্চল।

সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে আপনার মনেই বকতে-বকতে চলল—'উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিঁড়ে পড়ছে! কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলুম! এতদুরে মানস-সরোবর কে জানে গো—এ্যাঁঃ!' খোঁড়া হাঁস হাঁপাচ্ছে আর চলছে আর বকচে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্গু। সে অনেক কষ্টে খাল-ধারে—যেখানে গোটাকতক বক, গোটাকতক পাতি-হাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলু-ঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল!

রিদয় কি করে? একটা কচু-পাতার নিচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—দলে-দলে হাঁস উত্তর-মুখে উড়ে চলেছে—নানা কথা বলাবলি করতে-করতে? রিদয় শুনলে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে বলতে পথ চলেছে।

সেথো-হাঁসেরা বললে—'থাকে-থাকে ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে!'

অমনি পাণ্ডা-হাঁস যে সবার আগে চলেছে, জবাব দিলে—ছুটলে খোসাবো বাদলা রাখে!'

সেথোরা বললে—"নিচে-বাগে নামল তাল-চড়াই!"
পাণ্ডা উত্তর করলে—"উপরে বড়ই ঠাণ্ডা ভাই।"
সেথোরা বলল—"জাল টেনে মাকড় দিলে চম্পট!"
পাণ্ডার জবাব হল—"এল বলে বৃষ্টি—চল চটপট!"
সেথোরা বললে—"ফুল সব দিল ঘোমটা টেনে।"
পাণ্ডা বললে—"এল বিষ্টি এল হেনে।"
"ছুঁচোয় গড়েছে মাটির ঢিপি।"
"বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।"
"সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।"
"ঝড় জল বুঝি এবার এল।"
"কাক যে বাসায় একলা বড়।"
"গতিক খারাপ, নেমে পড়, নেমে পড়।"

অমনি সব হাঁস ঝুপ-ঝুপ করে খালে-বিলে নেমে পড়ে আপনার-আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে-দেখতে ঝড়ো-বাতাস ধুলোয়-ধুলোয় চারদিকে অন্ধকার করে দিয়ে বড়-বড় গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডাল-পাতা উড়িয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল।

তারপরই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল—খাল-বিল ভর্তি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল; তখন দলে-দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল—আকাশ-পথে আগের মতো বলাবলি করতে-করতে—

"মাকড় আবার জাল পেতেছে!"
"আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।"
"মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।"
"বাদলের ভয় নাইকো মোটে।"
"বনে-বনে ওঠে পাখির সুর।"
"উড়ে চল, পার যতদূর।"
"আকাশ জুড়িল রামধনুকে!"
"চল—গেয়ে চল মনেরি সুখে।"

আগে-আগে পাণ্ডা-হাঁস চলেছে, পিছে-পিছে তীরের ফলার মতো দু'সারি হাঁস ডাক দিতে-দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল—'পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!' বুনো-হাঁসের ডাক শুনে পোষা-পালা খালের বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যখানে ছিল জবাব দিলে—"যে যায় যাক, আমরা নয়।" মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলছে—'যাব না' কিন্তু আকাশ এমনি নীল, বাতাস এমনি পরিষ্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি—ঐ আলো-মাখা হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে হুহু-করে! যেমন এক-এক দল বুনো-হাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা-হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই-পালাই করছে। দু'চারটে বা ডানা ঝটপট করে এক-একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি বুড়ি-হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, 'এমন কাজ কর না, আকাশ-পথে চলার কষ্ট ভারি, পাহাড় দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না।'

বুনো হাঁসের ডাক শুনে সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস উড়ে পড়তে আনচান করতে লাগল। সে বকতে লাগল—"এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে খুঁড়িয়ে চলতে।"

সনদ্বীপ থেকে বালু-হাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস-সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে; এবারে সেই দূর-দূরের যাত্রীরা, আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে-চলতে ডাক দিতে থাকল টানা সুরে—'মানস সরোবর! ধৌলাগিরি!'

খোঁড়-হাঁস অমনি উলু-ঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে—'আসছি, একটু রও একটু রয়ে ভাই, একটু রয়ে চল!' তারপর সে তার শাদা দু'খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু-চার হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল— বেচারা কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া-হাঁসের ডাক বালু হাঁসেরা শুনেছিল বোধ হয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে তারা দেখতে লাগল যাত্রী আসছে কি না। সুবচনীর হাঁস আবার চেঁচিয়ে বললে—'রও ভাই, একটু রয়ে!' তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে—'আমিও যাব' বলে ঝুলে পড়ল।

খোঁড়া-হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময়

হল না, দুজনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া-হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠছে—এমনি বেগে যে মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া-হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে এত উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি—এমনটা হবে।! এখন আর নামবার উপায় নেই—পায়ের তলায় মাটি কতদূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্ছে। রিদয় হাঁফাতে-হাঁপাতে অতি-কষ্টে গাছে চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এমনি গড়ানো হাঁসের পিঠ যে সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায়—রিদয় ক্রমেই পিছনে পড়তে যাচ্ছে! দু'খানা শাদা ডানার ওঠা-পড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন শাদা দুটো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে দুলতে-দুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া-হাঁসের পিঠের পালক দুই মুঠোয় ধরে, দু'পায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হবে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া-হাঁসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এক-কুড়ি একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁক-ডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্যে উড়ে চলা আর এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি-জোড়া দাঁড়ের মতো ঝপা-ঝপ উঠছে-পড়েছে জোরাল ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজ-বিজ করছে! শুনছে কেবল বাতালের ঝপ-ঝপ, সোঁ-সোঁ, আর থেকে-থেকে হাসেঁদের হাঁক-ডাক! উপর-আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলছে, কি মাটির কাছ দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না!

উপর-আকাশে মেন পাতলা-বাতাস যে হঠাৎ সেখানে উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয় কাজেই নতুন-সেখো—খোঁড়া-হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালু-হাঁসের দল নিচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি দুটো রেলগাড়ি পুরোদমে ছুটেছে আর তারি মাঝে এতটুকু—সে দুলতে দুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে-তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে! তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাঙলাদেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশ থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমনি পাঁচ-রঙের ছক-কাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেই সময় বাখরগঞ্জের ধানক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন শতরঞ্জ-খেলার ছক নিচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে—'ব্যস রে? এত বড় খেলার ছক, রাবণে দাবা খেলে নাকি?' অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে—'ক্ষেত আর মাঠ, ক্ষেত আর মাঠ—বাখরগঞ্জ!' তখন রিদয়ের চোখে ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান-ক্ষেত—নতুন শিষে ভরে রয়েছে! হলদে ছকগুলো সরষে-ক্ষেত—সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে। মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনো সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট। সবুজ পাড়-দেওয়া মেটে-মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে-ধারে গাছের সার। মাঝে-মাঝে বড়-বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালী, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরা-টানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর-ঘর পাড়া-পাড়া ভাগ করা

রয়েছে। কতগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে ধারে খয়েরি রঙ—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান—মাটির পাঁচিল-ঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রুপোলি ডোরার নক্সা—আলোতে ঝিক-ঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে-ওখানে কারচোপের কাজ! —যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্চি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে, সে হাততালি দিয়ে বলছে—'বাঃ কি তামাশা।' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল—' সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাঙালাদেশ।'

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালোমানুষটির মতো পিট-টি করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিট-মিট করে একটু-আধটু হাসতেও থাকল—খুব ঠোঁট চেপে। দলে-দলে কত পাখি—কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এ-দল ও-দলকে শুধাচ্ছে—এদিকের খবর, ওদিকের খবর—খবর কি ভাই, খবর কি? অমনি বলাবলি চলল, 'ওধারে জল হচ্ছে। 'এধারে রোদে পুড়ছে।' 'সেধারে ফল ফলেছে।' 'এধারে বউল ধরেছে।' রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ওধারে এখনো কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে, জল হিম; গাছে এখনো ফল ধরেনি। অমনি তারা ঢিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে লাভ কি, বলে তারা এ-গ্রাম সে-গ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে-করতে ধীরে-সুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে-গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্চে। ঘাটিতে-ঘাটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। 'কোন গ্রাম?' 'তেঁতুলিয়া সাবেক তেঁতুলিকা, হাল তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি—খটখটে!' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুরণীর মাঠ—জলে থৈথৈ।' 'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।' কোন হাট?' 'উলোর হাট—খড়ের ধুম।' 'কোন নদী?' 'বিষনদী—ঘোলা জল।' 'কোন নগর?' গোপাল নগর—গয়লা ঢের।' 'কোন আবাদ?' 'নসীরাবাদ—তামুক ভালো।' কোন গঞ্জ?' 'বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।' 'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার—পলতা মেলে।' 'কোন বন্দর?' 'বাগা বন্দর—হুক্কাহুয়া।' কোন জেলা?' 'রুকুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।' 'কোন বিল?' চলন-বিল—জল নেই।' 'কোন পুকুর? 'বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।' কোন দীঘি?' 'রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।' 'কোন খাল?' 'বালির খাল—কেবল চড়া।' 'কোন ঝিল?' 'হীরা ঝিল—তীরে জেলে।' কোন পরগনা?' 'পাতলে দ—পাতলা হ।' 'কোন ডিহি?' 'রাজসাই—খাসা ভাই!' 'কোন পুর?' 'পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।' 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।' 'কার কাচারি?' 'না কর না, ফাটবে হাঁড়ি!'

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো, সব যেমন-যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কি পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ, কোথায় নিরাপদ—কোথায় কি খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত। মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভদ্রপুর' কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ; লোকগুলোও চোয়াড়; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল 'নরককুন্ড'। কোনো দুঁদে জমিদার প্রজার

সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নামী দিয়েছে 'অলকাপুরী'; কিন্তু সেখানে কোনোদিন কারু পাত পড়ে না; শেয়াল কুকুর কেঁদে যায়। পাখিরা মিলে সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়াবাড়ি'। হয়তো একটা পাড়া—সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা; তারা দিনে মালা জপে, রাতে বাড়ি-বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে। সে জায়গাটার নাম মানুষ দিলে 'বৈরাগি পাড়া'; কিন্তু পাখিরা তাকে বললে নিগিরিটিং—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনীই সার। হয়তো এক ভালো পরগনার জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে 'খোলা মুচি'; কিন্তু পাখিরা দেখচে সেখানে ধান খুব, ফল ভালো, ভালো জমিদার; বন্দুক-হাতে শিকারে বেরোয় না; অমনি সে-পরগনার নাম তারা হাঁকলে—'রাজভোগ—সাবেক রাজভোগ—হাল রাজভোগ।' হয়তো 'রাজভোগ' যেমন তেমনি কোনো ভালো পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল—সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভালো জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠি-সোটা। মানুষ সে-পরগনার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশাল-চুলি'।

কোনো কোনো জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভালো মানুষ ভালো আবহাওয়া, ভালো খাওয়া-দাওয়া, খালবিল হাটবাজার গুলজার; সেখানকার কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে হাঁকলে—'মনোহরনগর—সাবেক মনোহরনগর—হালে মনোহর।' এমনি যেখানে পাখিদের সুখ, সে-সব জায়গার নাম এক-এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে—যেমন-যেমন হাঁসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—'সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ।' যেখানে ফলফুলরী ফসল ঢের, সে সব জায়গার কুঁকড়োরা হাঁকছে—''দানাসিরি, লাঙ্গলবাঁধ, উলুর হাট, আনতাজুড়ি জাঙ্গিপুর!' হাঁস—পদ্মনাল এমনি সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এসব জন্মেছে সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে—''সাতনল, নলচিটে, পাতের হাট, বেতগাঁ, বেতাজী, সোলাভাঙা, শাকের হাট।' যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে—'ঝালকাটি কাটিপাড়া, আশাশূন্যি, সন্ন্যাসীহাট।' যেখানে ছায়াকরা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো—'কমলাবাড়ি, ফুলঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলমুখ।' যেখানে ছোট বড় নদ, ছোট-বড় মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে—'চাঁদপুর, ইলশেঘাট, ব্যাঙধুই, বোয়ালিয়া, বোয়ালমারি।'

রিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তর মুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-ক্ষেত, ও-ক্ষেত, এ-বিল ও-বিল, করে হরিংঘাটা, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে দেখতে চলেছে—বাঙলাদেশের সুন্দরবন, ধানক্ষেত, পদ্মদীঘি, বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না। বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল—পুবমুখে।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু—জাতের হাঁস—এরা কোনোদিন কোথাও যেতেও চায় না, নড়তেও চায় না—ভারি কুনো। বুনো-হাঁস এদের দেখলেই তামাশা করত ছাড়চে না। তারা উপর-আকাশ থেকে একের পর একে ডেকে চলল—'পাহাড়তলি, কামরূপ, ধৌলাগিরি মানস সরোবর—চলেছি, চলেছি!' অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে—'যেও না যেও না, বড় শীত। যেও পরে, যেও পরে।'

বুনো-হাঁসের দল আরো নিচে নেমে একসঙ্গে বলে উঠল—'ভারি মজা উড়তে

মজা—শীতে মজা—পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব; চলে এস না!'

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারি চটবে; এবারে বুনো হাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালু-হাঁসের দল একেবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল—ওরে হাঁস নয় রে—ভেড়া!' তারপর হাঃ-হাঃ করে হাসতে-হাসতে ডানায় তালি দিতে-দিতে আবার আকাশে উঠল। নিচে থেকে ঘোরো-হাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে—'মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শীল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভুঁয়ে মর!'

এমন হাসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দুরবস্থা ভেবে—সে যে মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সে কথা মনে করে—এক-একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হু-হু করে করে উড়ে চলায় কি মজা, কত আনন্দ। বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা-ফুলের খুসবু, কোথাও পাকা ফলের কি মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি। মেঘের উপর দিয়ে জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবলি আনন্দে উড়ে চলা দিন-রাত!

চকা-নিকোবর

সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস এই সব বুনো-হাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, তার এ-গ্রামের সে-গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এতকাল পালা-হাঁসই ছিল—ঐ সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম-খোঁড়া, সবে আজ নতুন উড়ছে। বুনো-হাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়। খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না, মধ্যে থেকে এক-এক করে প্রায় আট-হাঁস পিছিয়ে পড়েছে। সেথো-হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পাণ্ডা-হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে—'চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!'

চকা উড়তে-উড়তেই শুধোলে—'ক্যোঁন-ক্যোঁন কও ক্যোঁন?'

সেথোরা বললে—'পিছিয়ে পোলো খোঁড়া ঠ্যাং!'

আগের মতো সোঁ-সোঁ করে চলতে-চলতেই চকা বলে উঠল—

জোরে চলায় নাই কোনো দায়,
আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!

অমনি সব হাঁস এক সঙ্গে বলে উঠল—'চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।'

চকার কথা মাফিক খোঁড়া-হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দু'গুণ হাঁপিয়ে পড়ল, আর সে আস্তে-আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে-ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো-হাঁসরা আবার ডাক দিলে—'চকা নিকোবর—চকা-চকা-চকা!'

এবার চকা গরম হয়ে বলল—"কোন্ কর ভ্যেন্—ভ্যেন?"

সেথোরা বলে উঠল—'খোঁড়া-হাঁস তলিয়ে যায়।'

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল, তেমনি পুরো দমে যেতে-যেতে বললে—'বল ওকে হালকা হাওয়ায় উঠে আসতে।'

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,
ডানা নেড়ে নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।
উপর বাতাসে পাতলা ভারি,
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

খোঁড়া-হাঁস চকার কথায় উপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু এবার বাতাস ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার যোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিলে—'চকা! চকা!'

'কেনে? চলতে দিবে না নাকি।'—বলে চকা গোঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে—'খোঁড়া-বেচারার প্রাণসংশয়!'

চকা রেগে উত্তর দিলে—
উড়তে না পারে ঘরে যাক,
খাক-দাক বসে থাক।
কে বলেছে উড়তে ওরে,
ভিড়তে দলে রঙ্গ করে?

খোঁড়া-হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনো-হাঁসরা কেবল তামাশ দেখবার জন্যে তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে—মানস-সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কি আপসোস! ডানা যে তার আর চলছে না। না হলে খোঁড়া-হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার বুনো-হাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা-নিকোবর—এমন হাঁস নেই যে একে জানে না; এই একশো বছরের বুড়ো হাঁস, যার সঙ্গে পয়লানম্বর হাঁসও উড়ে পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারি পাল্লায়। যে চকা পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারি সামনে। এ দুঃখ সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে-ভাবতে চলল—বাড়ি ফিরবে, কি, প্রাণ যায় তবু সমানে বুনো-হাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সেও জানে উড়তে! রিদয় এই সময় খোঁড়াকে বললে—"সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছে, আর কেন? এইবার ফের। এদের

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে শেষে দম-ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের মতলব ভালো বুঝছিনে!"

রিদয় কিছু না বললে, হয়তো খোঁড়া আপনা-হতেই বাড়ি মুখো হত; কিন্তু এই বুড়ো-আংলা, এও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল—"ফের কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে-ফেলে চলে যাব।" বলেই রেগে ডানা ঝাপটে খোঁড়া এমনি তেজে উড়ে চলল যে বুনো হাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে গোঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে তেজ থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক সেই সময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে-দেখতে বেলা পড়ে এল। অমনি হাঁসরা সবাই জমি-মুখো হয়ে ঝুপ-ঝাপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদী চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজে কাদা তখনো কালো প্যাচ-প্যাচ করছে—মাছে-মাঝে ডোবায় এখনো জল বেধে আছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা-চোরা পিছল চর; খানা, ডোবা নালা এখানে-ওখানে, এরি উপরে সন্ধ্যের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায় যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সেদিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সেদিকে মানুষ কি গরু কিছুই নেই। চারদিক সুনসান। মেঘনার মাঝে লাল-ফানুসের মতো রাঙা সুয্যি পশ্চিম-আকাশে রামধনুকে রঙ টেনে দিয়ে আস্তে-আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল সে যেন কোথায় কতদূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়েছে। বেচারা সমস্ত দিন খেতে পায়নি। তার কেবলি কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই—কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় সে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘর-বাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়। ওধারে বনের তলাটা যেন নিজুম হয়ে আসছে। ঝিম-ঝিম সেখানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুস-খুস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফূর্তিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একেবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারা মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে। কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই-চোখ বুজে সে কেবলি জোরে-জোরে শ্বাস টানছে—যেন আধ-মরা।

রিদয় তার সঙ্গের সাথী খোঁড়া-হাঁসকে বললে—'একটু জল খেয়ে নাও—এই তো দু'পা গেলেই নদী!' কিন্তু খোঁড়া সাড়া-শব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্টু নেই। এই খোঁড়া-হাঁস এখন আর শুধু হাঁস নয়—তার বন্ধু, সাথী সবই! সে আস্তে-আস্তে তার গলাটি ধরে উঠিয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোট, হাঁস বড়; কিন্তু প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুক-চুক করে জল খেয়ে নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে-সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনো-হাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল; খোঁড়া-হাঁসের কোনো খবরই নেয়নি। দিব্যি চান করে ডানা ঝেড়ে গুগলী-শামুক শাক পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়রে হাঁস জলে

নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাঁকাল মাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—"এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা।"

হাঁসের কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল সেই খোঁড়া-হাঁসের গলা ধরে তার দু'ঠোঁটে দুটো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে—রাঁধি কিসে? অমনি মনে পড়ল—সে যে এখন আর মানুষ নেই, যক্ হয়েছে; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদরের ট্যাঁকে এটা-ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে-কাঠির মতো ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোট-ছোট করে বানিয়ে কতক-কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে, নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপি-চুপি বললে যে চকা-নিকোবরের দল পোষা-হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপি-চুপি বললে—"তা তো দেখতে পাচ্ছি।"

খোঁড়া-হাঁস গলা ফুলিয়ে বললে—"মজা হয়, যদি একবার এদের সঙ্গে সামনে আমিও মানস-সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা-হাঁস কি করতে পারে তবে ওরা টের পায়।"

"তা তো বটেই!" বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল। "আমার মনে হয় একলা আমি অতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চল, তবে আমি সাহস করি।"

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকেই সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে বললে—"দ্যাখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জ্বালাতন করেছি।" কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে—জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই খোঁড়া-হাঁস মনে রেখেচে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে—"কোনো ভাবনা নেই, আসছে-শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না—প্রতিজ্ঞা করছি।"

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক্ হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো। কি জানি, মানস-সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া-হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলো ডানার ঝটপট শোনা গেল! এক-কুড়ি বুনো-হাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপর মাঝে চকা-নিকোবরকে রেখে সারবন্দী সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। খোঁড়া-হাঁস বুনো-হাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস-মাত্রই পোষা-হাঁসের মতো দেখতে। আর ধরন-ধারণও সেই রকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনো হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টাগোঁট্টা কাটখোট্টা গোছের। এদের রঙ তার মতো শাদা নয় কিন্তু ধুলো বালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরী ওখানে খাকির ছোপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয় হলুদবর্ণ—যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে

এসেছে হাঁস চলে হেলতে দুলতে—পায়ে-পায়ে; কিন্তু এরা চলেছে খটমট চটপট—যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পা গুলো বিশ্রী—চ্যাটালো, কেটো-কেটো, ফাটা-চটা হত কুৎসিত। দেখলেই বোঝা যায় যেখানে-সেখানে শুধু পায়ে এরা ছুটে বেড়ায়—জলকাদা কিছুই বাছে না। তাদের ডানার পালক, গায়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝক-ঝক করছে বটে কিন্তু ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে—যেন সে কে, কি বৃত্তান্ত, এসব কথা বুনো-হাঁসদের না বলে। তার পর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা-নিকোবর, খোঁড়া-হাঁস আর বুনো-হাঁসদের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘাড় নেড়ে নমস্কার-প্রতিনমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে—'এখন বল তো, তোমরা কে? কোন জাতের পাখি?'

খোঁড়া আস্তে-আস্তে বলল—'কি আর পরিচয় দেব? গেল বছর ফাগুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টি খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত-সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।'

চকা-নিকোবর নাক তুলে বললে—'তুমি তবে নেহাত সাধারণ হাঁস দেখছি! খেতাব, মানসম্ভ্রম, বোলবোলা—কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি!'

খোঁড়া-হাঁস খোঁড়া পা-টি নাচিয়ে বললে—'আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।'

চকা হেসে বললে—'সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজী তুমি?'

এক হাঁস অমনি বললে—'ওড়ার কাজে কেমন যে মজবুত তা তো দেখিয়েচ!'

অন্যে বললে—'হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।'

খোঁড়া ঘাড়-নেড়ে বললে—'না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।' খোঁড়া-হাঁস ভাবছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছে কথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভালো—যা থাকে কপালে।

চকা শুধোলে—'সাঁতার জানো না তবে দৌড়তে মজবুত বোধ হয়।' বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া-হাঁস গম্ভীর হয়ে বলে—"রাজহাঁস কোনো দিন ছুটে চলে না, তাই ছোটা আমার অভ্যেসই হয়নি।" বলে সে খোঁড়া-পা আরো খুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি—'তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।" কিন্তু ঠিক তার উলটোটা হল। চকা-নিকোবর দু'চারবার ঘাড়-নেড়ে বললে—"তুমি তো বেশ সাফ-সাফ জবাব দিলে—একটুও ভয় না করে! ভালো, ভালো, তোমার সাহস আছে—সময়ে লায়েক হতে পারবে—"বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত। দুদিন এ-দলে থাক, দেখি তোমার হিম্মৎ কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কি বল?"

খোঁড়া-হাঁস মাথা নেড়ে বললে—"আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি।"

এইবার চক-নিকোবর বুড়ো-আংলা রিদয়ের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে—"একি এ

কোন জানোয়ার? ভারি তো অদ্ভুত।"

খোঁড়া-হাঁস তাড়াতাড়ি বললে—"এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাছে লাগতে পারে।"

চকা নাক তুলে উত্তর করলে—"বুনো-হাঁসের কোনো কাজে লাগবে না—পোষা-হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কি?"

মানুষের নাম বললে পাছে বুনো-হাঁসরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া-হাঁস অনেক ভেবে বললে—"ওর নাম অনেকগুলো। আমরা ওকে ডাকি বুড়ো-আংলা বলে! আঃ, বড় ঘুম পাচ্ছে।" বলেই খোঁড়া দুবার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর-কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছে—'মাগো, চোখ আপনা-হতেই ঢুলে আসছে! চল্‌রে বুড়ো-আংলা ঘুমোবি চল।'

চকা-নিকোবর বড় পাকা-হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে ল্যাজের পালক পর্যন্ত রুপোর মতো শাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চুনের হাঁড়ি; পা-দুটো যেন চ্যালা-কাঠ—বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা-দুটো যেন দু'খানা ঝর-ঝরে বাঁশের কুলো; ঠোঁট ভোতা; গলা ছিনে-পড়া; কিন্তু চোখ এখনো জোয়ান-হাঁসের চেয়েও ঝক-ঝকে—যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ-কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক-ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে—"আমি কে, জানো তো? আমার নাম—চকা-নিকোবর! আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখেছ, ইনি আমার বাঁ-হাত, এঁর নাম নেড়োল-কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা আণ্ডামানি; বাঁয়ে হলেন—চোক-ধলা ডানকানি। তারপরে পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারগুই চাপড়া, তিরশলী আকায়ব, সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায়-মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগনার সরাল। আরো ডাইনে-বাঁয়ে দেখ—লুসাই, তিব্বতি, তাতারি—এমনি সব বড়-বড় খেতাবি হাঁস—কেতাবে যাদের নাম উঠেছে! আমরা কি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে-তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠা-বসা করতে চাও তো স্পষ্ট করে ওই বুড়ো-আংলাটির গাঁইগোত্তর পদবী-উপাধি বল, নয় তো নিজের পথ দেখ!"

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারলে না; সে বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বললে—"আমার নাম ছিল—ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুণ্ডু ফুলুরী গাঁই, কাশ্যপ গোত্র—পুষ্যিপুত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি—হাঁসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলেম, সকলে এখন—" আর বলতে হল না; মানুষ শুনেই চকা-নিকোবরের দল দশ-হাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে—"যা ভেবেছি তাই! সরে পড়। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারি বজ্জাত তারা!"

খোঁড়া-হাঁস আমতা-আমতা করে বললে—"এইটুকু মানুষ, ওকে আবার ভয় কি? কাল ও তো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না। এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর এখন মানুষ নেই—যক্ হয়ে গেছে।"

চকা 'যক্' শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে—"বাপু, মানুষ জাত খারাপ, বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাক, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ী

আমরা হব না—এই বেলা বুঝে দেখ!"

খোঁড়া-হাঁস পিছুবার পাত্র নয়; সে বললে—"সে ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটালেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভালো জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড় জোর-কপাল যে চকা-নিকোবরের সঙ্গে এক-চরে শুতে পেয়েছে। চকার বাছা বাগদী-চর এতে শুয়ে আরাম কর।" বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে।

চকা খোশামোদে খুশি হয়ে বললে, 'তাহলে কাল কিন্তু ওর বাড়ি ফেরা চাই—কেমন?'

খোঁড়া বললে—"ওর সঙ্গে তাহলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওকে ছাড়ব না!"

চকা-নিকোবরে উত্তর দিলে—"তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পার, ইচ্ছে হয় ফিরতে পার।" এই বলে চকা চরের মধ্যিখানে উড়ে বসল।

একে একে বুনো-হাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের কানে-কানে বললে—"চরে বড় হিম; যত পার শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" রিদয় দু'বোঝা শুকনো কুটো-কাটা হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নামিয়ে বললে—"ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও; আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে ঢুকে পড়, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।" রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস—"এই আমায় তুমি আরামে রাখ, আমি তোমায় গরমে রাখি—" বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল। রিদয়ের মনে হল সে পালকের তোশকে শুয়েছে। সেও একটিবার হাই তুলতেই চোখ বুজলে।

শৃগাল

মেঘনার মোহানায় চর যে কখন কোথায় পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ যেখানে জল, কাল সেখানে দেখা গেল চড়া পড়ে বালি ধু-ধূ করছে; কাল সেখানে দেখছি চরে উলু-ঘাস, বালু-হাঁস; বছর ফিরতে সেখানে দেখলেম চরও নেই, হাঁসও নেই—অগাধ জল থৈ থৈ করছে! এক রাতের মধ্যে হয়তো নদীর স্রোত ফিরে গেল—জলের জায়গায় উঠল বালি, বালির জায়গায় চলল জল।

বাগদী-চরে হাঁসেরা যখন উড়ে বসল, তখন চরের চারদিকে জল—ডাঙা থেকে না-সাঁতরে চরে আসা মুশকিল। অপার মেঘনার বুকে এক-টুকরো ময়লা গামছার মতো ভাসছিল চরটি, কিন্তু রাত হতেই জল ক্রমে সরতে লাগল, আর দেখতে—দেখতে সরু এক টুকরো চরা ডাঙা থেকে বাগদী-চর পর্যন্ত, একটি সাঁকোর মতো দেখা দিলে।

চাঁদপুরের জঙ্গলে বসে খেঁকশিয়ালী হাঁসের দলের উপরে নজর রেখেছিল; কিন্তু চকা-নিকোবরকে সে চেনে; এমনি বেছে-বেছে নিরাপদ জায়গায় চকা তার দল নিয়ে রাত কাটাত যে এ-পর্যন্ত তার দলের একটি হাঁস শিয়ালে ধরতে পারেনি। মেঘনার পুব-তীরের জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় খেঁকশেয়ালি শিকারে বেরিয়েছে, এমন সময় জলের বুকে কুমিরের পিঠের মতো সরু সেই চরটির দিকে চোখ পড়ল। এক লাফ দিয়ে সে চর ডিঙিয়ে পায়ে-

পায়ে অগ্রসর হল। খেঁকশেয়ালী প্রায় হাঁসের দলে এসে পড়েছে, এমন সময় ছপ করে একটা ডোবার জলে তার পা পড়ল; অমনি চকা চমকে উঠে ডাক দিলে—"কেও?" আর সব হাঁস ডানা ঝেড়ে উড়ে পড়তে আরম্ভ করলে; সেই অবসরে তীরের মতো ছুটে গিয়ে শেয়াল লুসাই-হাঁসের ডানা কামড়ে ধরে হিড়-হিড় করে সেটাকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

সব হাঁসের সঙ্গে ভয় পেয়ে খোঁড়া-হাঁসও ডানা ছড়িয়ে আকাশে উঠল; কেবল রিদয় হাঁসের ডানা থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে সে একা, আর দুরে একটা কুকুর হাঁস ধরে পালাচ্ছে। অমনি রিদয় হাঁসটা কেড়ে নিতে শেয়ালের সঙ্গে ছুটল। মাথার উপর থেকে খোঁড়া-হাঁস একবার হাক দিলে—"দেখে চল!" কিন্তু রিদয় তখন হৈ হৈ করে ছুটেছে। রিদয়ের গলা পেয়ে লুসাই কতকটা সাহস পেলে, কিন্তু বুড়ো আঙুলের মতো ছেলে কেমন করে শেয়ালের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে, এটা তার বুদ্ধিতে এল না। এত দুঃখেও লুসাই-এর হাসি এল। সে প্যাঁক-প্যাঁক করে হাসতে-হাসতে চলল।

মাথার উপরে খোঁড়া-হাঁস রিদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে; তাঁর ভয়—পাছে রিদয় খানায়-ডোবায় পরে হাত-পা ভাঙে। কিন্তু যক্ হয়ে অবধি খুব অন্ধকার রাতেও যকের মতো রিদয় দেখতে পাচ্ছে। খানা-খন্দ লাফিয়ে দিনের বেলার মতো রিদয় সহজে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে—"ছেড়ে দে বলিছ, না হলে এক ইট মেরে পা খোঁড়া করে দেব।" কে তার কথা শোনে? শেয়াল এক লাফে চড়া ছেড়ে পারে উঠে দৌড়ে চলল। রিদয়ও চলছে হাঁকতে-হাঁকতে—'মড়াখেকো-কুকুর কোথাকার। ছাড় বলছি, না হলে মজা দেখাব।"

চাঁদপুরের খেঁকশেয়াল যার নাম, আসামের জঙ্গলের হেন পাখি নেই যে তাকে জানে না। সে শহরে গিয়ে কতবার মুরগি, হাঁস ধরে এনেছে। তাকে 'মড়াখেকো-কুকুর' বলে এমন সাহস কার? শেয়াল একটু থেমে যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, অমনি রিদয় গিয়ে তার ল্যাজ চেপে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। মানুষটি বুড়ো-আংলা, তার কিলটি কত বড়ই বা? শেয়ালের পিঠে একটা যেন বেদানা-বিড়ি পড়ল! কিন্তু মানুষের মতো গলার সুর শুনে শেয়াল সত্যি ভয় পেলে; সে ল্যাজ তুলে বনের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে চলল; আর রিদয় তার ল্যাজ ধরে টিকটিকির মতো ঝুলতে-ঝুলতে চলল—উলু-ঘাসের মধ্যে দিয়ে গা-ঘেঁষড়ে। কাঁকড়ার মতো ল্যাজে কি কামড়ে রয়েছে, সেটা দেখবার শেয়ালের অবসর ছিল না। সে একবারে নিজের গর্তের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, মুখ থেকে হাঁসটা নামিয়ে সেটার বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল, তখন তার চোখে পড়ল ল্যাজে-গাঁথা বুড়ো আংলার দিকে। এই টিকটিকির মতো ছেলেটা—ইনি চাঁদপুরী শেয়ালকে জব্দ করবেন, ভেবে শেয়াল ফ্যাক করে মুখ-ভেংচে হেসে বলল—"এইবার তোমার মনিবকে খবর দাওগে চাঁদপুরের শেয়াল হাঁস খেয়েছে।"

ছুঁচোলো-মুখ, নাটা-চোখ দেখে এতক্ষণে রিদয় বুঝলে এটা শেয়াল। কিন্তু শেয়াল তাকে ভেংচেছে, এর শোধ সে দেবেই দেবে। রিদয় আরো শক্ত করে ল্যাজ চেপে, দুই পায়ে একটা গাছ আঁকড়ে, যেমন শেয়াল হাঁ করে হাঁসটার গলা কাটতে গেছে অমনি পিছনে এক টান দিয়ে, হাঁস থেকে শেয়ালকে দু'হাত তফাতে টেনে নিয়েছে। আর সেই ফাঁকে লুসাই হাঁসও ভাঙা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালিয়েছে।

"হাঁস যাক, আজ তোকে খাব।"—বলে খেঁকশেয়ালী দাঁত-খিচিয়ে রিদয়কে ধরবার জন্যে কেবলি নিজের ল্যাজটার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রিদয়ও ল্যাজ আঁকড়ে চরকি বাজির মতো শেয়ালের সঙ্গে ঘুরতে থাকল, আর বলতে লাগল—"ধর দেখি মড়াখেকো-কুকুর।"

বনের মধ্যে শেয়াল-মানুষ চরক-বাজি এমনতর কেউ কোনোদিন দেখেনি। প্যাঁচা, চামচিকে, এমন কি দিনের পাখিরাও তামাশা দেখতে বার হল। কিন্তু রিদয় দেখলে তামাশা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে—সে নিজে শেয়ালের ল্যাজ ছাড়তে চাইলেও, শেয়াল তাকে সহজে ছাড়ে কি না সন্দেহ। খেঁকশেয়ালী পাকা শিকারী; তার গায়ের শক্তিও যেমন বুদ্ধিও তেমনি, সাহসও কম নয়। রিদয় বুঝলে ঘুরে-ঘুরে সে নিজে যেমনি হাঁপিয়ে পড়বে অমনি টুপ করে তাকে ধরবে শেয়াল। রিদয় একবার চারদিকে চেয়ে দেখল, হাতের কাছে কোনো বড় গাছ আছে কি না। কাছেই একটা সরু ঝাউ-গাছ বন ঠেলে আকাশে সোজা উঠেছে, ঘুরতে ঘুরতে রিদয় সেইদিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ একসময় শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ঝাউ-গাছটার আগ-ডালে উঠে পড়ল। শেয়াল তখনো নিজের ল্যাজ কামড়াতে বোঁ-বো লাঠিমের মতো ঘুরছে। রিদয় গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে বললে; তাকুড়-তাকুড় তাকা!

যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা।
থাকে-থাকে—থাকে
হুক্কাহুয়া ডাকে।
চাঁদপুরের কাঁকড়া-বুড়ি
কামড়েছে তার নাকে।

শেয়াল দেখলে শিকার তাকে ঠকিয়ে পালাল। সে গাছের তলায় হাঁ করে বসে রিদয়ের দিকে চেয়ে বললে—'রইলুম এইখানে বসে, কতক্ষণে নেমে আসিস দেখি। তোকে না খেয়ে নড়ছিনে!' এক-ঘন্টা গেল, দু-ঘন্টা গেল, শেয়াল আর নড়ে না। ঝাউ-গাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কি কষ্ট আজ রিদয় বুঝলে। শীতে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার যো নেই—পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দু'হাত তফাতে নজর চলে না—মিশ কালো ঘুটঘুটে চারিদিক! মনে হল যেন গাছ-পালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়রে মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না—রিদয় আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না! এই সময় ভোরের কনকনে বাতাস বইল, আর দেখতে-দেখতে ভুসো-কালির মতো রাতের রঙ ক্রমে ফিকে হতে-হতে মিশি থেকে রাঙা, রাঙা থেকে রুপোলি, রুপোলি থেকে সোনালি হয়ে উঠল। তারপর বনের ওপারে সূর্য উঠলেন। বেলায় উঠত, কাজেই সূর্যকে চিরকার রিদয় দেখে এসেছে কাঁচা সোনার মতো হলুদ বর্ণ; সূর্য যে ক্ষেপা মোষের চোখের মতো এমন লাল টকটকে, তার জ্ঞান ছিল না। তার ঠিক মনে হল কে যেন রাত্তিরের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে তার দিকে চাচ্ছেন।

তারপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে সকালের আলো উঁকি মারতে লাগল—বনের গাছ-

পালা, জীব জন্তু রাতের আড়ালে-আবডালে অন্ধকারে বসে কি কাণ্ড করেছে, তারি খোঁজ নিতে লাগল। বনের তলাকার চোরকাঁটা শেয়াল-কাঁটা, বাটি-কুটি, কাঁটা-খোঁচা, যা-কিছু সব যেন আলোর ধমকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে মেঘে-মেঘে আলো পড়ল—রঙ ধরল। গাছের পাতা, ঘাসের শিষ, ফোটা-ফুলের পাপড়ি তার উপরে শিশিরের ফোঁটা—সবই আলোতে ঝলক দিতে থাকল! যেন সবাই সিঁদুর পরে সাটিনের কাপড়ে সেজেছে! ক্রমে চারিদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠল। অন্ধকারের ভয় দেখতে-দেখতে কোথায় পালাল; আর অমনি কত পাখি, কত জীব-জন্তুই না বনে ছুটোছুটি আরম্ভ করল। লাল টুপি-মাথায় কাঠঠোকরা ঠকাস-ঠকাস গাছের ডালে ঘা দিতে বসে গেল, কাঠবেরালি অমন খোপ ছেড়ে গাছের তলায় বসে কুটুস-কুটুস বাদাম ছাড়াতে লেগে গেল। গাং-শালিক, গো-শালিক, ছাতারে, গাছের তলায় নেমে শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে কিড়িং-ফড়িং ধরে ধরে বেড়াতে লাগল। আগ-ডালে বসে শ্যামা-দোয়েল শিস দিতে আরম্ভ করলে। রিদয়ের মনে হল সূর্য যেন সব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গদের জাগিয়ে দিয়ে অভয় দিতে থাকলেন—রাত পালিয়েছে, তোরা ঘর ছেড়ে বার হ, আমি এসেছি, ভয় নেই।

রিদয় শুনলে মেঘনার চরে হাঁসেরা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছে, দল একত্র হচ্ছে। চকা-নিকোবর হাঁকলে—'মানস সরোবর। বৌলাগিরি আও আও আও!' তারপর রিদয় দেখলে তার মাথার উপর দিয়ে নিকোবরের পুরো দল উড়ে চলল—খোঁড়া হাঁসটি সুদ্ধ। রিদয় তাদের একবার ডাক দিলে, কিন্তু এত উপর দিয়ে হাঁসেরা চলেছে যে তার ডাক শুনলে কিনা বোঝা গেল না—উড়তে-উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। রিদয় স্থির করলে হাঁসেরা নিশ্চয়ই দেখেছে শেয়ালে তাকে খেয়েছে। সে হতাশ হয়ে আকাশে চেয়ে রইল। কিন্তু এত দুঃখেও সকালের আলো আর বাতাস, সে যেখানটিতে বসে আছে সেই ডালটি সোনার রঙে রাঙিয়ে ঝাউ পাতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি তাকে এসে বলতে থাকল—'ভয় কি? দিন হয়েছে,—সূর্য উঠেছেন; আমরা থাকতে কিসের ভয়!' ঠিক সে সময় কমলালেবুর রঙের সাজ পরে হলুদবর্ণ যে সূর্য আমতলির মাঠে রোজ-রোজ রিদয়কে দেখা দিতেন, তিনি চাঁদপুরের জঙ্গলের উপরে দেখা দিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর। রিদয় গাছের উপরে, শেয়াল নিচে বসে আছে, হাঁসের দলেরও কোনো খবর নেই, যে যার খাবার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। ঠিক যখন বেলা নটা তখন দেখা গেল, বনের মধ্য দিয়ে একটিমাত্র হাঁস যেন উড়তেই পারছে না, এই ভাবে আস্তে-আস্তে চলেছে। খেঁকশেয়ালী অমনি কান খাড়া করে হাঁসের দিকে নাক উঠিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। হাঁসটা শেয়ালকে দেখেও দেখলে না, তার নাকের সামনে দিয়েই উড়ে চলল। হাঁসটাকে ধরবার জেন্য শেয়াল একবার ঝম্প দিলে, হাঁস অমনি ফিক করে হেসে, উড়ে গিয়ে চড়ায় বসল। এর পরেই আর-এক হাঁস ঠিক তেমনি করে আরও একটু মাটির কাছ দিয়ে উড়ে চলল। শেয়ালটা লাফ দিলে; তার কানের রোঁয়াগুলো হাঁসের পায়ে ঠেকল, কিন্তু ধরতে পারলে না—হাওয়ার মতো হাঁস উড়তে-উড়তে চড়ার দিকে চলে গেল। একটু পরে আর আর হাঁস—এটা যেন উড়তেই পারছে না—একেবারে মাটির কাছ দিয়ে ঝাউ-গাছের গা-ঘেঁষে উড়ে চলল। এবারে প্রাণপণে শেয়াল ঝম্প দিলে। ধরেছে, এমন সময় হাঁস সোঁ করে তার দাঁতে পালক বুলিয়ে দিয়ে একেবারে মুখের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল। এবার যে এল, সে এমনি বেকায়দায় লটপট করে উড়ে আসছে যে

খেঁকশেয়াল ভাবলে—একে তো ধরেছি! কিন্তু বারবার তিনবার ঠকে শেয়াল রিরক্ত হয়ে উঠেছে, সে হাঁসের দিকে থেকে মুখটা ফিরিয়ে গোঁ হয়ে রইল। যে-পথে আগের তিনটে হাঁস গেছে, এটাও সেই পথ ধরে ঝাউ-তলায় এসে শেয়ালের এত কাছ দিয়ে চলল যে শেয়াল আর স্থির থাকতে না পেরে দিয়েছে লাফ এমন জোরে যে তার ল্যাজটা ঠেকল হাঁসের পিঠে। কিন্তু হাঁসও পাকা। সে সাঁ করে শেয়ালের পেটের নীচে দিয়ে গলে তার ঝাঁটার মতো ল্যাজে ডানার এক থাপ্পড় বসিয়ে হাসতে-হাসতে চম্পট দিলে। শেয়ালের আর দম নেবার সময় হল না, ঝপ-ঝপ করে আরো গোটা-পাঁচেক হাঁস নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটাকেও সে ধরতে পারলে না—লাফানি—ঝাঁপানি সার হল। এবারে পর-পর আবার পাঁচটা হাঁস একে-একে শেয়ালকে লোভ দেখিয়ে সজোরে তার পিঠে ডানার বাতাস দিয়ে হোঃ হোঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে তার রগ ঘেঁষে চলে গেল; কিন্তু শেয়াল না-রাম-না গঙ্গা—চুপ করে বসে রইল। সে বুঝেছে চকা-নিকোবরের দল কাল রাতে হাঁস নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলতে মস্করা লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর হাঁসেদের দেখা নেই, শেয়াল ভাবছে তারা গেছে, এমন সময় চকা-নিকোবর দেখা দিলেন। তার সেই পাকা পালক, ছিনে গলা দেখেই শেয়াল তাকে চিনে নিলে। একটা ডানা বেঁকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এক-কাৎ হয়ে সে উড়ে এল—একেবারে যেন চলতেই পারে না, এই ভাবে। শেয়াল এবারে লাফ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁসটাকে তাড়িয়ে গেল। কিন্তু হাঁস যেন ধরা দিয়েও ধরা দিলে না; সোজা গিরে চরে বসে প্যাঁক-প্যাঁক করে হেসে উঠল। শেয়াল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দেখলে—এবারে চমৎকার ধবধবে মোটা-সোটা রাজহাঁস তার দিকে উড়ে আসছে। বনের অন্ধকারে তার শাদা ডানা দু'খানা যেন রুপোর মতো ঝক-ঝক করছে। এবারে শেয়ালের নোলা সকসক করে উঠল! সে এমন লাফ দিলে যে ঝাউ-গাছের পাতাগুলো তার গায়ে খোঁচা মারলে, কিন্তু খোঁড়া রাজহাঁস ধরা পড়ল না—সোজা ঝাউ-গাছ ঘুরে চড়ায় গিয়ে উঠল।

এর পর আর হাঁসের সাড়া-শব্দ নেই; সব চুপচাপ। শেয়াল ঝাউ-গাছের দিকে চেয়ে দেখলে, ছেলেটাও সেখান থেকে সরে পড়েছে! শেয়াল ফ্যাল-ফ্যাল করে চারিদিকে চাইছে এমন সময় চড়ার দিকে থেকে একে-একে হাঁস সব আগেকার মতো তাকে লোভ দেখিয়ে উড়ে চলল! কিন্তু শেয়ালের তখন মাথার ঠিক নেই; সে পাগলের মতো কেবল ঝাঁপাঝাপি লাফালাফি করতে থাকল আর কেবলি হাঁস তার নাকের সামনে দিয়ে যেতে থাকল—এক দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ, পনেরো কুড়ি, বাইশ! শেয়াল তাদের একটি পালক পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারলে না। শেয়াল এমন নাকাল কখনো হয়নি। চাঁদপুরের শেয়াল সে, কতবার গুলির মুখ থেকে মুরগি হাঁস শিকার করেছে, তার ঠিক নেই। শেয়ালের রাজা বললেই হয়; কিন্তু এই শীতকালে হাঁস শিকার করতে আজ তার ঘাম ছুটে গেল! সারাদিন ধরে মোটা-সোটা চিক-চিকে হাঁস দলে-দলে তার নাকের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে, অথচ একটাকেও সে ধরে খিদে মেটাতে পারছে না! সব চেয়ে তার লজ্জা—মানুষটাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে! আর তার দুর্দশার কথা সেই পোষা রাজহাঁসটাও জেনে গেল! দেশে-দেশে নিশ্চয়ই তারা চাঁদপুরের খেঁকশেয়ালের কীর্তি কাহিনী রাষ্ট্র করে দেবেই-দেবে।

ভোরে এই শেয়ালের গা চিকচিকে, ল্যাজ মোটা, রোঁয়াগুলো কেমন যেন সাটিনের

মতো খয়েরি-কালো শাদা ঝক-ঝক করছিল। কিন্তু বিকেলে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে, গা ধুলোয়-ঘামে কাদা হয়ে গেছে, চোখ ঝিমিয়ে পড়েছে, জিভ চার-আঙুল বেরিয়ে পড়ে মুখে গোটানাল ভাঙছে। তাকে দেখে কে বলবে সকালের সেই দুরন্ত শেয়াল। সারাদিন ধরে কেবলি উড়ে উড়ে হাঁসের দল তাকে এমনি নাকাল করেছে যে, বেচারা শেয়াল একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে। তার মাথার আর ঠিক নেই; কেবলি দেখছে যেন চোখের সামনে হাঁস ঘুরছে। সে গাছের তলায় সূর্যের আলো দেখে ভাবছে হাঁস। প্রজাপতি উড়লে হাঁস বলে লাফিয়ে ধরতে যাচ্ছে! যতক্ষণ দিনের আলো রইল চকা-নিকোবরের দল কিছু দয়া-মায়া না করে শেয়ালকে হয়রান করেই চলল। শেয়ালের তখন আর নড়বার শক্তি নেই, সে কেবল মাটির উপরে হাঁসের ছায়াগুলো থাবা দিয়ে-দিয়ে আঁচড়াতে থাকল। হাঁসেরা যখন দেখলে শেয়ালটা মড়ার মতো শুকনো পাতার উপরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লেগেছে, তখন তারা—"কেমন! কেমন! হাঁস ধরবে!" বলতে-বলতে চাঁদপুরের জঙ্গল ছেড়ে নালমুড়ির চরের দিকে গেল।

হংপাল

ঝাউ-গাছের উপর থেকে খোঁড়া হাঁস ঠোঁটে করে রিদয়কে বাগদী-চরের থেকে একটু দুরে নালমুড়ির চরে নামিয়ে দিয়ে সারাদিন বুনো-হাঁসের দলের সঙ্গে শেয়ালকে নিয়ে ঝপ্পটি আর দাঁতকপাটি খেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল দেখে রিদয় ভাবছে, নিশ্চয়ই হাঁসেরা রাগ করে তাকে ফেলে গেছে, এখন কেমন করে সে বাড়ি যায়? আর কেমন করেই বা ঐ বুড়ো-আংলা চেহারা নিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করে? ঠিক এই সময় মাথার উপর ডাক দিয়ে হাঁসের দল উড়ে এসে নালমুড়িতে ঝুপঝাপ পড়েই জলে নেমে গেল। চরে মেলাই কাছিমের ডিম, রিদয় তারি একটা ওবেলা একটা এবেলা খেয়ে পেট ভরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। এমনি সে রাত কাটল। ভোর না হতে হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে আবার চলল। রিদয় দেখলে হাঁসেরা তাকে বাড়ি যাবার কথা বললে না। সেও সে কথা চেপে গিয়ে চুপচাপ খোঁড়া-হাঁসের পিঠে চুপটি করে উঠে বসল।

লুসাই-হাঁসের ডানাটা শেয়ালের কামড়ে একটু জখম হয়েছে, কাজেই বুনো-হাঁসের দল আজ আর বেশি দুরে উড়ে গেল না। গোবরা-তলির মাটির কেল্লা 'নুড়িয়া ক্যাসেলের' উপরটায় এসে দেখতে লাগল, সেখানে মানুষ আছে কিনা। সেখানে শিকে-গাঁথা ফাটা-চটা কতকগুলো মাটির সঙ পরী, সেপাই—এমনি সব। বাগানে মালি নেই, মালিকও নেই, কেবল একটা ভাঙা ফটকের মার্বেল-পাথরে কালি দিয়ে দাগা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে—'পালদিং অফ নুড়িয়া।' ঠিক তারি নিচে একটা ভাঙা পিপের মধ্যে বসে একটা রোগা, কানা দেশী কুকুর পোড়ো কেল্লায় পাহারা দিচ্ছে।

বুনো-হাঁসেরা আকাশ থেকে শুধোলে—"ছপ্পড়টা কার? ছপ্পড়টা কার?"

কুকুরটা অমনি আকাশে নাক তুলে চেঁচিয়ে উঠে ভেউ-ভেউ করে বললে—"ছপ্পড় কি? দেখছ না এটা নুড়িয়ার কেল্লা—পাথরের গাঁথা। দেখছ না কেল্লার বুরুজ, তার উপরে ওই গোল ঘর—সেখানে কামান-বসাবার ঘুলঘুলি, নিশেন ওড়াবার ডাণ্ডা। গবাক্ষ, বাতায়ন,

দরশন-দরওজা। এ-সব দেখছ না!"

হাঁসেরা কিছুই দেখতে পেলে না—না কামান, না ঘুলঘুলি না গবাক্ষ, না বাতায়ন। কেবল একটা চিলের ছাদে একটা আকাশ-পিদিম দেবার বাঁশ দেখা গেল, তাতে এক-টুকরো গামছা-ছেঁড়া লটপট করছে। হাঁসেরা হো-হো করে হেসে বলল—"কই? কই?"

কুকুরটা আরও রেগে বললে—"দেখছে না, কেল্লার ময়দান যেন গড়ের মাঠ। দেখছ না, কেলিকুঞ্জ—সেখানে রানী থাকেন। দেখ ঐ হাম্মাম, সেখানে গোলাপজলের ফোয়ার। দেখতে পাচ্ছ না, বাগ-বাগিচা, আম-খান, দেওয়ান-খান?" হাঁসেরা দেখলে, পানা-পুকুর লাউ-কুমড়োর মাচা—এমনি সব, আর কিছু নেই।

কুকুর আবার চেঁচিয়ে বললে—"ওই দেখ ওদিকে গাছঘর, মালির ঘর, আর এই সব সুরকি পাতা রাস্তার ধারে-ধারে পাথরের পরী, গ্যাস লাইটের থাম, বাঁধা ঘাট, বারো দোয়ারি নাটমন্দির। এসবকি চোখে পড়ছে না যে বলছ ছপ্পড় কার? ছপ্পড়ে কখনো কেলিকানন, পুষ্পকানন, কামিনীকুঞ্জ থাকে? না, পাথরের পরী-ঘাটের সিঁড়ি থাকে? ঐ দেখ রাজার কাচারি, ঐ হাতিশাল, ঘোড়শাল, তোষাখানা। এসব কি ছপ্পড়ে থাকে? না ছপ্পড় কখনো দেখেছ? ছপ্পড় দেখতে হয় তো ওপাড়ার ওই জমিদারগুলোর বাড়ি দেখে এস। আমার মনিব কি জমিদার? এরা মুর্ধাভিষিক্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ঘোড়া রোগে এদের সবাই মরেছে। সেকালে এরা চীনের রাজা ছিল। এখনো দেখছ না ফটকে লেখা- 'পালদিং অফ নুড়িয়া!' এই ছপ্পড়ের নহবতখানার চুড়ো দশক্রোশ থেকে দেখা যায়—এমনি ছপ্পড় এটা।'

কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে থামলে হাঁসেরা হাসতে-হাসতে বললে—"আরে মুখ্যু, আমরা কি তোর রাজার কথা, না রাজবাড়ির কথা, না মাটির কেল্লার কথা শুধোচ্ছি? ওই ভাঙা ফটকের ধারে পোড়াবাগানে ভাঙ মদের পিপেটা কার, তাই বল না।" এমনি রঙ তামাশা করতে করতে হাঁসেরা নুড়িয়া ছাড়িয়ে সুরেশ্বরে—যেখানে প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ির ধারে সত্যিকারের বাগ বাগিচা, দীঘি পুষ্করিণী, ঘাট মাঠ রয়েছে, সেইখানে কুশ-ঘাসের গোড়া খেতে নামল। ওদিকে মেঘনা, এদিকে পদ্মা—এই দুই নদী যেখানে মিলেছে, সেই কোণটিতে হল সুরেশ্বর মঠ। চারদিকে আম বাগান জাম বাগান, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ, আনন্দবাজার, রথতলা, নাটমন্দির, রন্ধনশালা, ফুলবাগান, গোহাল গোষ্ঠ, পঞ্চবটী, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গোলকধাম, দেবদেবীস্থান—এমনি একটা পরগণা জুড়ে প্রকাণ্ড ব্যাপার। এরি এক কোণে বন আর মাঠ। সেইখানে হাঁসেদের সঙ্গে রিদয় নেমেছে। কেন যে এত বেলা থাকতে এখানে হাঁসেরা এসে আড্ডা গেড়ে বসল রিদয় তা বুঝলে না, ভেবেও দেখলে না, নিজের মনে বনে-বনে ঘুরে পাত-বাদাম আর শাক পাতা কুড়িয়ে ছায়ায়-ছায়ায় খেলে বেড়াতে লাগল।

লুসাই-হাঁসের ডানা ভালো হওয়া পর্যন্ত হাঁসেরা সেখানে অপেক্ষা করবার মতলব করেছে। একদিন খোঁড়া-হাঁস দুটো শোল-মাছের ছানা এনে রিদয়কে দিয়ে বললে—'খেয়ে ফেল। মাছ না খেলে রোগা হবে।' রিদয় এবারে টপ-করে হাঁসের মতো সে দুটো গিলে ফেললে। তারপর খোঁড়া-হাঁসের পিঠে চড়ে নানা রকম খেলা চলল। কোনো দিন জলে বুনো-হাঁসদের সঙ্গে সাঁতার-খেলা, কোনো দিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই—এমনি সারাদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি! এমন আনন্দে রিদয় জন্মে কাটায়নি। পড়াশুনো সব বন্ধ,

একেবারে কৈলাস পর্যন্ত লম্বা ছুটি আর ছুট! খেলা শেষ হলে দু'তিন-ঘন্টা দুপুর-বেলায় ধলেশ্বরীর ভাঙনের উপরে বসে জিরোনো; বিকালে আবার খেলা; আবার চান; সন্ধ্যাবেলা খেয়ে নিয়েই ঘুম। রিদয়ের খাবার ভাবনা গেছে, শোবার কষ্ট মোটেই নেই। খোঁড়া-হাঁসের ডানায় এখন বেশ ভালো পালকের গদি পেতে সে বিছানা করে নিয়েছে, ঘুম পেলেই সেখানে ঢোকে। কেবল রাত হলেই তার ভয় আসে, বুঝি কাল সকালে বাড়ি ফিরতে হয়! কিন্তু হাঁসেরা তার ফেরবার কথাই আর তোলে না। একদিন দু'দিন তিনদিন হাঁসেরা সুরেশ্বরেই রইল; কোনো দিকে যাবার নামটি করলে না। রিদয়ও মনে ভরসা পেয়ে সুরেশ্বরের মন্দির, মঠ লুকিয়ে দেখে নিতে লাগল—চারদিক ঘুরে। চারদিনের দিন চকা-নিকোবরকে কাছে আসতে দেখেই রিদয় ভাবলে—এইবার যেতে হল ফিরে! চকা গম্ভীর হয়ে তাকে শুধোলে—"এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে কেমন?"

রিদয় একটু হেসে বললে—"চলছে মন্দ নয়। তবে শীতকাল, ফল বড় একটা নেই।"

চকা তাকে সঙ্গে নিয়ে এক-ঝাড় কাঁচা বেত দেখিয়ে বললে—"বেত খেয়ে দেখ দেখি কেমন মিষ্টি!"

রিদয় বেত অনেকবার খেয়েছিল, আরো খাবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই! কিন্তু চকার হুকুমে খেতে হল। খেয়ে দেখে মিষ্টি গুড়! ঠিক যেন আক চিবোচ্ছে।

চকা বললে—"কেমন ভালো লাগল কি? গুরুমশায় খাওয়ান শুকনো বেত, তাই লাগে বিশ্রী। যাহোক এখন বলি শোনো। এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভালো হচ্ছে না।"

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে!

চকা বললে—"এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে তা জানো? প্রথম হচ্ছে শেয়াল সে তোমার গন্ধে-গন্ধে ফিরছে সুবিধে পেলেই ধরবে। তারপর ভোঁদড়, ভাম দুজনে আছে—যেখানে সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনদিন! জলের ধারে উদবেড়াল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান! যেখানে-সেখানে জড়ো করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তার মধ্যে বেঁজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো পাতা-বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে শুতে যেয়ো না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কিনা, দেখা ভালো। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ—সেখানে বাজ-পাখি, চিল, কাক, শকুনি আছে কিনা? সেটা একবার-একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস-করে ঝোপে-ঝাড়ে উঠতে যেয়ো না; গেরো-বাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোনো দিকে পেঁচা ডাকল কি না। পেঁচারা এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল।'

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—"মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল-কুকুরের কিংবা শকুনের খাবার হতে আমি রাজি নই। এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?"

চকা একটু ভেবে বললে—"বনের যত ছোট পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবার চেষ্টা কর; তাহলে কাঠঠোকরা, ইঁদুর, কাঠবেরালি, খরগোস, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা দোয়েল এরা তোমায় সময়-মতো সাবধান করে দেবে; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এই সব ছোট জানোয়ারেরা তোমার জন্যে

প্রাণও দিতে পারে।'

চকার কথা-মতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেরালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয় সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেরালির গিয়ে গাছে ওঠা; আজ ল্যাজ-ফুলিয়ে কিচ-কিচ করে গালাগালি শুরু করা—"অত ভাবে আর কাজ নেই! তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়! কত পাখির বাসা ভেঙেছ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামা চাপা দিয়ে কত কাঠবেরালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনো তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড় বাসার কাছ থেকে।'

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেরালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালোমানুষ হয়ে গেছে; আস্তে-আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে। খোঁড়া-হাঁস বললে—"অত দৌড়ে কাঠবেরালের কাছে যাওয়াটা ভালো হয়নি। হঠাৎ কিছু একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে ভদ্রভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিংবা চুপি-চুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভালো হয়ে এসেছে। এমনি আর দিনকতক ভালোমানুষটি থাকলেই ওরা আপনি তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখ।'

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশু-পাখিদের কাজে লাগতে পারে, এমন সময় খবর হল, বেতগাঁয়ের একটা চাষা কাঠবেরালের বৌকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করেছে; আর সে বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল। খোঁড়া-হাঁস রিদয়কে বললে—"দেখ, যদি কাঠবেরালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।" রিদয় অমনি কোমর বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

লক্ষ্মীবার পিঠে পার্বণের দিন কাঠবেরালের বৌ চুরি হল সুরেশ্বরে, আর শনিবার বাগবাজারে ছাপার কাগজে বার হল সেই খবর। কাগজওয়ালা ছোঁড়াগুলো গলিতে-গলিতে হেঁকে চলল—

সুরেশ্বরের মজা ভারি—কাঠবেরালের বৌ চুরি।
বুড়ো-আংলা মানুষ এল, দুটো বাচ্ছা দিয়ে গেল।
মহন্ত ঠাকুর বড় দয়াল।
খাঁচা খুলে, ছেড়ে দিলে বাচ্চা সমেতে কাঠবেরাল।
মজার খবর এক পয়সা—পড়ে দেখ এক পয়সা!

কাণ্ডটা হয়েছিল এই। কাঠবেরালের বৌটি ছিল একেবারে শাদা ধপ-ধপে; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না। চোখ দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পা-গুলি গোলাপী, এমন কাঠবেরালি আলিপুরেও নেই। এ এক নতুনতর ছিষ্টি। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল-কোম্পানীর সায়েব-সুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাঠবেরালি ধরা দেয়নি। পোষ পার্বণের দিন বাদামতলী দিয়ে আসতে-আসতে এক চাষা এই কাঠবেরালিকে ঠোকা

চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি ইঁদুরের খাঁচায় বন্ধ করলে। পাড়ার লোক—ছেলে-বুড়ো এই আশ্চর্য কাঠবেরালি দেখতে দলে-দলে ছুটে এল। এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা-কল তৈরী করে এনে দিলে। খাঁচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খৈ রাখবার ঝাঁপি, বসবার চৌকি—এমন সব ঘর-কন্নার ছোট-ছোট সামগ্রী দিয়ে সাজানো। সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেরালি সুখে থাকবে—খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খৈ-দুধ খেয়ে মোটা হবে! কিন্তু কাঠবেরালি বৌ চুপনি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল আর থেকে-থেকে কিচ-কিচ করে কাঁদতে থাকল। সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতে দুললে না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও শুল না; কেবলি ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল।

সুরেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে চাষার বৌ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে পার্বণের পিঠে গড়ছিল। রান্নঘরে ভারি ধুম লেগে গেছে! উনুন জ্বলছে; ছেলে-মেয়েরা পিঠে ভাজার ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ পেয়ে সেদিকে দৌড়েছে। চাষার বৌ ঠাকুরের ভোগ মালপোগুলো কেবলি পুড়ে যাচ্ছে কেন, সেই ভাবনাতেই রয়েছে। ওদিকে উঠোনের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেরালির খাঁচাটির দিকে কি হচ্ছে, কেউ দেখছে না। চাষার দিদিমা, বুড়ি, সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সেই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেরালির খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা-সন্ধ্যে কাঠবেরালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে। এই খাঁচার পাশেই গোয়াল, তার কাছেই সদর দরজা—খোলা। বুড়ি স্পষ্ট দেখলে বুড়ো আঙুলের মতো একটি মানুষ উঠোনে ঢুকল। যক্ দেখলে ধনদৌলত বাড়ে, বুড়ি সেটা জানে, কাজেই বুড়ো-আংলাকে দেখে সে একটুও ভয় পেলে না। বুড়ো-আংলা বাড়িতে ঢুকেই কাঠবেরালির খাঁচাটার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু খাঁচাটা উঁচুতে ঝুলছে; কাছে একটা পাকাটি ছিল, বুড়ো-আংলা সেইটা টেনে খাঁচায় লাগিয়ে সিঁড়ির মতো সোজা কাটি বেয়ে খাঁচায় চড়ে খাঁচার দরজা ধরে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। বুড়ি জানে খাঁচার তালা বন্ধ, সে কাউকে না ডেকে চুপ করে দেখতে লাগল—কি হয়! কাঠবেরালি বুড়ো-আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস-ফিস করে কি যেন বললে, তরপর বুড়ো-আংলা কাটি-বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিলে বনের দিকে। বুড়ি ভাবছে যক্ আর আসে কিনা, এমন সময় দেখলে বুড়ো আংলা ছুটতে ছুটতে আবার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার দুটো কি রয়েছে। বুড়ি তা দেখেতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে স্পষ্ট দেখলে যে বুড়ো আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে আর একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল। তারপর এক হাতে খাঁচার কাটি ফাঁক করে জিনিসটা খাঁচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিসটা নিয়ে আবার তেমনি করে খাঁচায় দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, সে ভাবলে, যক্ বোধ হয় তার জন্যে সাত-রাজার ধন মানিক-জোড় রেখে পালাল। খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো-বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কি হয় দেখতে। বুড়ি পৌষমাসের হিমে উঠোন দিয়ে চলেছে, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ, আবার বুড়ো-আংলা হাতে দুটো কি নিয়ে! এবার বুড়ো-আংলার হাতের জিনিস কিচ-

কিচ করে ডেকে উঠল। বুড়ি বুঝলে যক্ কাঠবেরালির ছানাগুলিকে দিতে এসেছে—তাদের মায়ের কাছে। দিদিমা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলে, যক্ আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—ছানা দুটি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো-আংলা আগের মতো কাটি-বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—"ওরে তোরা দেখে আয় না!"

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেড়ালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি! সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত! ওদিকে চাষার বৌ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপোভোগও হয় না, তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—"ওই কাঠবেরালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর-কোনো দেবী ওঁকে ছোনা-পোনা সুদ্ধ বন্ধ করেছে, হয়তো সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো-ভোগ পিঠে ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনি ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এস। না হলে আরো বিপদ ঘটতে পারে।"

চাষা তো ভয়ে অস্থির! গ্রামসুদ্ধ কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে বনে কাঠবেরালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে। বুড়ি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে, আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' বলে খবরের কাগজের সম্পাদক খবরটা শেষ করলেন। এই বুড়ো-আংলাটি কিনি—লোকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সুরেশ্বরে, বাগবাজারে, ফরিদপুরে, যশোহরে, ময়মনসিংহে, আগরতলায়, আসামে, কাছাড়ে!

এই ঘটনার দুইদিন পরে আর এক কাণ্ড। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে এক হয়েছে, সেইখানে আড়ালিয়ার চর। বুনো হাঁসের সঙ্গে রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া-হাঁস সেই চরে চরতে নামল। চরটা কেবল বালি, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঝাউ, আর এখানে-ওখানে শুকনো ঘাস। চরের একদিকে আড়ালিয়া গ্রাম। হাঁসরা চরছে, এমন সময় চরের উপরে কতকগুলো জেলের ছেলে খেলতে এল। মানুষ দেখেই চকা হাঁক দিলে, আর অমনি সব বুনো-হাঁস ডানা-মেলে উড়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়া-হাঁস ছেলে দেখে একটুও ভয় পেলে না। বরং গলা চড়িয়ে বুনো-হাঁসদের বললে, "ছেলে দেখে ভয় কি?"

রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে নেমে একটা ঝাউতলায় বসে ঝাউফুল কুড়িয়ে মার্বেল খেলছে, ছেলেগুলো কাছে আসতেই সে একবার শিস দিয়ে খোঁড়াকে সাবধান করে একটা ঘাস-বনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়ার আজ কি যে হল, সে যেমন চরছিল তেমনি চরে বেড়াতে লাগল। ছেলেদুটো একটা বালির ঢিপি ঘুরে একেবারে দুদিক থেকে হাঁসকে তাড়া করলে। কেমন করে যে তারা এত কাছে হঠাৎ এসে পড়ল, ভেবে না পেয়ে খোঁড়া একেবারে হতভম্ব। উড়তে যে জানে তা মনেই এল না। সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একটা ডোবার কাছে গিয়ে খোঁড়া ধরা পড়ে গেল।

রিদয়ের প্রথমে মনে এল যে ছুটে গিয়ে ছেলে-দুটোকে থাবড়া মেড়ে হাঁসটা কেড়ে

নেয় কিন্তু তখনি মনে পড়ল, সে ছোট হয়ে গেছে। তখন সে রেগে বসে-বসে কেবল বালি খুঁড়তে লাগল। এদিকে খোঁড়া ডাকছে—"বুড়ো-আংলা ভাই লক্ষ্মীটি, আমায় বাঁচাও।"

"ধরা পরে এখন বাঁচাও!" —বলে রিদয় ছেলে দুটোর সঙ্গে দৌড়ল। ছেলে দুটো হাঁস নিয়ে একটা নালা পেরিয়ে চর ছেড়ে গ্রামে ঢুকল।

রিদয় আর তাদের দেখতে পেলে না। নালায় অনেক জল। রিদয় অনেকটা ঘুরে তবে একটা শুকনো গাছের ডাল বেয়ে ওপারে উঠে, হাঁসকে খুঁজতে মাটির উপর ছেলেদের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। একটা চৌমাথায় দেখা গেল, ছেলে-দুটো দুদিকে গেছে। কোন পথে যাওয়া যায়, রিদয় ভাবছে, এমন সময় বাঁকের রাস্তায় একটা হাঁসের পালক রয়েছে দেখে রিদয় বুঝলে হাঁস এই পথে গেছে—পালক ফেলতে-ফেলতে যাতে সে সন্ধান পায় সেই জন্যে।

রিদয় পালকের চিহ্ন ধরে দুটো মাঠ পেরিয়ে গ্রামের একটা সরু গলি পেলে। গলির মোড়ে একটা মন্দির। হাঁস কোথায় দেখা নেই। মন্দিরের খিলানের উপর লেখা 'হংসেশ্বরী'। আর তারি উপরে মাটির গড়া এক হাঁস। রিদয় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, এদিকে পিছনে প্রায় একশো লোক জমা হয়েছে—নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, নেড়া মাথা বৈরাগীর দল। রিদয় যেমনি ফিরেছে অমনি সবাই মাটিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললে—"জয়, প্রভু বামনদেব, ঠাকুর, কৃপা কর!"

বামন কে, রিদয় তা জানত না, কিন্তু প্রাণামের ঘটা দেখে সে বুঝলে, সবাই তাকে দেবতা ভেবেছে। রিদয় অমনি গম্ভীর হয়ে বললে—"তোমরা আমরা হাঁস চুরি করেছ, এখনি এনে দাও। না হলে হংসেশ্বরীর কোপে পড়ে যাবে।"

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন হংসেশ্বরীর পাণ্ডা গলবস্তর হয়ে বললে,—"ঠাকুর, হাঁস কোথায় আছে বলে দিন, এখনি এনে দিচ্ছি!"

রিদয় রেগে বলে উঠল—"কোথায় জানলে কি তোমাদের আনতে বলি? এই গ্রামের দুটো ছেলে তাকে নিয়ে এসেছে—এই দিকে!"

এই কথা হচ্ছে এমন সময় মন্দিরের পিছনে দিকে হাঁসের ডাক শোনা গেল। বেচারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। রিদয় দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের উঠোনে এক বুড়ি খোঁড়া-হাঁসকে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে ডানা কেটে দেবার উদ্যোগ করছে।—দুটো পালক কেটেছে, আর দুটো মুঠিয়ে ধরে কাটবার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ বুড়ো-আংলা-রিদয়কে দেখে বুড়ি একেবারে হাঁ হয়ে গেল! সেই সময়ে যত নেড়ানেড়ির দল ছুটে এসে হৈ-হৈ করে বুড়ির হাত থেকে খোঁড়া-হাঁস ছাড়িয়ে নিলে। রিদয় হাঁসের উপরে চড়ে বসল আর অমনি রাজহাঁস তাকে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল!

বৈরাগীর দল সেই হাঁসের পালক হংসেশ্বরীর পরমহংস-বাবাজীর কাছে হাজির করে দিলে। তিনি পালক-কটি একটা হাঁড়িতে রেখে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—"অভুতপূর্ব ঘটনা। হংসেশ্বরীর রাজহংস স্বশরীরে বামনদেবকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দুটি পালক রক্ষা করে গেছেন। সে জন্যে একটি সোনার কৌটার প্রয়োজন। হিন্দুমাত্রেরই এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। চাঁদা আমার কাছে মঃ অঃ করিয়া পাঠাইবেন। ইতি—সুরেশ্বরের পরমহংস বাবাজী।'

মানুষদের মধ্যে যেমন খবরের কাগজ, পাখিদের মধ্যে তেমনি খবর রটাবার জন্য পাখি আছে। কোথাও কিছু নতুন কাণ্ড হলেই সেই জায়গাটার উপরে প্রথমে কাক-চিল জড়ো হয়, তারপর তাদের মুখে এ-পাখি, এ-পাখির মুখে ও-পাখি—এমনি এ-বন, সে-বন, সে-বন, এ-দেশ, সে-দেশে দেখতে-দেখতে খবর রটে যায়।

কাঠবেরালির কথা আর খোঁড়া-হাঁস উদ্ধারের কথা রিদয় ফিরে আসার পূর্বে হাঁসের দলে, বনে-জঙ্গলে জলে-স্থলে কোনো জানোয়ারের জানতে আর বাকি রইল না। গাছে গাছে তাল-চড়াই, গাং-শালিক—এরা সুরে-তালে রিদয়ের কীর্তি-কথা ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল:

শুন এবে অবধান পশুপক্ষিগণ।
বুড়ো-আংলা মহাকাব্য করি বিবরণ।।
কাঠবেরালি রামদাস তাহারে উদ্ধারি।
বীরদাপে চলে যথা রাজ হংসেশ্বরী।।
হাঁসের পালক দুটা কেটে নিল বুড়ি।
যাহে লেখা যায় মাহাকাব্য ঝুড়ি ঝুড়ি।।
হাঁসের দুর্দশা দেখি আংলা বুড়ো ধায়।
হংসেশ্বরী ছাড়ি বুড়ি পালায় ঢাকায়।।
মোহন্ত তুলিয়া নিল হংসের কলম।
সোনা চাই বলি তাহে লেখে বিজ্ঞাপন।।
তালচটক তাল ধরে গানশালিক কয়।
সুবচনী হাঁস নিয়ে চলিল রিদয়।।
খোঁড়া-হাঁসেরে লইয়া, খোঁড়া-হাঁসেরে লইয়া
রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া।
আংলা বিজয় নামে কাব্য চমৎকার।
গোটা দুই শ্লোক তারি দিনু উপহার।।
সকলে শুনহ আর শুনাহ অন্যকে।
ক্ষীর হতে নীর পিয়ে ধন্য হোক লোকে।।
ইতি আংলা বিজয় মহাকাব্যে প্রথম সর্গঃ।

আজ চকা-নিকোবর ভারি খুশি। সে রিদয়কে কুর্নিস করে বললে—"একবার নয়, বার-বার তিনবার তুমি দেখিয়েছে যে পশু-পাখিদের তুমি পরম বন্ধু। প্রথমে শেয়ালের মুখ থেকে বুনো-হাঁস 'লুসাইকে' উদ্ধার, তার পরে কাঠবেরালির উপকার, সব শেষে পোষা-হাঁসকে বাঁচানো। তোমার ভালোবাসায় আমরা কেনা হয়ে রইলেম। আর তোমায় আমরা ফেরাতে চাইনে। তোমার যদি মানুষ হতে ইচ্ছে হয় তো বল আমি নিজে গণেশঠাকুরকে তোমার জন্যে 'রেকমেণ্ডেসন' পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রিদয়ের আর মোটেই মানুষ হতে ইচ্ছে ছিল না। হাঁসেদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ দেখতে-দেখতে বড় মজাতেই সে দিন কাটাচ্ছে। তবু মানুষ হবার রেকমেন্ডেসনখানা না নিলে চকা

পাছে কিছু মনে করে, সেই ভয়ে বললে—"মানুষ হবার সময় হলে আমি তোমাকে জানাব। এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমি ইচ্ছে করেছি।"

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—"সেই ভালো; যখন ইচ্ছে হবে বল, আমি সার্টিফিকিট দিয়ে তোমাকে গণেশের কাছে পাঠাব। এখন হাঁসের দলে হংসপাল হয়ে থাক।" বলে চকা রিদয়ের মাথাটা ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিলে। অমনি চারিদিকে বুনো-হাঁস রিদয়ের নতুন উপাধি ফুকরে উঠল—"হংপাল! হংপাল!"

বনের পাখিরা প্রতিধ্বনি করলে—"হি-রি-দ-য় হংসপাল।"

টুং-সোন্নাটা-ঘুম

সুরেশ্বর ছেড়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদিন রোদে কাঠ ফাটছিল। সকালে যখন হাঁসের দল যাত্রা করে বার হল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের রাস্তা ধরে যতই তারা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলল, ততই মেঘ আর কুয়াশা আর সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি দেখা দিলে! হাঁসের ডানায় পাহাড়ের হাওয়া লেগেছে, তারা মেঘ কাটিয়ে হু হু করে চলেছে; মাটির পাখিদের সঙ্গে রঙতামাশা করে বকতে-বকতে চলবার আর সময় নেই, তারা কেবলি টানা সুরে ডেকে চলেছে—'কোথায়, হেথায়, কোথায়, হেথায়।'

হাঁসের দলের সাড়া পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দুপারের কুঁকড়ো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জানান দিতে শুরু করলে। পুব-পারের কুঁকড়ো হাঁকালে—"সাতনল চন্দনপুর, কোমিল্লা, আগরতলার রাজবাড়ি, টিপারা, হীলটিপারা!' পশ্চিমপারের কুঁকড়ো হাঁকলে—"মীরকদম, নারাণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, মুড়াপাড়া।" পুবে হাঁকলে—"ভেংচার চর," পশ্চিমে হাঁকলে—"চর ভিন-দোর।"

হাঁসেরা তেজে চলেছে, এবার ছোট-ছোট গ্রাম, নদীর আর নাম শোনা যাচ্ছে না, বড়-বড় জায়গায় কুঁকড়ো হাঁকছে—'পাবনা, রামপুরবোয়ালিয়া বোগরা, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি!' পুবের কুঁকড়ো অমনি ডেকে বললে—'খাসিয়া-পাহাড়, গারো-পাহাড়, জৈঁতিয়া-পর্বত, কামরূপ।'

বুনো-হাঁসের দল পাহাড়-পর্বত অনেক দেখেছে, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে মানস-সরোবরে চট করে গিয়ে পড়া গেলেও তারা শিলিগুড়ি থেকে ডাইনে ফিরে, ফুলচারি, হাড়গিলের চর, ধুবড়ি, শিলং, গৌহাটি, দিব্রুগড়, কামরূপ হয়ে যাবার মতলবই করলে, কেননা, দার্জিলিঙ হয়ে যাওয়া মানে ঝড়-ঝাপটা বরফের উপর দিয়ে যাওয়া, আর কামরূপের পথে গেলে ব্রহ্মপুত্র-নদের দুধারে নগরে গ্রামে চরে জিরিয়ে যাওয়া চলে।

রিদয় কিন্তু বেঁকে বসল, এত কাছে এসে দার্জিলিঙ যদি দেখা না হল তো হল কি? খোঁড়া-হাঁসের যদিও পায়ে বাত তবু রিদয়ের কথাতেই সে সায় দিয়ে বসল! ঠিক এই সময় শিলিগুড়ি থেকে ছোট রেল বাঁশি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, রিদয় আকাশের উপর থেকে দেখলে, যেন শাদা-কালো একটি গুটিপোকা এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে—হাঁসে চড়া রিদয়ের অভ্যেস, রেল এত ঢিমে চলেছে দেখে ভেবেছিল, গুগলীর মতো কত বছরই লাগবে ওটার দার্জিলিঙ পৌঁছতে?'

রিদয় চকাকে শুধোলে, "ওটা কতদিনে দার্জিলিঙ পৌছবে?"

চকা উত্তর দিলে—"এই সকাল আটটায় ছাড়ল, বেলা তিনটে-চারটেতে পৌঁছে যাবে!"

"আর আমরা কতক্ষণে সেখানে যেতে পারি"—রিদয় শুধোলে।

চকা উত্তর করলে—"যদি রাস্তায় কুয়াশা, হিম না পাই, তবে বড় জোর এক-ঘণ্টায় 'ঘুম-লেকে' গিয়ে নামতে পারি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে সিঞ্চল, কার্লিম্পং, লিবং সন্দকফু থেকে কাঞ্চনজঙঘা দেখে কার্সিয়াং টুং-সোনাদা হয়ে আবার ঘুমেতে নেমে একটু জল খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ দার্জিলিঙ-ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ির গুম্ফার কাছটায় তোমায় নামিয়ে দিতে পারি। আমরা তিব্বতের হাঁস, তার ওদিকে আর আমাদের যাবার যো নেই—গেলেই গোরারা গুলি চালাবে!'

এত সহজে দার্জিলিঙ দেখা যাবে জেনে খোঁড়া-হাঁস পর্যন্ত নেচে উঠল। চকা তখন বললে—"এতবড় দল নিয়ে তো পাহাড়ে চলা দায়, ছোট রেলের মতো আমাদেরও দল ছোট করে ফেলা যাক। বড়-দলটা নিয়ে আন্দামানি কামরূপে হাড়গিলে চরে গিয়ে অপেক্ষা করুক; আর আমি, খোঁড়া, হংপাল, কাটচাল, নানকৌড়ি, চল দার্জিলিঙ দেখে আসি।' শিলিগুড়ি থেকে হাঁসের দল দুই ভাগ হয়ে চলল, ঠিক সেই সময় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামল। কাঠ-ফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে মাটি ভিজে উঠেছে, পাতা গজিয়ে উঠেছে, বনের পাখিরা আনন্দে উলু-উলু দিয়ে কেবলি বলতে লেগেছে, বৃষ্টির গান :

বিষ্টি পরে টাপুর-টুপুর
বাজছে বাদল গামুর-গুমুর
ডাল-চাল আর মক্কা-মসুর
ফোঁটায়-ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে—
জলে সাথে নামে—
ঘরে ঘরে নামে—
টাপুর-টুপুর গামুর-গুমুর
গামুর-গুমুর টাপুর-টুপুর।

'তিস্তা' নদীর কাছে এসে হাঁসেরা শুনলে, নদীর দুপারে সবাই বলছে।

মেঘে লেগেছে কালা-ধলা
বইছে বাতাস জলা-জলা
বরফ-গলা পাগলা-ঝোরা
শুকনো ধুয়ে আসে
তিস্তা নদীর পাশে—
ঝাপুর-ঝুপুর ছাপুর-ছুপুর
ছাপুর-ছুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।

নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে, আকাশের হাঁসেরাই বা চুপ করে থাকে কেমন করে, তারা পাহাড়ে গাঁয়ে সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক-সবজি ক্ষেতগুলোর ধার দিয়ে ডাকতে-ডাকতে চলল,—"রসা জমি ধসে পড় না, বসে থেক না, ফসল ধরাও ফল ধরাও নতুন বীজে ফল ধরাও!"

পাগলা-ঝোরার কাছ বরাবর এসে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ হাঁসেদের সঙ্গ নিয়ে উত্তর-মুখে উড়ে চলল। কলকাতার এক বাবু পাহাড়ে রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকে-কানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে-টানতে ছাতা খুলে হাঁফাতে-হাঁফেতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়ি-মুখো হয়েছেন দেখে হাঁসেরা রঙ্গ জুড়লে;

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাউরুটি
হয় না তো সিটি!
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!
জল না হলে গাছে-গাছে ফলে পেঁপে আতা?
জল না পেলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা।
হত নাকো রবার গাছ কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখ—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেক!
সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—
বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জ্বলবে আঁত
না পাবে নদীতে মাচ ক্ষেতেতে ফসল—
ফোঁটা-ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখের জল।

বাবু একবার ছাতার মধ্যে থেকে আকাশে চেয়ে দেখলেন, রিদয় টুপ করে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাততালি দিতে-দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে-বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে-আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পকরথের মতো। তিন দরিয়ার অনেক উপরে দুই পাহাড়ের দেয়াল যেন কেল্লার বুরুজের মতো সোজা আকাশ ঠেলে উঠেছে একেবারে মেঘের কাছে, তারি গায়ে পাগলা-ঝোরা ঝরনা শাদা পৈতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে ঝুলে পড়েছে—এই পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাঁসেরা কার্সিয়ং-এর মুখে চলল পাংখাবাড়ি থেকে কার্সিয়ং দুধারে ঝরনা আর চা বাগান, সবজীক্ষেত থাকে-থাকে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বস্তি, সাহেবদের কুঠি, কার্সিয়ং শহরটা যেন আর একটা ঝরনার মতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ি গোলাপ গেঁদা গাছ-আগাছায় কুঁড়ি ধরেছে।

বাঁ ধারে দূরে কালো-কালো পাহাড়ের শিখরে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার মতো উথলে পড়েছে। একদল বাঙালি বৌ ছেলেপুলে নিয়ে কার্সিয়ং-এর ইস্টিশনের উপরের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—গিন্নি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন, তিনি ছাতি মাথায় দাণ্ডি চেপে চলেছেন, কর্তা লাঠি ধরে সঙ্গে, পিছনে চার মেয়ে, ছোট বড় তিন ছেলে, এক বৌ

দুই জামাই একপাল নাতিপুতি হাসি-খুশি লুটোপুটি করে চলেছে! কেউ পাহাড় থেকে ফুল তুলছে, কেউ রাস্তা থেকে নুড়ি কুড়োচ্ছে, একটা ছেলের হাতে প্রজাপতির কুড়োজাল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বলল—'ধর না ধর না, যক্ হবে।"

হাঁসেরা বলে চলল—"ফুল যত চাও তোল, গোলাপ ফুটল বলে, গাঁদা ওই ফুটেছে, চেরি ফুলে রঙ ধরেছে, আমরা এনেছি, নাও কলাই-শুটি নাও, ফুলকপি নাও, আপেল নাও, নাসপাতি যত পার নাও খাও দাও থোও, প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

দেখতে দেখতে মেঘে কার্সিয়ং ঢেকে গেল, ছেলে-বুড়ো ঘর বাড়ি বাজার-ইস্টিশান মায় ছোট রেল গিদা পাহাড় ডাউন হিল সব কুয়াশায় চাপা পড়ল, দুরে সিঞ্চল মেঘের উপরে মাথা তুলে দেখা দিল! এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়া-হাঁস ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে শীতে থরথর করে বেচারা কাঁপতে লাগল, খোঁড়াও বাঙালাদেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার পালকগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ডাক দিলে—"শীত-শীত হংপাল শীতে গেল।"

চকা হাঁকলে—"নেমে পড় কার্সিয়ং!"

হাঁসরা অমনি মেঘের মধ্যে দিয়ে নামতে শুরু করলে। রিদয় দেখল, মেঘের মধ্যেটায় খোলা আকাশের চেয়ে কম ঠাণ্ডা, যেন পাতলা তুলোর বালাপোষ গায়ে দিয়েছে। হাঁসেরা নামতে-নামতে একটা বাড়ির ছাতে এসে বসল। বাড়ির বাইরে কেউ নেই, কুয়াশায় ভয়ে সবাই ঘরে কাঁচ বন্ধ করে বসেছে, বাইরে কেবল গালফুলো একটুখানি একটা পাহাড়ি ছোঁড়া আগুন জ্বেলে কচি ছেলের একজোড়া পশমের মোজা তাতিয়ে নিচ্ছে আর সেই সঙ্গে নিজের হাতে পা-গুলোও একটু সেঁকে নিচ্ছে, এমন সময় ঘর থেকে বাড়ির গিন্নি ডাক দিলেন—'টুকনী!"

ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাতের মোজা জোড়া মাটিতে ফেলে দৌড় দিলে, চকা অমনি ছোঁ দিয়ে মোজাটা নিয়ে রিদয়কে দিয়ে বললে—"পড়ে ফেল উলের জামা।" রিদয় মোজাটা মাথায় গলিয়ে ছেঁড়া মোজার তিনটে ছেঁদা দিয়ে হাত আর মাথা বার করে ফিট হয়ে যেন সোয়েটার পরে দাঁড়াল।

হাঁসের দল তাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উঠল—টুকনী ছোঁড়াটা নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল—"আরে-আরে হাঁস মোজা লেকে ভাগা!"

রিদয় শুনলে গিন্নি চেঁচাচ্ছেন—"হাঁসে কখনো মোজা নেয়? নিশ্চয় মোজাটা পুড়িয়ে রেখে মিছে কথা বলছে! ফের ঝুটবাত বোলতা!"

টুকনীর মোজা-পোড়ানোর মামলার শেষ কি হল দেখবার আর সময় হল না। মেঘ তখন মুষল ধারায় জল ঢালতে আরম্ভ করেছে, হাঁসেরা তাড়াতাড়ি মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল আর বন-জঙ্গলকে ডেকে বলতে লাগল—"কত জল আর চাই বল, তেষ্টা যে মেটে না দেখি, মেটে না দেখি।" কিন্তু দেখতে-দেখতে আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে গেল, সূর্য কোথায় কোনদিকে তার ঠিক নেই, হাঁসেদের ডানার উপরে বিষ্টি ক্রমাগত চাবুকের মতো পড়ছে, ডানার পালক ভিজে তাদের বুকের পালকে পর্যন্ত জল সেঁধিয়েছে, পাহাড়-পর্বত চড়াই-নাবাই গাছ-পালা ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে—দু'হাত আগে নজর চলে না। পাখিদের গান থেমে গেছে। হাঁসেরা চলেছে, ধীরে-ধীরে পথ খুঁজে-খুঁজে; রিদয় শীতে কাঁপছে আর ভাবছে, চুরি করার এই শাস্তি।

এই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চকা-নিকোবর যখন তাদের কটিকে নিয়ে সিঞ্চল পাহাড়ের সিঙে একটা ঝাউতলায় এসে বসল, তখন যেন রিদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পাহাড়ের চুড়োয় কেবল সোনালী ঘাসের বন আর এক-একটা ছাতার মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথর বরফ-জল বয়ে চলেছে, পাতায়-পাতায় টিপটিপ করে বিষ্টি লাগছে, কিন্তু শীত হলেও হাওয়া এখানে এমন পরিষ্কার যে রিদয় আনন্দে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল! বুনো-টেঁপারি-সোনালী-পাতা রুপোলি পাতা সোনা-ঘাস রুপো-ঘাস তুলে-তুলে রিদয় বোঝা বাঁধছে দেখে চকা হেসে বললে—'এগুলো হবে কি?"

রিদয় অমনি বলে উঠল—"দেশে গিয়ে দেখাব!"

খোঁড়া-হাঁস ভয় পেয়ে বললে—"ওই মস্ত বোঝা নিয়ে ওড়া আমার কর্ম নয়, তুমি তবে রেলে করে বাড়ি যাও!"

চকা রিদয়কে ডেকে বললে—"খুব কাজের জিনিস ছাড়া একটি বাজে জিনিস সঙ্গে নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়, পেট ভরে টেঁপারি খাও তাতে আপত্তি নেই, ঘাস দুকানে দুটো গুঁজতে পার তার বেশি নয়!"

রিদয় দুকানে দুটো ঘাস গুঁজে টেঁপারি খেয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় ভালুকের সঙ্গে দেখা! রিদয় ভালুক নাচ অনেক দেখেছে কিন্তু এত বড় এমন রোঁয়াওয়ালা মিস-কালো ভালুক সে কোনোদিন দেখেনি, ভালুক তাকে দেখে দু'পা তুলে থপ-থপ করে এগিয়ে এসে বললে—"এখানে মানুষ হয়ে কি করতে এসেছ? পালাও না হলে শীতে মরে যাবে, বড় খারাপ জায়গা। গোরাগুলো পর্যন্ত এখানে টিকতে পারেনি, কত লোক যে এখানে ঠাণ্ডা আর রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে কেঁপে মরেছে, তার ঠিক নেই। এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল কাপ্তেন জাঁদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর কেউ নেই। কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা বাজার শহর, কেবল দেখ চারদিকে আগুন জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভূত বেরিয়ে এই-সব ভাঙাচুলির ধারে বসে আগুন পোহায় আর মদ খায়, হুক্কা-হুয়া গান গায়।'

ঠিক এই সময়ে শেয়াল-ডাকের মতো গান শোনা গেল, আর মেম সঙ্গে একটা গোরা বোতল হাতে টলতে-টলতে আসছে দেখা গেল। ভালুককে দূর থেকে দেখেই গোরা যেমন বন্দুক উঁচিয়েছে, অমনি ভালুক চট করে গাছের তলায় অন্ধকারে কালোয়-কালো মিশিয়ে গেছে! রিদয়ের গায়ে টকটকে মোজা—মেম তাকে ভাবলে কার পোষা ছোট বাঁদর, সে অমনি মাংকি-মাংকি বলে রিদয়কে ধরতে ছুটল। রিদয় তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে অমনি পাহাড় থেকে গড়াতে-গড়াতে একেবারে কার্ট রোডে মাল-বোঝাই ছোট রেলের ছাতে এসে চিৎপাত!

রেলটা ঝরনা থেকে ফোঁস-ফোঁস করে খানিক জল ইঞ্জিনে ভরে নিয়ে ঘুম জোড়াবাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভক-ভক করে বকতে-বকতে। এদিকে ভালুকের কাছ খবর পেয়ে হাঁসেরা উড়েছে, ঠিক রেলের সঙ্গে-সঙ্গে তারা দেখছে, রিদয় মালগাড়ির উপরটায় যেন একটি লাল নিশেনের মতো লটপট করছে। ঘুম বস্তিতে এসে রেল থামল। হাঁসেরা অমনি হাঁক দিলে—"ঘুম লেক যাও তো নেমে পড়!" কিন্তু তখন গাড়ির ঝাঁকানিতে রিদয়ের ঘুম এসেছে, সে হাত নেড়ে জানালে—"দার্জিলিঙ যাব!" এই সময় গাড়ির মধ্য থেকে একপাল ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—'টুং সোনাদা ঘুম!" রিদয় চমকে উঠে দেখলে গাড়ি ছেড়েছে।

ঘুমের পরেই 'বাতাসীয়া' নতুন লাইন খুলেছে—এক-একটা পাহাড় কেটে সেগুলো কেল্লার বুরুজের মতো পাথরের টালি দিয়ে পাহাড়ি মিস্ত্রি সব গেঁথে তুলেছে। রিদয়ের মনে হল, ঠিক যেন কেল্লার মধ্যে ঢুকেছি! ঠিক সেই সময় হাঁসের দল ডাক দিল—"বাতাসীয়া বাতাস-জোর, ধরে বস!" কিন্তু গুছিয়ে বসবার আগেই রিদয় বাতাসে লাল ছাতার মতো উড়ে একেবারে পথের মাঝে এসে বসল। সোঁ-সোঁ করে বাঁশি দিয়ে রেল দার্জিলিঙের দিকে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের মোড়াটা সুনসান, লোক নেই, দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসছে। রিদয় আস্তে-আস্তে সেই মোষের গাড়ি ধরে ঝুলতে-ঝুলতে দার্জিলিঙের বাজারে হাজির। হাঁসেরা মাথার উপরে ডাক দিয়ে গেল—"আলুবাড়ি গুম্ফা মনে রেখ, সেখানে আমরা রইব।" রিদয় আলুবাড়ি-আলুবাড়ি নাম মুখস্থ করতে-করতে বাজার দেখতে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—অন্ধকারে রিদয় ভিড়ের মধ্যে মিশে চলেছে। বাজারের ওধারে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ে বরফের উপর সন্ধ্যার আলো যেন সোনার মতো ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর গোলাপি, গোলাপি থেকে বেগুনি হয়ে আবার যে শাদা সেই শাদা বরফ দেখা দিলে। সেই সময় চৌরাস্তায় গোরার বাদ্যি শুরু হল,আর দলে-দলে লোক সেই দিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে জুতো, খাবার, বাসন, গহনার দোকান—এখানে-ওখানে ভুটিয়া লামারা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে ঘণ্টা-ডমরু বাজিয়ে নন্দি-ভৃঙ্গির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তা কখনো রিদয় ভাঙেনি, দু-এক চড়াই উঠে বেচারা হাঁপিয়ে পড়ল। কোথায় বসে জিরোয় ভাবছে এমন সময় একটা খেলনার দোকানে নজর পড়ল, সেখানে লাল উলের মোজা পরানো ঠিক তারি মতো অনেকগুলো পুতুল সার্শির গায়ে কাগজের বাক্সোতে দাঁড় করানো রয়েছে। রিদয় চুপি-চুপি দোকানে ঢুকে একটা খালি বাক্স দেখে তারি মধ্যে শুয়ে রইল।

সার্শিমোড়া দোকানের মধ্যে বেশ গরম, এক খোট্টা বাবু বসে বিড়ি টানছেন আর একটা ভুটিয়া মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের মধ্যে ফুটবল পোস্টকার্ড নানা পুতুল লজঞ্চুস মার্বেল এমনি সব সাজানো, দরজার উপরটায় একটা বিভীষণের মুখোশ হাঁ করে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে! রিদয় মুখোশটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে এমন সময় এক বাবু দোকানে ঢুকেই বলে উঠলেন—"ওহে মার্কণ্ড, ছোট-খাটো দুটো পুতুল দাও দেখি, টুনু আর সুরূপার জন্যে।"

মার্কণ্ড তাড়াতাড়ি রিদয় যে-বাক্সে ছিল সেই বাক্সে আর একটা বিবি পুতুল দিয়ে কাগজে মুড়ে বাবুর হাতে দিলে। বাবু সেটাকে আলখাল্লার পকেটে ফেলে চুরুট ধরিয়ে পাহাড়ে রাস্তায় ঠক-ঠক লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে বাড়ি-মুখো হলেন। পকেটের মধ্যে গরম পেয়ে রিদয় বিবি-পুতুলটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার যখন চোখ মেলে চাইলে তখন দেখলে বাক্সর ডালাটা খুলে গেছে। একটা কাঁচ-মোড়া বারাণ্ডায় গোটাকতক তুলি, এক বাক্স রঙ, একটা গদি মোড়া চৌকি, তারি উপরে একটা এতটুকু কালো কুকুর বাক্স থেকে তাকে টানাটানি করে খেলবার চেষ্টা করছে! কুকুরটা যদি কামড়ে দেয়—! রিদয় ভাবছে, এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এল 'টমা-টমা-টমাসে!' কুকুরটা দৌড়ে ওঘরে গেল, সেই ফাঁকে রিদয় বাক্স থেকে চোঁচা দৌড়।

বাড়ির বাইরে থেকে সার্শিতে মুখ লাগিয়ে দেখলে একটা লাল-কম্বল-পাতা খাটে ছেলে-মেয়ে একদল বসে তাদের বড় ভাইটির কাছে গল্প শুনছে, আর একটা ছোট ছেলে

ভুটিয়াদের লাল কাপড় পরে যে গল্প বলছে তারা গলা জড়িয়ে ডাকছে—"পাখম দাদা, পাখম দাদা!"

শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি—এই ছেলের দল, এই হাসি-খুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে লাগল। তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে অথচ সব থেকেও নেই। কোথায় রইল তাদের আমতলি, কোথায় সেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরগুলি! রিদয়ের প্রাণ চাইছে এই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে, কিন্তু হায়, সে বুড়ো-আংলা যক্ হয়ে গেছে, আর কি মানুষের ঘরে তার স্থান হবে। বুড়ো-আংলা জানলার বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সেই সময় বাবু ওধারে হুকুম দিলেন—"এ রবতেন কাল আলুবাড়ি জানে হোগা, ডাণ্ডি রাখ যাও!"

রবতেন ডাণ্ডিখানা জানলার ধারে বারাণ্ডায় রেখে চলে গেল। রিদয় সে-রাত ডাণ্ডির ছৈটার মধ্যে কাটিয়ে বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি ডাণ্ডিতে লুকিয়ে রওনা হল। পুতুলের মধ্যে টুনুর পুতুলটাই পাওয়া গেল, সুরূপার পুতুলটা নিশ্চয়ই টমা মুখে করে কোথায় ফেলেছে বলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান হল না। সুরূপা টমার পিঠে দুই থাবড়া বসিয়ে পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আলুবাড়ি থেকে রিদয়কে পিঠে নিয়ে জলা-পাহাড় কাট-পাহাড় পেরিয়ে হাঁসেরা এমন মেঘ আর শিলা-বৃষ্টি পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেই এগোতে পারল না, তাড়াতাড়ি ঘুরে ঝুপ-ঝাপ ঘুম-লেকে গিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর শিল পড়েছে, লেকের জলের উপরে বরফের সর পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বরফে শাদা হয়ে গেছে, খোঁড়া-হাঁসের পায়ের বাত কট-কট করে উঠল। সে বললে,—কাজ নেই বাপু এখানে থেকে, ফিরে চল, আর একবার আসা যাবে।" কিন্তু চল বললেই চলা যায় না—পাহাড় দেশে মেঘ, ভালো হওয়ার গতিক বুঝে তবে চলাচল করতে হয়। কোনো রকমে পাঁপড়া নানাকৌড়ি ঘুম-রকে চড়ে আকাশের ভাবটা জেনে আসতে চলল; অমনি রিদয় বললে—"আমি যাব ঘুম রকে।" খোঁড়া বললে—"আমিও।" অমনি সবাই একসঙ্গে "আমিও-আমিও" বলতে বলতে উড়ে গিয়ে রকের উপরে বসল।

মানুষের বাড়িতে যেমন কোনো জায়গা রাঁধবার, কোনোটা বৈঠকখানা, কোনোটা বা শোবার খাবার জায়গা, হিমালয়েতেও তেমনি এক-একটা জায়গা এক-এক কাজের জন্য আছে। মানুষের বাড়িতে যেমন দালান থাকে বারান্দা থাকে, রক থাকে, হিমালয়েতেও তাই। ঘুম-রকটা হল ঘুম দেবার স্থান, জলাপাহাড় হল জল খাবার কিম্বা জলো হাওয়া খাবার জায়গা, রংটং হল ধোবিখানা, কাপড় রঙাবার জায়গা, টুং হল ঘড়ির ঘর, এমনি সব নানা রকম নানা দালান চাতাল গুহা এক-এক কাজের জন্যে রয়েছে।

ঘুম-রকে দিনে বড় কেউ আসে না, দু'চার পথিক পাখি কি জানোয়ার কখনো কখনো জিরোতে বসে, না হলে জায়গাটা সারাদিন ফাঁকা থাকে দেখে বুড়ো রামছাগল মাস্টার এখানে ছানা পড়াবার জন্যে একটা ইস্কুল খুলেছেন। পাখির-ছানা শেয়াল-ছানা শুয়োর-ছানা ভালুক-ছানারা ঘুম-রকে বড়-বড় পাথরের বেঞ্চিতে কেউ পা ঝুলিয়ে কেউ বা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝিমোচ্ছে আর রামছাগল শিঙের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে দিয়ে কেবলি পড়াচ্ছেন, ক, খ, গ, ঐ, বো সো! একে ঘুম-রক তাতে আজ বড় বাদলা, শিঙের খোঁচা খেয়েও তারা ঝুকে-ঝুকে পড়ছে দেখে রামছাগলও কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের যোগাড় করছেন এমন

সময় রিদয়কে নিয়ে হাঁসেরা উপস্থিত। অচেনা লোক দেখে মাস্টারমশায় তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে মস্ত ম্যাপ আঁকা প্রকাণ্ড কালো সেলেটখানায় শিং বুলিয়ে বুলিয়ে ছেলেদের জিওগ্রাফির লেকচার শুরু করলেন ঃ

জলের জন্তুরা চোখ ফুটেই দেখে জল আকাশ, ডাঙার জীব তারা দেখে বন-জঙ্গল মাঠ, আর পাহাড়ের ছেলেমেয়ে তারা দেখে আকাশের উপরে বরফে ঢাকা ওই হিমালয়ের চুড়ো ক'টা। হিম-আলয় সন্ধি করে হয়েছে হিমালয়, অর্থাৎ কিনা হিমালয় মানে হিমের বাড়ি, সমসকৃত্যেতে বলবে উচ্চারণ করতেই পারে না, 'র' বলতে 'ল' বলে ফেলে— তারা হিমালয়কে বলে ইমালোইয়াস! হিমালয়ের মতো উঁচু আর বড় পর্বত জগতে নেই। সব দেশের সব পর্বত আমাদের এই হিমালয়ের চুড়োর কাছে হার মেনেছে।

ধলা চামড়া জানোয়ারেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমাদের বলে কালো, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় পাহাড় মোটে ষোল হাজার ফুট আর আমাদের এই বাড়ির চুড়োগুলো কত উঁচু তা জানো? এর চল্লিশটা শিখর হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফিট করে এক-একটি। ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা সকালে-সন্ধ্যায় সোনা আর দিনে রাতে দেখায় রুপো, ওটা হচ্ছে আটাশ হাজার ফুট, ওর আরো হাজার ফুট উপরে ধবলাগিরির সব উঁচু চুড়ো উনত্রিশ হাজার ফুট। এর পাশে ধলা চামড়াদের জেতো পাহাড়—ফুঃ রাজহস্তীর পাশে খরগোস। মানুষের কথা দূরে থাক পাখিরাও এই হিমালয়ের চুড়োয় চড়তে পারে না, এখানে না ঘাস না গাছ! মেঘ পর্যন্ত ভয় পায় সেখানে উঠতে, শুধু ধপ-ধপ করছে আছোঁয়া শাদা বরফ।

এই হিমালয়ের চুড়ো থেকে বরফ গলে বারোটা মহানদী ছিষ্টি হয়ে পুব-পশ্চিমে দুই মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে কত দেশ কত বনের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই। এ-সব নদীর ধারে কত নগর কত গ্রাম কত মাঠঘাট জমি-জমা রাজ্য পেতে কত রকমের মানুষরা রয়েছে তা গোনা যায় না।

এই হিমের বাড়ির চুড়োটা থেকে ধাপে-ধাপে পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পর্বত প্রমাণ সিঁড়ি, এক-এক ধাপে রকম-রকম গাছ পালা পশু পাখি! এ-রকে সে-রকে পাথরের কাজাল এমন চওড়া যে সেখানে কতকালের পুরোনো পাথরের মেঝেতে বড়-বড় গাছের বন হয়ে রয়েছে, ঝরনা দিয়ে বর্ষার জল বরফের জল সব গড়িয়ে চলেছে। কোনো রকের উপর দিয়ে মানুষেরা রেল চালিয়ে দিয়েছে, বড় বড় শহর বসিয়ে বাজার বসিয়ে রাজত্ব করছে।

জীব-জন্তুর অগম্য স্থান ধবলাগিরি, সেখানে কেবলি বরফ। এই সিঁড়ির রক, যাতে আমরা বাস করছি, এরি সব উপরের রকে শুধু বরফ আর শেওলা, একমাত্র চমরী গাই পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া, তার পরের ধাপে মানুষ-সমান ঘাস আর দেবদারু বন, সেখানে শেয়াল ভালুক হেঁড়েল এরাই যেতে পারে, তার পরের রকে নানা ফুল ফলের বাগান, সেখানে প্রজাপতি পাখি খরগোস কুকুর বেড়াল ভোঁদড় ভাঙ বাঁদর, হনুমান এরাই থাকে, সবশেষের ধাপে বেতবন বাঁশবন অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সেখানে হরিণ মোষ বাঘ সাপ ব্যাঙ তার পরে চাটালো জমি যার উপর দিয়ে সহস্রধারা নদী সব বয়ে চলেছে, এরি পরে অগাধ সমুদ্র নীল জল, শেষ দেখা যায় না, এই সমুদ্রের ওপারে যে কি, তা কেউ জানে না!

চকা অমনি বলে উঠল—"আমি জানি। নীল সমুদ্রের মাঝে পাহাড় আছে, টাপু আছে, তার পরে পৃথিবীর শেষ বরফের দেশ, সেখানে বারোমাস বরফ, জমি যেন শাদা চাদরে ঢাকা আর সেখানে ছ'মাস রাত্রি ছ'মাস দিন; সেখানে পেঙ্গু পাখিরা বরফের বাসায় ডিম পাড়ে, ধলা ভালুক আছে, ধলা শেয়াল সিন্দুঘোটক আছে, সব সেখানে শাদা, কালো কিছু নেই, দিন রাত সমান, আলো, ঘুটঘুটে আঁধার মোটেই নেই, আমি সেইখানে পাঁচবার গেছি।

চকার কথায় রামছাগল শিং বেঁকিয়ে বললে—'এত বুড়ো হলেম এমনি আজগুবি কথা তো শুনিনি।'

রিদয় এবার এগিয়ে এসে বললে—' যে হিমালয়ের চুড়ো এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বরফে ঢাকা, ঐ হিমের বাড়ি গড়া নিয়ে কি কাণ্ড হয়ে গেছে এককালে, তার খবর চকা তো জানে না, রামছাগলও জানে না, মানুষেরা ধ্যান করে ওই নিচের তলাকার বনে বসে! ওই ধবলাগিরির উপরের খবর যা শাস্তর লিখে গেছে—তাই বলছি, শোনো। বড় চমৎকার কথা।'

সবাই অমনি রিদয়কে ঘিরে বসল কথা শুনতে, মেঘলা দিন ভিজে স্যাঁৎস্যাঁত করছে, ভালুকের গা ঘেঁষে ছাগল, ছাগলের গা ঘেঁষে হাঁস হাঁসের গা ঘেঁষে শেয়াল।

রিদয় বসে গল্প শুরু করলে।

হিমালয় কেমন, তা শুনলে! হিমালয়ের উপরে কি নিচে কি সমুদ্রের এপারে কি ওপারে কি সবই তো শুনলে কিন্তু এগুলো তৈরি করলে কে তার খবর রাখ? প্রথমে সেইটে বলি, শোনো,—একদিন বিশ্বকর্মা গোলার মতো একতাল কাদা পাকিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে বসলেন। চন্দ্র সূর্য গড়া হয়েছে এইবার সসাগরা আমাদের এই ধরা তিনি গড়তে আরম্ভ করলেন। সেদিনটাও এমনি আঁধার-আঁধার ছিল। বিশ্বকর্মার আর কাজে মনই যাচ্ছে না, তিনি কাদা নিয়ে কেবলি পৃথিবীটার উপরে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে এদেশ-সেদেশ গড়ে চললেন, সব দেশ মিলিয়ে দেশ-বিদেশগুলোর চেহারাটা হল ঠিক যেন হাড্ডিসার—এখানে ওখানে মাটি-ঝরা শির-বার-করা বাঁখা-চোরা টোল-খাওয়া দোমড়ানো চোপসানো গরু ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমুদ্রের জল খাচ্ছে, আর ঠিক তারি সামনে একটা গরুড় পক্ষীর ছানা, সেও যেন গো-ডিম থেকে সবে বার হয়ে মাছ ধরবার জন্যে সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়েছে।

বিশ্বকর্মার পাশে বিশ্বমিত্র বসে ছিলেন; তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকর্মার চেয়ে গড়ন-পটন করতে তিনি পাকা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে বাজি রেখে প্রায়ই বিশ্বমিত্র এটা-ওটা গড়তেন, প্রত্যেক বারে বাজিও হারতেন কিন্তু তবু তাঁর বিশ্বাস গেল না যে বিশ্বকর্মার চেয়ে তিনি পাকা কারিগর। বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মিষ্টি আতা খেয়ে বিশ্বামিত্র এক আতা গড়লেন, দেখতে বিশ্বকর্মার আতার চেয়েও ভালো, কিন্তু সমুদ্রের জল দিয়ে গড়বার দরুন বিশ্বামিত্রের আতা এমনি নোনা হয়ে গেল যে মুখে দেবার যো নেই! ডিম ফুটে পাখি বেরোচ্ছে বিশ্বকর্মা ছিষ্টি করলেন, পাখিদের মা-বাপ—তাদের ডিম, ডিমের মধ্যে বাচ্ছা—বিশ্বামিত্র বললেন, 'ও কি হল? এ কি আবার একটা ছিষ্টি! আমি গাছে পাখি ফলাব।" 'বিশ্বমিত্র অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক জাঁক জোক করে স্থির করলেন—ডিমে তা দেওয়া চাই কিন্তু পাখি তা দিলে তো চলবে না—তিনি এমন নারকেল গাছ সুপারি গাছ তাল গাছ ছিষ্টি করলেন যাতে দিন ভোর রোদ পায় কিন্তু বেশি রোদ পেলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আবার রাতে হিম পেলেও

দষ্ট হবে, জলে পেলে পচে যাবে। সব ভেবে-চিন্তে বিশ্বামিত্র বড়-বড় পাখির পালকের মতো পাতা গাছের আগায় বেঁধে দিয়ে সেই পাতার গোড়ায় দশটা বারোটা কুড়িটা পঁচিশটা করে ছোট বড় নানা রকম ডিম ঝুলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পাখি বার হয়, কিন্তু পাছে কাগে চিলে ঠুকরে ডিমগুলো ভেঙে দেয় সেজন্যে বিশ্বামিত্র ডিমের খোলাগুলো এমনি শক্ত করে বানিয়েছেন যে বাচ্চা পাখি সেই পুরু নারকোল মালা নারকোল ছোবড়া তালের খোলা সুপুরির ছাল ভেঙে বার হতেই পারলে না। কোনোটা রোদে পক্ক কোনোটা অর্ধপক্ক কোনোটা অপক্কই রয়ে গেল। ডিম হল, তাঁর শাঁস জল হল, তা দেওয়া হল, সবই হল কিন্তু তা থেকে পাখি হল না!

এতেও বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হল না। বিশ্বকর্মাকে গোরূপা পৃথিবী গড়তে দেখে তাঁরও গড়বার সাধ হল। তখন বিশ্বকর্মা গোরূপা পৃথিবীর বাঁটের মতো এই ভারতবর্ষটি অতি যত্ন করে গড়েছেন সব তখনো গড়া হয়নি কিন্তু এতেই মনে হচ্ছে এই দেশটি হবে চমৎকার, একেবারে কামধেনুর বাঁটের মতো দেশটি—যা চাই যত চাই এখানে পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একটু কাদা নিয়ে বসে বললেন, "দাদা তুমি খানিক এই দেশটার গড়, আমিও খানিক গড়ি—দেখা যাক কার ভালো হয়।" বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন কাজেই বিশ্বমিত্র খারাপ করে দিলেও দেশটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে না জেনে দেশটার উপরে বিশ্বামিত্রকে গড়া পেটা করতে দিতে বিশ্বকর্মা আপত্তি করলেন না। তাঁকে সমস্ত উত্তর দিকটা গড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাঙলাদেশটা গড়তে বসে গেলেন। বাঙালাদেশটা সুন্দর করে নদী গ্রাম ধানক্ষেত সুন্দর বন আম কাঁঠালের বাগান খড়ের চাল দেওয়া ছোট-ছোট কুড়ে ঘর দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তুলতে বিশ্বকর্মার বেশি দেরি লাগল না, বুড়ো আঙুলের দু'চার টিপ দিয়ে মাঠগুলো আর আঙুলের দাগ দিয়ে নদী-নালা বানিয়ে তিনি কাজ শেষ করে বসে বিশ্বমিত্রের দিকে চাইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি বলে উঠলেন—"আমার কাজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, দেখবে এস।"

বিশ্বকর্মার ছিষ্টি বাঙলাদেশ দেখে বিশ্বামিত্র এবারে নিন্দা করতে পারলেন না, চমৎকার। সুজলা সুফলা বীজ ছড়ালেই ফসল, কোথাও উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়-পর্বত নেই বললেই হয়, যতদূর চোখ চলে সবুজ ক্ষেত আর জলা। বিশ্বামিত্র দাড়ি নেড়ে বললেন,—"হ্যাঁ, এবারের ছিষ্টিটা হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার দেশটা আরও ভালো হয়েছে দেখতে" বলে বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্মাকে উত্তর-ভারতবর্ষটা কেমন হয়েছে দেখতে বললেন।

বিশ্বকর্মার আদড়া উল্টে-পাল্টে বিশ্বামিত্র গড়েছেন। পাঞ্জাবে টেনেছেন পাঁচটা নদীর খাত কিন্তু সেখানকার জমিতে সার মাটি-না দিয়ে তিনি দিয়েছেন বালি আর কাঁকর, ধানও হবে না, চালও হবে না, মানুষগুলো কেবল যেন জল খেয়েই থাকবে। তারপর পাহাড় অঞ্চলে দুজনে উপস্থিত—বিশ্বকর্মা বিশ্বামিত্রের কীর্তি দেখে অবাক! সেখানে যা পেরেছেন পাথর সবগুলো জড়ো করে এক হিমালয় পাহাড়ের ছিষ্টি করে বসেছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর চিরকাল মাথায় আছে সূর্যের তাপ—গাছপালা মানুষ গরু সব জিনিসের পক্ষে ভালো, কাজেই তাঁর ছিষ্টি-করা পাহাড়দেশ তিনি যতটা পারেন সূর্যের কাছে ঠেলে তুলেছেন আর সেই সব পাথরের গায়ে এখানে-ওখানে দু-চার মুঠো মাটি ছড়িয়ে দু-একটা ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন।

বিশ্বমিত্র একগাল হেসে যেমন বলেছেন, কেমন দাদা, ভালো হয়নি?' অমনি ঝুপ-

ঝুপ করে এক পশলা বিষ্টি নামল আর পাহাড়ের সব মাটি ঘাস ধুয়ে গিয়ে খালি পাথর আর নুড়ি বেরিয়ে পড়ল। এদিকে পাহাড়ের এখানে ওখানে উপরে নিচে এত বিষ্টির জল জমা হল যে তাতে সারা পৃথিবীর নদীতে জল দেওয়া চলে।

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন—"করেছ কি, সব উল্টো পাল্টা। যেখানে মাটি চাই, সেখানে দিয়েছ কাঁকর, যেখানে জল দরকার সেখানে দিয়েছ বালি, আর যেখানে জল মোটেই দরকার নেই, সেখানে জমা করেছ রাজ্যের জলাশয়, তোমার মতলব, তো কিছু বোঝা গেল না।"

বিশ্বামিত্র দাড়ি মোচড়াতে-মোচড়াতে বললেন—"শীতে যাতে লোক কষ্ট না পায় তাই দেশটা যতটা পারি সূর্যের কাছে দিয়েছি, এতে দোষটা হল কি!"

বিশ্বকর্মা বললেন—"উঁচু জমিতো দিনে যেমন গরম রাতে তেমনি ঠাণ্ডা, এটা তো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, একে উঁচুতে তো কিছু গাছপালা গজানো শক্ত, গরমে জ্বলে যাবে বরফে সব জমে যাবে। এত পরিশ্রম তোমার সব মাটি হল, দেখছি।"

বিশ্বামিত্র মাথা চুলকে বললেন—"আমি সব এখানকার উপযুক্ত মানুষ ছিষ্টি করে দিই। তারা দেখবে এই পাহাড়কে ভূস্বর্গ করে তুলবে।"

বিশ্বকর্মা বললেন—"আর তোমার ছিষ্টি করে কাজ নেই, মানুষ গড়তে শেষে বাঁদর গড়ে বসবে!"

"কোনো ভয় নেই, এবার আমি খুব সাবধানে গড়ছি। দেখ এবারে ঠিক হবে—বলে বিশ্বামিত্র একরাশ প্রজাপতির ডানা গড়ে রেখে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন,—'দেখলে মজা।"

বিশ্বর্কমা ভেবেই পান না, এত ডানা নিয়ে বিশ্বামিত্র কি করবেন! তিনি শুধোলেন—"এগুলো কি হবে ভাই?"

বিশ্বামিত্র খানিক কপালে আঙুল বুলিয়ে চিন্তা করে বললেন,—"পাহাড়দের সব ডানা দিয়ে দিতে চাই, তারা যেখানে খুশি—শীতের সময় গরমদেশে, গরমের সময় শীতের দেশে, উড়ে উড়ে বিচরণ করতে পারবে, তা হলে এখানে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো অসুবিধে হবে না।"

বিশ্বকর্মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—"সর্বনাশ, পাহাড় যেখানে-সেখানে উড়ে বসতে আরম্ভ করলে যে-সব দেশে পাহাড়-পর্বত গিয়ে পড়বে, সেসব দেশের দশা হবে কি? লোকগুলো-সুদ্ধ সারা-দেশ যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!"

বিশ্বামিত্র বলে উঠলেন—"তা কে! লোকেরা সব ধন-দৌলত খাবার দাবার নিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসবে, তা হলেই কোনো গোল নেই?"

বিশ্বকর্মা বললেন,—"সবাই পাহাড় চড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার জমিতে হাল দেয় কে, রাজত্বই বা করে কে, ঘর-বাড়িই বা বেঁধে থাকে কে!"

"তা আমি কি জানি"—বলে বিশ্বামিত্র হিমালয়ের ডানা দিতে যান, এমন সময়ে বিশ্বকর্মা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন—"আগে হিমালয়ের বাচ্চা এই ছোট-খাটো মন্দর পর্বতটাকে ডানা দিয়ে দেখ, কি কাণ্ড হয়, পরে বড়টাকে নিয়ে পরীক্ষা কর।"

বিশ্বামিত্র মন্দর পর্বতে ডানা দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া, সে অমনি উড়তে-উড়তে বাঙলাদেশের দক্ষিণধারে যে-সব দেশ গড়া হয়েছিল সেইখানে উড়ে বসল! যেমন বসা অমনি

সারাদেশ রসাতলে তলিয়ে গেল; মাটি যেখানে ছিল সেখানে একটা উপসাগর হয়ে গেছে দেখা গেল। মানুষ যারা ছিল তাদের চিহ্ন রইল না, কেবল মাছগুলো জলে কিল-বিল করতে লাগল, আর মন্দর পর্বতটা সমুদ্র তোলপাড় করে এমনি সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে যে, জল-প্লাবনে বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মাটি ধুয়ে যাবার যোগাড়।

বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি সমুদ্রের ধারে-ধারে বালির বাঁধ দিয়ে জল ঠেকিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন—"আমার হাতের কাজে তোমায় আর হাত দিতে দিচ্ছি নে। এই পৃথিবীর উত্তর শিয়র আর দক্ষিণ শিয়রে কিছু নেই, কিছু সৃষ্টি করতে হয় সেই দু'জায়গায় করগে। যে ভুলগুলো করেছ সেগুলো আমাকে শুধরে দিতে দাও এখন।" বিশ্বমিত্রের হাত থেকে বিশ্বকর্মা গড়বার যন্তর-তন্তর কেড়ে নিয়ে পাহাড়ে যত জল জমা হয়েছিল, সমস্ত নালা কেটে ঝরনা দিয়ে সমুদ্রের দিকে বইয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মার ছিষ্টিতে কিছু বাজে থাকবার যো নেই, নষ্ট হবার যো নেই—পাহাড়ের জল সমুদ্রে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশ দিয়ে দেশ-বিদেশে বিষ্টি দিয়ে ক্ষেতে-ক্ষেতে ফলস গজাতে চলল।

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বললেন—"বাজ দিয়ে মন্দর পর্বতের ডানা কেটে দাও।" ডানা কাটা গেল, মন্দর সমুদ্রেই ডুবে রইল আর তার ডানার কুচিগুলো এখানে-ওখানে সমুদ্রের মাঝে টাপুর মতো ভাসতে লাগল। বিশ্বকর্মা সেগুলোর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিলেন, বসতি বসিয়ে দিলেন তারপর বিশ্বামিত্র যত ডানা গড়ে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ভোমরা মৌমাছি সব গড়ে ছেড়ে দিলেন। তারা দেশ-বিদেশ থেকে ফুলের রেণু ফুলের মধু এনে পাহাড়ে-পাহাড়ে বাগান বসাতে শুরু করে দিলে। দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সব ফুল গজাল ফুল ফলল। সব ঠিক করে বিশ্বকর্মা প্রকাণ্ড দুটো ডানা দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ছিষ্টি করে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে গেলেন, শাস্তরের ছিষ্টিতত্ত্ব তো এই হল, তারপর দক্ষ প্রজাপতির কথা পুরাণে লিখেছে যেমন বলি, শোনো—

বিধির মানস সূত দক্ষমুনি মজবুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম-জায়া।
তার গর্ভে সতীনাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল মহামায়া।
নারদ ঘটক হয়ে নানামতে বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিল সতী।

নারদ তো ঘটকালি নিয়ে সরে পড়লেন, এদিকে শিব ষাঁড়ে চড়ে ভুটিয়ার দলের সঙ্গে ডমরু বাজিয়ে জটায় সাপ জড়িয়ে হাড়মালা গলায় ঝুলিয়ে নাচতে-নাচতে হাজির।

দক্ষ প্রজাপতি বরের চেহারা দেখেই চটে লাল—

শিবের বিকট সাজ
দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈল বাম-মতি।

সেই থেকে জামাই শ্বশুরের মুখ দেখেন না। দক্ষ প্রজাপতিও শিবনিন্দে না করে জল খান না। এই সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করলেন; সব দেবতা নেমন্তন্ন পেলেন। সতীর বোনেরা গয়না-গাটি পরে পালকি চড়ে শিবের বাড়ির সামনে দিয়ে ঝমর-ঝমর করতে-করতে বাপের বাড়ি মাছের মুড়ো খেতে চলল দেখে সতীর চোখে জল এল। দুঃখী বলে বাবা তাঁদের নেমন্তন্ন পাঠাননি।

সতী বোনেদের পালাকির কাছে গিয়ে দিদির গলা ধরে কেঁদে-কেঁদে বললেন।

অশ্বিনীদিদি। আমাদের দুখিনী দেখিয়া পিতে
অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে,
নিজ বাপ নহে অন্য শুনে হৃদে এই ক্ষুণ্ণ
আমা ভিন্ন নেমন্তন্ন করেছেন এই ত্রিজগতে।

অশ্বিনীদিদি আঁচলে সতীর চোখের জল মুছিয়ে বললেন—"তুই চল না। বাপের বাড়ি যাবি তার আবার নেমন্তন্ন কিসের? আয় আমার এই পালকিতে।"

সতী ঘাড় নেড়ে বললেন—"না ভাই—তিনি রাগ করবেন।"

"তবে তুই তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে আয়" বলে সতীর দিদিরা—

চতুর্দোলে সবে চড়ি চলিলেন হরষে
হেথায় শঙ্করী ধেয়ে করপুটে দণ্ডাইয়ে
চরণে প্রণতি হয়ে কহিলেন গিরিশে
আমি বাপের বাড়ি যাব।

শিব বললেন—

সতী তুমি যেতে চাচ্ছ বটে,
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছে দক্ষের নিকটে।
আমাদের শ্বশুর জামায়ে কেমন ভাব শোনো—
আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে যেমন দেবতা আর অসুরে,
যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংস আর শ্যামে,
যেমন স্রোতে আর বাঁধে, যেমন রাহু আর চাঁদে,
যেমন জল আর আগুনে, যেমন তেল আর বেগুনে,
যেমন পক্ষী আর সাতনলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা,
যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে,
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গোমস্তা আর চোরে,
যেমন কাক আর পেচক, যেমন ভীম আর কীচক।

'দক্ষ যেমন অমান্য করে বারণ করেছেন নিমন্ত্রণ কেমন করে সেখানে তোমার যাওয়া হয়!'

সতী কিন্তু শোনেন না শিবের কথা, তিনি সেজগুজে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের ষাঁড়ে চড়ে বাপের বাড়ি চললেন দুঃখিনী বেশে। কুবের দেখে বাক্স ভরা এ-কালের সে-কালের গহ্না এনে বললে—'মা, এমন বেশে কি যেতে আছে। বাপের বাড়িতে লোকে বলবে কি—ওমা, একখানা গয়নাও দেয়নি জামাই। সতী কুবেরের দেওয়া গহ্না পরে সাজলেন, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী এমন সুন্দরী যে সোনা হীরে তাঁর সোনার অঙ্গের আলোর কাছে টিম-টিম করতে লাগল। 'দূর ছাই,' বলে সতী সেগুলো ফেলে দিয়ে পাহাড়ি ফুলের সাজে সেজে বার হলেন। ত্রিলোক সতীর চমৎকার বেশ দেখে ধন্য-ধন্য করতে-করতে সঙ্গে চলল।

এদিকে ছোট মেয়ে সতী এল না, কাজের বাড়ি শূন্য ঠেকেছে, সতীর মা কেবলি আঁচলে চোখ মুচছেন এমন সময় দাসীরা এসে প্রসূতিকে খবর দিলে—'ও মা তোর সতী এলো ঐ!' এই শুনে—

রাণী উন্মাদিনী প্রায়
কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা ধায়।
অম্বিকারে দৃষ্টি করি বাহিরেতে এসে
আয় মা বলে লইয়া কোলে
নয়ন জলে ভাসে।

সতী মায়ের কাছে বসে একটু দুধ সন্দেশ খেয়ে সভা দেখতে চললেন।

ইন্দ্র-চন্দ্র সব বসেছেন, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সব বসেছেন দক্ষ প্রজাপতিকে ঘিরে, আর কালোয়াত সব গান-বাজনা করছে—

ধির কুট্ কুট্ তানা নানা তাদিম তা, তা দিয়না ঝেন্না ঝেন্না
নাদেরে দানি তাদেরে দানি, ওদেরে তানা দেবে তানা
তাদিম তারয়ে তারয়ে দানি।
দেতারে তারে দানি ধেতেন দেতেন নারে দানি।

বেশ গান-বাজনা চলেছে—এমন সময় সভাতে সতীকে আসতে দেখেই দক্ষ শিব-নিন্দে শুরু করলেন। দক্ষ প্রজাপতি ঃ

কেবল এ গ্রহ আনি নারুদে ঘটালে,
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে ঃ
বস্ত্রবিনা বাঘছাল করে পরিধান,
দেবের মধ্যে দুঃখী নাই শিবের সমান।
ভূত সঙ্গে শ্মশানে-মশানে করে বাস,
মাথার খুলি বাবাজীর জল খাবার গেলাস।
যায় বলদে বসে গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি,

সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি ঃ
অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত গলায় সাপের পৈতে
তারে আনিলে ডেকে হাসিবে লোকে—তাই হবে কি সইতে!
পাগলে সম্ভাষা করা কোন প্রয়োজন,
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন।
দক্ষের শিব-নিন্দা শুনে সতী আর সইতে পারলেন না।
পতি-নিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ,
ঘন-ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস;
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান,
ধরা শয্যা করি 'তারা' ত্যেজিলেন প্রাণ।

সতী শিব-নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করলেন, চারদিকে হাহাকার উঠল। সতীর সাতাশ বোন আকাশের তারা সব কাঁদতে লাগল, নন্দী কাঁদতে লাগল, ভৃঙ্গী কাঁদতে লাগল, দেবতারা কাঁদতে লাগলেন, মানুষেরা কাঁদতে লাগল—

ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাণী,
ধুলাতে পতিত কেন পতিত—পাবনী;
দুটি নয়ন-তারা মুদিয়া তারা—
অধরা কেন ধরাসনে!

নন্দী গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিলে—'মা আর নেই।' তখন শিব ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়লেন, অমনি শিবদাস সব দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে আগুয়ান হল। মহাদেব যুদ্ধে চললেন, পৃথিবী কাঁপতে থাকল, মেঘ সব গর্জন করে উঠল, আকাশে বিদুৎ বাজ ছুটোছুটি করতে থাকল কড়মড় করে, শিব ত্রিশূল হাতে সাজলেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,
ভবম্বম ভবম্বম সিঙ্গা ঘোর বাজে;
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে;
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে,
ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে;
ধিয়াতা ধিয়াতা ধিয়া ভূত নাচে
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী,
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে
চলে শাঁখিনী পোতিনী মুক্ত কেশে।

ভূত-প্রেত নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। ভয়ে কারু মুখে কথা নেই, মহাদেব হুকুম দিলেন ভূতিয়া ফৌজকে—যজ্ঞনাশ কর। অমনি—

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া
ঘোরবেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রাঙ্গিয়া,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে
যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য খাইছে,
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোররোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।
ভূত ভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল
পূষণের ভূষণে দন্ত পাঁতি পড়িল,
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে,
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে!

নৈবিদ্যির থালা ফেলে বিশ্বামিত্র দৌড়—বশিষ্ঠ চম্পট, সবার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে কিলিয়ে দাঁত ভেঙে ভূতেরা লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগল—

মৌনী তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

দক্ষ-নিপাত দেখে সতীর মা কেঁদে শিবকে বললেন—

সতীর জননী আমি, শাশুড়ি তোমার,
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার?
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,
রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়—

কন্দ-কাটা দক্ষের দুর্গতি দেখে ভূতেরা সব হাসতে লাগল, তখন শিবের হাতের কাছে ছিল পাহাড়ি একটা রামছাগল দড়ি দিয়ে হাড়-কাঠে বাঁধা। তিনি সেইটে নন্দীকে দেখিয়ে দিলেন। নন্দী তার মুড়োটা কেটে দক্ষের কাঁধে জুড়ে দিয়ে দক্ষ প্রজাপতির ডানা দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল, শিব সতীদেহ নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে কৈলাসে গেলেন। এর পরে আরও কথা আছে, কিন্তু এইখানেই দক্ষযজ্ঞ শেষ—হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়—বলে রিদয় চুপ করলে।

রামছাগল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে খানিক চেয়ে থেকে বললে—"ফুঃ এমন আজগুবি কথা তো কখনো শুনিনি। বুড়ো হয়ে শিং ক্ষয়ে গেল, এমন কথা তো কোনোদিন শুনলেম না যে প্রজাপতির মাথা হয় রামছাগলের মতো আর পাহাড়গুলোর গজায় ডানা।"

রামছাগল ছেলেদের বললেন ঃ

ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস করো না, বড় হয়ে মধুর সন্ধানে পেটের দায়ে তোমরা জানি দেশ-বিদেশে যাবে, এমন অনেক বাজে গল্পও তোমাদের এই দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নামে শুনতে পাবে। কেউ বলবে তোমার দেশ মন্দ, কেউ বলবে মন্দ নয়, কিন্তু মনে রেখ, এই হিমালয়ের জলে বাতাসে তোমরা মানুষ, ভগবান তোমাদের জন্যে সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে উঁচু, সব চেয়ে চমৎকার বাড়ি দিয়েছেন। এই কথাটি সর্বদা মনে রেখ, কোনোদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই হিমালয়, আর সেইটে ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের। এই পাথরের সিঁড়ি এতকালের পুরনো যে তার ঠিক ঠিকানা নেই। আগে এটা, তারপর গাছ-পালা জন্তু-জানোয়ায়র সৃষ্টি হয়েছে। পাখির ছানাগুলো জন্মাবার আগে যেমন তাদের বাসা তৈরি হয়ে থাকে, মানুষদের, জানোয়ারদের জন্মাবার আগে তেমনি জগৎমাতা আর বিশ্বপিতা তাদের জন্যে এই চমৎকার হিমালয় আর সমুদ্র পর্যন্ত গেছে যে পাঁচ ধাপ পাথরের সিঁড়ি,তা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। জীব-জন্তরা জন্মে যাতে আরামে থাকে, কষ্ট না পায় সেই জন্যে চমৎকার করে পাথর দিয়ে দালান রক এমনি সব নানা ঘর নানা বাড়ি তাঁরা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন!

কিন্তু কত কালের এই বাড়ি, একে পরিষ্কার রাখা, মেরামতে রাখা, যারা জন্মাতে লাগল তাদের তো সাধ্য হল না, এককালের নতুন বাড়ি পাথরের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেটে পড়তে লাগল বর্ষায় এখানে ওখানে সোঁতো লাগল, শেওলা গজাল, হাওয়াতে ধুলো-মাটি এসে ধাপগুলোতে জমা হতে থাকল, ঝড়ে ভূমিকম্পে বড় পাথর খসে-খসে এখানে-ওখানে পড়ল, এখানটা ধ্বসে গেল, সেখানটা বসে গেল ওটা ভেঙে পড়ল, সেটা বেঁকে রইল, এইভাবে কালে-কালে ধাপগুলোর উপরের তলার মাটি ধুয়ে নিচের তলায় নামতে লাগল; আর ধাপে-ধাপে সেখানে যেমন মাটি পেলে নানা জাতের গাছপালা বন-জঙ্গল দেখা দিলে। উপর-তলার মাটি ধুয়ে গেছে সেখানে কাঁকর আর নুড়িই বেশি, তার পরের ধাপে অল্প মাটি আছে সেখানে অল্পসল্প চাষবাস চলেছে দেখ, খুব ছোট-ছোট ক্ষেত, ছোট গ্রাম। মাঝের ধাপে অনেকটা মাটি জমা হয়েছে। সেখানে দেখ দর্জিলিঙ শহর বাড়ি-ঘর বাজার চা-বাগান। কোম্পানির বাগান সব বসে গেছে, উপর তলার মতো অতটা ঠাণ্ডাও নয়, কাজেই সেখানে নানা গাছ ঝাউ বাদাম আখরোট পিচ পদম সব তেজ করেছে। নানা ফুলও সেখানে!

কিন্তু হিমালয়ের সব নিচের ধাপে যত কিছু ভালো মাটি এসে জমা হয়েছে জলে ধুয়ে একেবারে সমুদ্রের ঝর্ পর্যন্ত, সেখানে ফল-ফুলের বাগান ক্ষেতের আর অন্ত নেই, মাটিতে সেখানে এত তেজ যে, যা দাও ফলবে, আর সেখানে শীতও বেশি নয় বরফও পড়ে না, সেখানে গাছ এক-একটা যেন একখানা গ্রাম জুড়ে রয়েছে, আর চারদিকে আম-কাঁঠালের বন!

পাহাড়ে বরফ পড়লে ইস্কুল বন্ধ করে আমি সেখানে চরতে যাই, নিজের চোখে

দেখে এসেছি যা, তাই বলছি। ঋষিদের মতো চোখ বুজে ধ্যান করে গল্প বলবার জন্যে আমি ইস্কুল-মাস্টারি করতে আসিনি। ছাত্রগণ। চোখ দিয়ে দেখাই হল আসল দেখা, ঠিক দেখা আর চোখ বুজে ধ্যান করে দেখবার মানে খেয়াল দেখা বা স্বপন দেখা। খেয়ালিদের বিশ্বাস কর না, তা তাঁরা ঋষিই হন, কবিই হন। যা দুই চোখে দেখছি তাই সত্যি, তাছাড়া সব মিছা, সব কল্পনা গল্পকথা, খেয়াল।

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস হেলতে-দুলতে এগিয়ে এসে বললে—"ছাত্রগণ তোমাদের মাস্টার যা বললেন, ঠিক, চোখে না দেখলে কোনো জিনিসে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড় পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য-চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেইজন্য এই দুই চোখের উপরে নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনোদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে—এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ একসময় পৃথিবীর মধ্যেকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত। যে সময় পাহাড় হয়েছিল সে সময় কেউ দেখেনি কেমন করে কি হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্ম যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।

"মাস্টার মহাশয়ের কথায় কি কেতাবগুলো অবিশ্বাস করবে।" বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে—"হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার পরমানু।"

রামছাগল ঘাড় নেড়ে বললে—"ওকথা আমি বিশ্বাসই করিনে। নিশ্চয় কোনো পাখিতে এনে ওটাকে ফেলেছে।"

খোঁড়া বললে—"তা হয় না। সমুদ্রের একেবারে নিচেয় থাকে এই শামুক, পাখি সেখানে যেতে পারে না।"

রামছাগল তক তুলল—"তবে মাছে খেয়েছে, সেই মাছ মরে ভেসে এসেছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে পাখি তাকে খেয়ে শাঁকটা মুখে নিয়ে হিমালয়ে এনে ফেলেছে!"

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—"তাও হয় না। সমুদ্রে যেখানে এই শাঁখ থাকত, সেখানে মাছ কেন, মানুষ পর্যন্ত যেতে পারা শক্ত।"

রামছাগল অমনি দাড়ি চুমড়ে বললে—"তবে মানুষ জানল কেমন করে এ-শাঁখ সমুদ্রের তলাকার, পাহাড়ের উপরকার নয়।"

সুবচনী পাছে তর্কে হেরে যায় রিদয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"জানো না, মানুষ ডুবুরি নামিয়ে মুক্তো তোলবার সময় এই সব শাঁখ কুড়িয়ে এনেছিল ঝুড়ি-ঝুড়ি!'

রামছাগল শিং নেড়ে বললে—"ঝুড়ি থেকে তারি গোটাকতক শাঁক হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।" হঠাৎ সুবচনী বললে—"তা নয়"—সুবচনী আরও কি বলতে যাচ্ছিল অমনি রামছাগল রেগে বললে—"তা যদি নয় তো নিশ্চয় আগে শাঁখের সব ডানা ছিল, উড়ে এসেছে হাঁসেদের মতো এই পাহাড়ে।"

রিদয় অমনি বলে উঠল—"শাঁখের যদি ডানা থাকতে পারে তবে পাহাড়গুলোরও

ডানা ছিল একথাই বা কেন বিশ্বাস করবে না?"

সুবচনী অমনি বলে উঠল—"আর প্রজাপতির মাথায় রামছাগলের মুখই বা না হবে কেন, তা বল।"

ভালুকে-শেয়ালে হাঁসে-ছাগলে তর্ক বেধে গেল, দেশের সব জানোয়ার সেই তর্কে যোগ দিয়ে চেঁচামেচি হট্টগোল বাধিয়ে দিলে।

শিকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতি
কাহা কুহী লগড় ঝগড় জোড়াথুতি
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়গুড়
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।

সবাই মিলে তর্ক লাগিয়েছে—"যাও -যাও হুঁদি খাও।" এমন সময় গণ্ডগোল শুনে পাহাড়ের গুহা থেকে বুড়ো লামা-ছাগল বেরিয়ে এলেন—

অতি দীর্ঘকক্ষ লোম পড়ে উরু পর
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিশদ চামর।

ববম-বম ববম-বম বলতে-বলতে লামাকে আসতে দেখে সবাই তটস্থ, ভালোমানুষ হয়ে বসল। লামা বললেন,—"তোমরা সব কি বৃথা তর্ক করছ? দেখ তর্ক কি ভয়ানক ব্যাপার, কোথায় তোমরা পড়া পড়বে, না, হাতা-হাতি বাধিয়েছ ভায়ে-ভায়ে—"

অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ!
ভ্রান্তজীব অন্ত না বুঝিয়ে কর, দ্বন্দ্ব,
কারো কিছু ঠিক নাই কেবল কহে মন্দ,
উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি কই,
তর্কে নাহি মেলে কিছু গণ্ডগোল বই;
শন বাক্য গুরুবাক্য করেছে প্রামাণ্য;
একে পঞ্চ পঞ্চে এক, নাহি কিচ্ছু অন্য!

লামা-ছাগল যেই লেকচার শেষ করলেন অমনি বোকা ছাগলের দল জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে দিলে—

জটজালিনী ক্ষুরশালিনী,
শিংঅধারিনী গো—
ঘনঘোষিণী ঘাস-খাদিনি,
গৃহ-পোষিণি গো।
চোঁ ভোঁ পোঁ পোঁ।

সেই সময় ভূমিকম্পে পাহাড় টলমল করে উঠল, অমনি হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ল। সব জানোয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চুপ হয়ে রইল! লামা-ছাগল মাঝে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, "এ কি দোলায় যে, এ্যাঁ কি ভয়ানক বিয়াপার!"

রামছাগল লামার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বললেন—"পর্বতটা পার্বতী-পাঠশালা সমেত উড়বে না কি—এ্যাঁ!"

যোগী-গোফা

রংপো নদীটি খুব বড় নদীও নয় ম্যাপেতেও তার নাম ওঠেনি। ঘুম আর বাতাসিয়া দুই পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ছোট একটা ঝরনা থেকে বেরিয়ে নদীটি পাহাড়ের গা বেয়ে দু-ধারের বনের মাঝ দিয়ে নুড়ি পাথর ঠেলে আস্তে-আস্তে তরায়ের জঙ্গলে নেমে গেছে, নদীর দু-পার করঞ্চা টেঁপারি তেলাকুচা বৈচী ডুমুর জাম এমনি সব নানা ফল নানা ফুল গাছে একেবারে হাওয়া করা, মাথার উপরে আকাশ সবুজ পাতার ছাউনিতে ঢাকা, তলায় সরু নদীটি ঝির-ঝির করে বয়ে চলেছে। এই পাখির গানে ভোমরার গুনগুনে ফুল-ফলের গন্ধে জলের কুল-কুল শব্দে ভরা অজানা এই নদীর গলি-পথ দিয়ে হাঁসেরা নেমে চলেছে আবার শিলিগুড়ির দিকে। উপরে মেঘ করেছে, বনের তলা অন্ধকার! শেওলা জড়ানো একটা গাছের ডাল এক-থোকা লাল ফুল নিয়ে একেবারে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে, তারি উপরে লাল টুপি নীল গাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে-পরে মাছরাঙা নদীতে মাছ ধরতে বসেছে বাদলার দিনে। নদীর মাঝে একরাশ পাথর ছড়ানো; তারি কাছাকাছি এসে চকা হাঁক দিলে— "জিরওবো, জিরওবো।" অমনি মাছরাঙা সাড়া দিলে—"জিরোও-জিরোও।" আস্তে-আস্তে হাঁসের দল ঝরনার স্রোতে পিছল পাথরগুলোর উপর একে-একে উড়ে বসল। এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চুড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনি কম্বলের ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে। দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তার মাঝে গোলাপী এক টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের বরফের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের গলিতে অন্ধকার যে কি ভয়ানক কালো রিদয় আজ টের পেলে, নিজেকে নিজে দেখা যায় না, কোনদিক উপর কোনদিক নিচে চেনা যায় না, কিন্তু অন্ধকারেও ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে। এ-পাহাড়ে এক পাখি হাঁকলে—"হুহু বাতাস হুহু," ও পাহাড়ের পাখি তারি প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল—"ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।" দুই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে—"জল পিট-পিট তারা মিট-মিট" বোঝা গেল এখানো বিষ্টি পড়ছে, দু-একটা তারা কেবল দেখা দিয়েছে। ভালুক-ভালুকী ঝরনার পথে জল খেতে নেমেছে, তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না কেবল বলাবলি করছে শোনো যাচ্ছে—"সেঁৎ-সেঁৎ!" একটা হরিণ কিম্বা কি বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল—"পিছল।" তার পরেই পাহাড়ের গা দিয়ে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

রাতে যে এত জানোয়ার চারিদিকে ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করে বেড়ায় তা রিদয়ের জানা ছিল না। আঁধারের মধ্যে কত কি উসখুস করছে, খুস-খুস করছে, চলছে বলছে—কত সুরে কত রকম গলার তার ঠিক নেই। রিদয়ের মনে হল বাতাসটা পর্যন্ত যেন বনের সঙ্গে ফুসফাস করে এক-একবার বলাবলি করে যাচ্ছে। তখন রাত গভীর ঝিঁঝি পোকা বলে চলেছে ঝিম ঝিম ঝরনা বলছে ঘুম-ঘুম, রিদয়ের চোখ ঢুলে আসতে লাগল। সেই সময় দূরে শোনা গেল—"ইয়া-হু ইয়া-হু" তারপরে একেবারে রিদয়ের যেন কানের কাছেই ডেকে উঠল বিকট গলায় কি এক জানোয়ার—

"তোফা-হুয়া তোফা-হুয়া।"

রিদয় চমকে উঠে শুনলে, কখনো এ-পাহাড়ে কখনো ও পাহাড়ে দুরে-কাছে আগে-পাছে উপরে-নিচে যেন দলে দলে কারা চিৎকার লাগিয়েছে—"ইয়া-হু ইয়া-হু তোফা-হুয়া তোফা হুয়া।" ভয়ে রিদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চকার গা ঘেঁষে শুধোলে — "একি ব্যাপার?"

চকা অমনি বললে—"চুপ চুপ কথা কয়ো না, ডালকুত্তা শিকারে বেরিয়েছে"—বলতে-বলতে ছায়ার মতো একটা হরিণ ওপার দিয়ে দৌড়ে জলের ধারে এসে থর-থর করে কাঁপতে লাগল। ঠিক সেই সময় নদীর দুই পারে শব্দ উঠল—যেন একশো কুত্তা একসঙ্গে ডাকছে—"হুয়া-হু হুয়া হু হুয়া-হু।" ঝপাং করে জলে একটা ছায়া লাফিয়ে পড়ল, তারপর পিছল পাথরের উপর খুরের আঁচড় বসিয়ে ভিজে গায়ে হরিণ এসে রিদয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে-জোরে শ্বাস টানতে-টানতে কেবলি ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চাইতে লাগল। চকা হরিণের ভয় দেখে বললে—"ডালকুত্তা রইল কোন পাহাড়ে তুমি এখানে ভয়ে কাঁপছ দেখি!"

রিদয় বললে—"সেকি এই পাহাড়েই তো এখনি ডাকছিল কুকুরগুলো।"

চকা হেসে বললে—"কুকুরগুলো নয়, একটা কুকুর ডাকছিল, তাও খুব দূরে ডালকুত্তার ডাকের মজাই এই, একটা ডাকলে মনে হবে যেন দশটা ডাকছে—দুরে কাছে চারিদিকে—ভয়ে কোনদিকে যাব ভেবে পাওয়া যায় না, বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ডালকুত্তার ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করেছ কি মরেছ। ঠিক পায়ের শব্দ শুনে কুত্তা এসে তোমায় ধরেছে, যেখানে আছ সেইখানে বসে থাক চুপটি করে, তোমার সন্ধানও পাবে না ডালকুত্তরা।"

হরিণ চকার কথায় কতকটা সাহস পেলে বটে কিন্তু তখনো ভয়ে তার কান দুটো কেঁপে-কেঁপে উঠছে, এমন সময় পিছনে অন্ধকারে খেঁকশেয়াল খেঁক করে হেসে উঠল, হরিণছানাটা একলাফ দিয়ে একেবারে নদী টপকে উপরের পাহাড়ে দৌড় দিলে। চকা বলে উঠল—"কে ও খেঁকশেয়াল নাকি?"

এই পাহাড়ে যে চাঁদপুরের শেয়াল এসে উপস্থিত হবে তা চকা ভাবেনি, আর খেঁকশেয়ালও মনে করেনি, হাঁসেদের দেখা পাবে সে এখানে। শেয়াল আনন্দে চিৎকার আরম্ভ করলে—"হুয়া-হুয়া হুয়া-উয়া বাহোয়া ওয়া-ওয়া!"

চকা শেয়ালকে ধমকে বললে—"চুপ অত গোল করো না, এখনি ডালকুত্তা এসে পড়বে, তখন তুমিও মরবে আমরাও মরব।"

শেয়াল একগাল হেসে বলল—"এবার আমি বাগে পেয়েছি ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে

তবে ছাড়ব। সেদিন বড় যে হাঁসবাজি দেখানো হয়েছিল, এইবার শেয়ালবাজিটা দেখে নাও।” বলেই শেয়াল ডাকতে লাগল—“হুয়া উহা হুয়া-উহা—তোদের জন্যে আমার আর দেশে মুখ দেখাবার যো নেই!”

চকা নরম হয়ে বললে—“অত চেঁচাও কেন, তুমি আগে আমাদের সঙ্গে লেগেছিল। আমাদের দলের লুসাই আর বুড়ো-আংলা দুজনকে খেতে চেয়েছিলে, তবে না আমরা তোমায় জব্দ করেছি, আমরা তো মিছিমিছি তোমার সঙ্গে লাগতে যাইনি।”

শেয়াল দাঁত কড়মড় করে বললে—“ওসব আমি বুঝিনে, বিচার আমার কাছে নেই। বুড়ো-আংলাটিকে আমার দু-পাটি দাঁতের মধ্যে যদি হাজির করে দাও তো এবার ছাড়া পাবে, না হলে ডালকুত্তা এল বলে!”

চকা মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—“আসুক না কুত্তা, এই ঝরনার মধ্যে পাথরের উপরে আর আসতে হয় না—জলে নেমেছে কি কুটোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। রিদয়কে আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না শেয়ালের মুখে, মরি সেও ভালো।” চকা খুব তেজের সঙ্গে এই কথা বললে বটে কিন্তু রিদয় দেখলে ভয়ে তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত কাঁপছে। চকা চুপি-চুপি তাদের সবাইকে বললে—“সাবধান, বড় গোল এবারে, যে অন্ধকার উড়ে পড়বার যো নেই, ডালকুত্তা পাকা সাঁতারু বিষম জোরালো, ঝরনা মানবে না সাঁতরে উঠবে। সে জলের কুমির, ডাঙায় বাঘ বললেই হয়। সব সাবধান, যে যার সামলে, দেখতে না পায় পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে বস!”

হাঁস অমনি ডানায় মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে এক-এক পাথরের মতো এখানে-সেখানে চেপে বসল, কালো বুনো-হাঁসের ডানার রঙে পাথরের রঙে এমন এক হয়ে গেল যে, দু-হাত তফাত থেকে চেনা যায় না, হাঁস কি পাথর। কিন্তু সুবচনীর হাঁস—তার শাদা রঙ অন্ধকারেও ঢাকা গেল না, সে রিদয়কে বুকের কাছে নিয়ে বলল—“দেখ ভাই এবার তোমার হাতে মরণ বাঁচন!”

রিদয় নিজের টেঁক থেকে নরুনের মতো পাতলা ছুরিটি বার করে বললে—“দেখছ তো আমার অস্তর!”

হাঁস বললে—“অস্তরে ভালো করে শান দিয়ে রাখ।”

ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে একবার ডাক এল—“ইয়াহু” তারপরেই ঝপাং করে জলে পড়ে ডালকুত্তা হাঁসের দিকে সাঁতরে আসছে দেখা গেল। শেয়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল—“হুয়া-হুয়া হত্যা হুয়া!”

শেয়াল দেখলে, কুত্তা জল থেকে একটা বাঁকা-নখওয়ালা লাল থাবা শাদা হাঁসটির দিকে বাড়িয়ে দিলে। হাঁসটা কখন ক্যোক করে ওঠে শেয়াল ভাবছে ঠিক সে সময়ে ডালকুত্তা “উয়াহুঃ” বলে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে-খেতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপারে উঠল, আর ডানা ঝটপট করে হাঁসের দল অন্ধকার দিয়ে একদিকে উড়ে পালাল।

শেয়ালের ইচ্ছে হাঁসের পিছনে তাড়া করে চলে, কিন্তু ব্যাপারটা হল কি সেটা জানতে তার লোভ হচ্ছে, সে উপর থেকে ডালকুত্তাকে ডাক দিয়ে শুধোল—“ক্যায়া-হুয়া ক্যায়া-হুয়া?”

রিদয়ের নরুনের ঘায়ে তখন ডালকুত্তা অস্থির। সে রেগে বললে—“চোপরাও যাও-যাও!”

শেয়াল বললে—"কি দাদা হাত ফসকে গেল নাকি?"

কুত্তা গা ঝাড়া দিয়ে বলল—"শাদা হাঁসটাকে টেনে নিয়েছিলুম আর কি, কি জানি সেই সময় টিকটিকির মতো একটা কি জানোয়ার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দিলে, যে চোখে আমি সরষে ফুল দেখলুম!" কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।

শেয়াল "হাঃ গিয়া হাঃ জিয়া" বলে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁসেদের সঙ্গে আবার দৌড়ল। হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে দুই পাহাড়ের গলির মধ্যে দিয়ে কেবল কুল কুল জলের শব্দটি ধরে এঁকে-বেঁকে উড়ে চলেছে অজানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে বসে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আর চকাকে পায় কে, ঝক-ঝকে সরু সাপের মতো নদীর ধারাটির উপরে চোখ রেখে চকা হাঁসের দলকে নিয়ে সোজা নিচ মুখে নেমে চলল। সিনিবালি চা-বাগানের উপরটায় এসে নদী একটা বড় পাথর ঘুরে ঝরনা দিয়ে একেবারে দুশো হাত নিচে পড়েছে, চাতালের মতো সেই পাথরে এসে চকা দলবল নিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে বসল।

ঝরনার একদিকে ধাপে-ধাপে চা-বাগান পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত সিঁড়ির মতো উঠে গেছে, আর একদিকে বনের ধারে চা-বাগানের মালিকের ঘরবাড়ি, সেখান থেকে পাকদণ্ডি নেমেছে ঝরনা পর্যন্ত। হাঁসেরা রাতে এখানে ওখানে উড়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল, রিদয় কেবল জেগে পাহারা দিতে লাগল।

খানিক রাতে বনের মধ্যে একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখলে ডালকুত্তার সঙ্গে শেয়াল কি ফুসফাস' করতে-করতে পাকদণ্ডি দিয়ে নামছে, অন্ধকারে দুজনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। রিদয় তাগ করে একটা পাথর কুচি ছুঁড়ে শেয়ালটকে মারতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা পাহাড়ি সাপের গায়ে তার হাত পড়ল, ঠাণ্ডা যেন বরফ। রিদয় একেবারে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বলল—"পালাও-পালাও, শেয়ালটা এবারে আমাদের সাপে খাওয়াবার মতলব করেছে।"

হাঁসেরা একেবারে ডানা মেলে আকাশে যেমন লাফিয়ে উঠল, ঠিক সেই সময় পাথরের হাতুড়ির মতো পাহাড়ি সাপের মাথাটা সোঁ করে তাদের পায়ের নিচে দিয়ে ছুটে এসে পাথরে ছোবল দিলে। চকা শিয়ালের উপর ভারি চটেছে, নদীর উপর দিয়ে গেলে শেয়ালটা সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না বুঝে চকা এবারে একেবারে উপর দিয়ে দিয়ে উড়ে চলল সোজা শিলিগুড়ি স্টেশনের টিনের ছাতের দিকে।

দার্জিলিঙ মেল আসতে এখনো তিন ঘন্টা। স্টেশনে লোকজন নেই, হোটেলগুলোর টিনের ছাত বিষ্টিতে ভিজে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। পাহাড়ের অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ ফাঁকায় পড়ে রিদয়ের ধাঁধা লেগে গেল। আকাশ থেকে সে টিনের ছাদগুলোকে দেখছে যেন ছোট-ছোট পাহাড়ের চুড়ো শাদা বরফে ঢাকা। হাঁসেরা সেইদিকে নেমে চলল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে—"কর কি, ওখানে যে খালি বরফ, বসবার জায়গা কোথা!" কিন্তু হাঁসেরা তার কথায় কান না দিয়ে নেমেই চলল!

রিদয় দেখলে পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশে দুই হাত ছড়িয়ে একটা যেন দৈত্য লাল সবুজ দুটো চোখ নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। রিদয়ের আরও ভয় হল। সে দুই-পা গুটিয়ে হাঁসের পিঠের পালকে লুকোবার চেষ্টা করছে এমন সময় হাঁসেরা ঝুপঝাপ করে স্টেশনে টিনের ছাতে নেমে পড়ল। তখন রিদয়ের ভুল ভাঙল, সে দেখলে

রাস্তার আলোগুলোকে ভেবেছিল সব তারা, টিনের ছাতগুলোকে পাহাড়ের চুড়ো—আর লাল সবুজ লণ্ঠন দেওয়া সিগনাল পোস্টটাকে একটা দৈত্য।

রিদয় স্টেশন কখনো দেখেনি, টিনের ছাদে ছুটোছুটি করে এদিক-ওদিক দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চুড়োয় দুটো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ কোনদিকে বাতাস বইছে দেখবার জন্যে কেবলি ঘুরছে, তারি উপরে একটি গোলা, সেই গোলায় এক-পা রেখে আকাশে চিমটের মতো দুই ঠোঁট উঠিয়ে কঙ্ক-পাখি আরামে ঘুম দিচ্ছেন। রিদয়কে টিনের উপর ছুটোছুটি করতে শুনে কঙ্ক-পাখি গোলার উপর থেকে ধমকে উঠলেন—"গোল করে কে?"

রিদয়ের দুষ্টুমি গেছে কিন্তু ফষ্টিনষ্টি করবার বাতিক এখনো খুব আছে। সে অমনি বলে উঠল—"গোল আর করবে কে, গোলের মাঝে বসে আছ তুমি, তোমারি এক কাজ।"

'ভালো রে ভালো বলছিস' বসে কঙ্ক পাখি চিমটের মতো ঠোঁটে গিরগিটির মতো রিদয়কে ধরে বার কতক আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করে বললে—"দেখ ছোকরা, এত রাত্রে ছাতে খুটখাট করলে এখনি স্টেশন-মিস্ট্রেস মেমের ঘুম ভেঙে যাবে আর স্টেশনমাস্টার এসে আমাদের উপরে গুলি চালাবে। যদি স্টেশন দেখতে চাও তো ওই জলের পাইপটা ধরে নেমে যাও কিন্তু খবরদার স্টেশনের জল খেও না, তাহলেই ম্যালেরিয়া হয়ে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই যেমন একবার মরেছিলেন তেমনি তুমিও মরবে।"

রিদয় বললে—"সে কেমন কথা?"

কঙ্ক বললেন—"শোনো তবে বলি।"

কথার নাম শুনেই চারিদিক থেকে হাঁস পাখি যে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল চাঁদের আলোতে টিনের ছাতে বুড়ো কঙ্ক-পাখিকে ঘিরে বসল। চাঁদটাও যেন গল্প শুনতে কঙ্কের ঠিক পিঠের দিকে টিনের ছাতের কার্নিসে এসে বসল।

কঙ্ক গলা খাঁকাড়ি দিয়ে শুরু করলেন;

আমাদের কঙ্ক বংশের শেষ অঙ্কের যে আমি, আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহো ছোট-কঙ্ক, তাঁর প্রস্বর্গীয় মধ্যম প্রপিতামহো মেঝো-কঙ্ক মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহো ধর্মাবতার বড়-কঙ্ক—তিনি কাম্য বনে এক রম্য সরোবরে বাস করছেন, এদিকে একদিন হয়েছে কি, না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা পেয়েছে। বনের মধ্যে তেষ্টা পেয়েছে, খুঁজে-খাঁজে জল খেয়ে নিলেই হত, না হুকুম করলেন—"ওরে ভীম জল নিয়ে আয়।" ভীম চললেন—জল খুঁজে-খুঁজে তাঁরও তেষ্টা পেয়ে গেল। সেই সময় আমাদের ধর্মাবতার বড় কঙ্ক সে পুকুরে পাহারা দিচ্ছিলেন, সেই কতকালের পানা পুকুরটার দিকে ভীমের নজর পড়ল, জল দেখে ভীমের তেষ্টা যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুগুণ বেড়ে গেল। ভীম তাড়াতাড়ি পুকুরে নামলেন, অঞ্জলি ভরে বৃকোদর প্রায় পুকুরের অর্ধেক জল তুলে নিলেন দেখে আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহের পিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উঠলেন—"অঞ্জলি করিয়া জল না করিহ পান, সমস্যা পূরণ করি কর জল পান—নতুবা তোমার মৃত্যু।"

সমস্যা দিয়ে জল ফিলটার করে খাবার দেরি সইল না, বৃকোদর আমাদের ধর্মবতারের পানা পুকুরের পচাজল চকচক করে খেয়ে ফেললেন, যেমন খাওয়া অমনি

কম্পজর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। তার পর অর্জুন এলেন, নকুল সহদেব এলেন, দ্রৌপদী এলেন, সবার সেই দশা, কেউ সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে নিতে চাইলেন না। শেষে যুধিষ্ঠির এসে ধর্মবতার কঙ্কের কথামতো চারবার সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে তবে বেঁচে গেলেন; আর সেই শোধন করা শান্তি জল দিয়ে চার ভাই আর দ্রৌপদীকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

রিদয় শুধালে—"বারি শোধন করার সমস্যা কোথায় পাওয়া যায়, তার দাম কত?"

কঙ্ক হেসে বললেন—"সমস্যা কি জলের কুঁজো যে বাজারে পাবে? সমসকৃততে সমস্যা লেখা হয় মন্তরের মতো, সেইটে পাঠ করে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে এক নাক টিপে নাকের মধ্যে জল টেনে নিতে হয়, আর বলতে হয়, আদি গঙ্গা সাত সমুদ্র তেরো নদী বান্ধিলাম, দশঘড়ায় বান্ধিলাম, জিহ্বার উপর বান্ধিলাম, সরস্বতী যমুনা-বন্ধ, মাতা গঙ্গাভাগীরথী ফুঃ ফুঃ ফুঃ। মন্তর যদি শিখতে চাও তো কামরূপ কামিখ্যেয় আমার হাড়গিলে-দাদার কাছে যাও। সাপের মন্তর বাঘের মন্তর শেয়ালের মন্তর সব মন্তর তিনি জানেন, আর কোনো ভাবনা থাকবে না নির্ভয়ে যেখানে খুশি বেরিয়ে বেড়াতে পারবে।"

চকা বলে উঠল—"এ পরামর্শ মন্দ নয়! খেঁকশেয়ালটা যে রকম সঙ্গে লেগেছে তাতে একটা শেয়ালের মন্তর রিদয়কে না শিখিয়ে নিলে তো আর চলছে না। সেই কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে, এর মধ্যে কত বিপদ-আপদ আছে—চল কিছুদিন কামরূপে থেকে গোটাকতক মন্তর নিয়ে যাওয়া যাক।

কঙ্ক বললেন—"চল, দাদার কাছে আমারও গোটাকতক মন্তর নেবার আছে।" চকাকে কঙ্ক শুধোলেন—"তোমরা কোন পথে কামরূপ যেতে চাও? ব্রহ্মপুত্রের পথে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, আর আমার সঙ্গে যদি সিধে রাস্তায় যেতে চাও তো এখান থেকে তরসা নদী একবেলা, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি বক্সাও কুচবেহার হয়ে জয়ন্তী আর একবেলা, সেখানে রাত কাটিয়ে মোচু নদীতে জল খেয়ে গোয়ালপাড়া দশটার মধ্যে, সেখান থেকে বেলা পাঁচটায় মানস নদী, ছটা নাগাদ কামরূপ কামাখ্যার মন্দির—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে হাড়গিলের চরে আমার দাদা থাকেন।"

চকা কঙ্ক-পাখির কথায় সায় দিয়ে তরসার পথেই বাঁয়ে হিমালয় পাহাড় রেখে সোজা পুবমুখী কারূপে রওনা হল। খানিক উড়েই চকা বুঝলে কঙ্ক-পাখির সঙ্গে বেরিয়ে ভালো করেনি। তার নাম যেমন কঙ্ক চলাও তেমনি বঙ্ক, মোটেই সোজা নয়। সে শিলিগুড়ি ছেড়েই দক্ষিণমুখো চলল, মহানদীর ধার দিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে তিতলিয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে উত্তরপুবে বেঁকে কুচবিহার ঘেঁষে বার্ণিশ-ঘাট, তারপর তিস্তানদীর উপর দিয়ে এঁকতে-বেঁকতে উত্তর মুখে রামসাই হাট হয়ে বোগরা কুঠি একেবারে পাহাড়তলীতে উপস্থিত, এখান থেকে সেখান থেকে পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে পুবে মাদারি পর্যন্ত। সেখান থেকে তরসা নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণে এসে একেবারে কুচবেহার রাজবাড়ির উপরে এসে পড়া, সেখান থেকে আবার উত্তরে আলিপুর বক্সাও জয়ন্তী হয়ে একেবারে জলপাইগুড়ি পরগণার পুব মোহড়ায় মোচু নদীতে হাজির। এর পরেই গোয়ালপাড়া আরম্ভ।

এইভাবে এদিক-ওদিক একোণ-ওকোণ এপাড়া-ওপাড়া যেন কি খুঁজতে খুঁজতে কঙ্ক-পাখি তীরবেগে চলেছে। তার সঙ্গে উড়ে চলা হাঁসদের সম্ভব নয়। কাজেই চকা নিজের

পথ দেখে হাঁক দিতে-দিতে চলল—"তরসা তরসা।" ওদিকে যেমন কুঁকড়ো, এদিকে তেমনি উত্তর থেকে দক্ষিণ-মুখো যে সব নদী চলেছে, তারি ঘাটে-ঘাটে কাদাখোঁচা জলপীপী ঘটিয়াল হাঁক দিচ্ছে—"তরসা পশ্চিমকুল মাদারি!" মাদারি হয়ে তরসার উপর দিয়ে হাঁসেরা পাড়ি দিতে লাগল, দূরে ডাইনে কুচবেহারের রাজবাড়ি, তরসার পুবপারে রাজাদের জলকরে পানিকাক হাঁকলে—"বক্সাও!" আরও দুরে জলপাইগুড়ির সীমানায় তিতিরে হাঁকলে "জয়ন্তি!"

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়ায় মোচু নদীর কাছ বরাবর এসে হাঁসেরা আকাশ মেঘে অন্ধকার দেখলে, জোর বাতাস তাদের ক্রমেই উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁসেরা এঁকে বেঁকে কখনো উত্তর ঘেঁষে একেবারে হিমালয়ের দেওয়ালের ধার দিয়ে কখনো দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল, সারাদিন।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়ে কামরূপ মানস নদীর কাছ বরাবর এসেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে বোঁ-বোঁ-সোঁ-সাঁ শব্দ উঠল যেন হাজার-হাজার পাখি উড়ে আসছে। পায়ের তলায় মানস নদীর জল হঠাৎ কালো ঘোরাল হয়ে উঠল, দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে হাঁসেদের ডানার পালকগুলো উস্কোখুস্কো করে দিলে।

চকা ঝপ করে ডানা বন্ধ করে পলকের মতো চমকে যেন আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপরে তীরের মতো মানস নদীর দিকে নেমে চলল, ডাক দিতে-দিতে—"সামাল জমি লাও জমি লাও।" কিন্তু জমি নেবার আগে ঝড় একেবারে ধুলো-বালি শুকনো পাতা ছোট-ছোট পাখিদের ঠেলতে ঠেলতে তরতর করে এসে পড়ল। বাতাসের তোড়ে মাঝ-দরিয়ার দিকে চকা-নিকোবরের দলকে ঠেলে দিতে লাগল, জমি নেবার উপায় নেই। মানস নদীর পশ্চিম কুলে বিজলী-গাঁয়ের উপর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাতাস হাঁসের দলকে দেখতে-দেখতে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে আসছে, সামনে মানস নদীর ওপারের ভাঙন-জমি পাহাড়ের মতো উঁচু, সেখানে হাওয়া যদি আছড়ে ফেলে, তবে একটি হাঁসও বাঁচবে না। ঘোরবারও উপায় নেই, এদিকে মাঝনদীতে তুফান উঠেছে, ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়ে সামনের ভাঙনে আছড়ে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়, তার চেয়ে জলে পড়ে বরং সাঁতরে বাঁচবার উপায় আছে স্থির করে সব হাঁস ঝুপঝাপ নদীতে নেমে পড়ল, শাদা-শাদা ফেনা নিয়ে চারিদিকে সাপের ফনার মতো ঢেউ উঠেছে—পড়ছে, একটার পিছে তেড়ে আসছে আর একটা, মাথার উপর ঝড় ডাকছে সোঁ-সোঁ, চারিদিকে জল ডাকছে, গোঁ-গোঁা, নদীতে একখানি নৌকো নেই, একটি ডিঙিও নেই, কেবল মাঝনীদতে ঢেউয়ের উপরে-উপরে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে মোচার মতো হাঁস কটি।

জলে পড়ে হাঁসেদের কোনো কষ্ট নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে একগাছা ছেঁড়া মালার মতো, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছে। কেবল চকার ভয় হচ্ছে পাছে দলটা ছড়িভঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই সে থেকে-থেকে ডাক দিচ্ছে—"কোথায়!" অমনি বাকি হাঁসেরা উত্তর দিচ্ছে—"হেথায়-হেথায়।" চকা একবার রিদয়কে ডাক দিচ্ছে—"ভাসান-ভাসান।" আকাশ দিয়ে স্থলচর পাখিরা ঝড়ে লুটোপুটি হয়ে চলেছে। হাঁসেরা দিব্বি আছে দেখে তারা বলতে-বলতে উড়ে চলল—"সাঁতার-সাঁতার উ-উ-উ গেছি-গেছি-গেছি, মরি-মরি-মরি!" কিন্তু ঢেউয়ের উপর দিয়ে দড়ি-ছেঁড়া নৌকোর মতো দুলতে দুলতে চলাতেও বিপদ আছে। চকা দেখলে হাঁসেরা ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার যোগাড় করছে, সে অমনি সবাইকে সাবধান

করতে লাগল।—"ঘুমেসারা দলছাড়া, দলছাড়া গেছ-মারা, চোখ খোল চোখ মেল।" চকা বলছে বটে চোখ খোল কিন্তু নিজেরও তার চোখ ঢুলে এসেছে, অন্য হাঁসগুলো তো একঘুম ঘুমিয়েই নিচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সামনের একটা ঢেউয়ের মাথার পোড়া কাঠের মতো একটা কি ভেসে উঠল। চকার অমনি চটকা ভেঙে গেল—সে কুমির-কুমির বলেই দুই ডানার ঝাপটা মেরে সোজা আকাশে উড়ে পড়ল, খোঁড়া-হাঁস রিদয়কে নিয়ে যেমন জল ছেড়েছে আর কুমির জল থেকে ঝম্প দিয়ে তার খোঁড়া-পায়ে একটা দাঁতের আঁচড় বসিয়ে ডুব মারলে। খোঁড়া ইস বসে এক লাফে আর পাঁচ হাত উপরে উড়ে পড়ল। কুমিরটা আর একবার জল থেকে নাটা-চোখ পাকিয়ে নাকটা তুলে এদিক-ওদিক করে ভুস করে ডুব মারলে।

হাঁসের দল উড়তে-উড়তে খানিক গিয়ে আবার জলে পড়ল, কিন্তু সেখানেও আবার কুমির, আবার ওড়া, আবার গিয়ে জলে পড়া—এই ভাবে সারাদিন কাটল।

কত ছোট পাখি যে এই ঝড়ে মারা পড়ল, পথ হারিয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়ল, না-খেয়ে জলে ভিজে নদীতে পড়ে পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কত যে পাখি মরে-ঝরে গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই। চকার দল হাঁফিয়ে পড়েছে, এদিকে অজানা নদী, ওদিকে অচেনা ডাঙা। পাহাড় থেকে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গড়িয়ে চলেছে—ঝড়ে-ভাঙা বড়-বড় গাছের ডাল ভেসে চলেছে, চকা দলবল নিয়ে একবার গাছের ডালে ভর দিয়ে জিরোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভিজে ডাল একেই পিছল তার উপরে আবার স্রোতে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে। বাতাস ক্রমাগত তাদের জলে ঠেলে ফেলতে লাগল, ওদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, জলে থাকা আর চলে না, হাঁসেরা উড়ে পড়ল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালো মেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হু-হু বাতাস, থেকে-থেকে পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে পড়ছে, বজ্রাঘাতে বড়-বড় গাছ মড়-মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরি মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙায় আশ্রয় নিতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় সামনে একটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখল হাওয়ার মতো একটা পাহাড়ের দেওয়াল নদীর থেকে আকাশে উঠছে আর তারি তলায় নদীর জল তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ছে। চকা সোজা পাহাড়ের দিকে চলেছে। রিদয় ভাবলে—এইবার শেষ, আর রক্ষে নেই, সে বিষ্টিতে কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে এমন সময় চকা ডাক দিলে—"বাঁয়ে ঘেঁষে।" দেখতে-দেখতে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খিলেনের মতো একটা গুহা দেখা গেল, চকা হাঁসের দল দিয়ে তারি মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল—সেখানে বিষ্টি নেই, জল নেই, বাতাসও আস্তে-আস্তে আসছে সোঁ-সোঁ করে। ডাঙায় পা দিয়েই চকা দেখতে লাগল সেথা সবাই আছে কিনা। সবাইকে পাওয়া গেল, কেবল কঙ্ক পাখি, যে তাদের পথ দেখিয়ে আনছিল, তার কোনো খোঁজই হল না।

গুহাটার মধ্যে শুকনো বালি কাঁকর আর ঘাস। হাঁসেরা তারি উপরে বসে ভিজে পালক ঝেড়ে-ঝুড়ে নিচ্ছে, চকা রিদয়কে নিয়ে গুহাটা তদারক করতে চলল। মস্ত গুহা, মুখের কাছটায় আলো পড়েছে, ভিতর দিকটা অন্ধকার, দু-ধারে দেয়ালের গায় রেলগাড়ির বেঞ্চির মতো থাকে-থাকে পাথর সাজানো—একপাশে একটি ডোবা, তাতে পরিষ্কার, বিষ্টির

জল ধরা রয়েছে। রিদয় বলে উঠল—“বাঃ, ঠিক যেন ধর্মশালাটি।” অমনি গুহার ওধারে অন্ধকার থেকে কারা যেন বলে উঠল—“ধর্মশালাই বটে!” রিদয় ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

চকা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অন্ধকারে এ-কোণে ও-কোণে জোড়া-জোড়া সবুজ চোখ পিটপিট করছে। “ওই রে বাঘ।” বলেই চকা রিদয়কে মুখে করে তুলে দৌড়। রিদয় চেঁচাচ্ছে—“বাঘ বাঘ!” সেই সময় অন্ধকার থেকে জবাব হল—“ভ্যে-ভ্যে ভেড়া।”

এবার রিদয়ের সাহস দেখে কে, সে বুক ফুলিয়ে ভেড়াদের সর্দার দুম্বার কাছে গিয়ে শুধলে—“এখানে যে তোমরা বড় এলে! এটা আমাদের ঘর, যাও।”

দুম্বা তার কানের দু-পাশে গুগলী পেঁচ দুই শিং পাথরে ঘষে বললে—“এখানে আমরা ইচ্ছে-সুখে এসে ধরা পড়ে কামিখ্যের ভেড়া বনে গেছি, যাব কোথায়, যাবার স্থান নেই!”

রিদয় অবাক হয়ে বলে—“কি বল এই কামরূপ কামিখ্যের মন্দির? এইখানে মানুষকে তারা ভেড়া বানিয়ে রাখে।”

হাঁও বটে নাও বটে, এই ভাবে ঘাড় নেড়ে দুম্বা বললে—“এটা কি গোয়াল না এটা আমাদের বাড়ি—এটা একটা যাদুঘর। এখানে যা দেখছ সব ইন্দ্রজাল, ভৌতিক ব্যাপার। এদিক দিয়ে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে চলতে ভয় পায়, তোমরা কার পরামর্শে এখানে এলে শুনি? মহাভারতের ধর্মাবতার কঙ্ক তার কোনো পুরুষের কেউ নয়, সেই বকধার্মিক কঙ্ক-পাখির সঙ্গে তোমাদের পথে দেখা হয়নি তো!”

কঙ্ক পাখির পাল্লায় পড়েই তারা এদিকে এসেছে শুনে দুম্বা হা-হুতাশ করে বললে—“এমন কাজও করে, বকধার্মিকের কাজই হচ্ছে নানা ছলে লোককে ভুলিয়ে এই কামরূপে এনে মানুষকে ভেড়া, ভেড়াকে ছাগল বানিয়ে দেওয়া, এটা বুঝলে না—কি আপসোস!”

রিদয় ভয় পেয়ে বলে উঠল—“এখন উপায়!”

দুম্বা খানিক ভেবে বললে, “উপায় আর কি, এক উপায় যদি বকধার্মিক এই ঝড়ে রাস্তা ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে থাকে তবেই তোমরা এবারের মতো বেঁচে গেলে।”

চকা শুধোলে—“আর সে যদি এসে পড়ে তো কি হবে?”

দুম্বা উত্তর করলে—“সে এসে ঠোঁট দিয়ে তোমাদের মাথা ফুটো করে যা কিছু বুদ্ধি আছে মগজের সঙ্গে সবটুকু বার করে নেবে; আর তোমরা কেউ বোকা ছাগল, কেউ মেড়া, কেউ ভেড়া হয়ে আ-আ করে তাকেই তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেবার জন্যে বাহবা ধন্যবাদ দিতে থাকবে”

রিদয় রেগে বলে উঠল—“মাথা ফুটো করতে দিলে তবে তো? যেমন দেখব সে আসছে অমনি, আমরা সরে পড়ব না?”

দুম্বা শিং নেড়ে বলল—“তা হবার যো নেই, সে ধুলোপড়া দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কাজ উদ্ধার করে যাবে তোমরা টেরও পাবে না। মনে হবে, কে তোমাদের মাথা চুলকে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে আরামে। তারপর চোখ খুলে দেখবে ভেড়া হয়ে গেছ।”

চকা এগিয়ে এসে শুধোলে—“এত বোকা ছাগল বোকা মেড়ায় তার কি দরকার

বলতে পার?" দুম্বা খানিক চোখ বুজে বললে—"ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি নাকি"—বলেই দুম্বা হঠাৎ চুপ করে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

রিদয় ব্যস্ত হয়ে শুধালে—"কি শুনেছ বলেই ফেল না।"

দুম্বা আরো ব্যস্ত হয় বললে—"চুপ চুপ অত চেঁচিয়ো না, কাজ কি বাবু ওসব কথায় শেষে কি ফ্যাসাদে পড়ব? কে কোন দিকে শুনবে, শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি। যাক ও কথা, কুবরী-কুবরী"—বলে দুম্বা চোখ বুজল।

রিদয় অনেক পেড়াপীড়ি করেও কুবরী ছাড়া আর একটি কথাও বোকাছাগলের মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। চকা চুপি চুপি রিদয়কে বললে—"তুমিও যেমন, বোকামেড়া, ওর কথার আবার মূল্যা আছে? নিশ্চয় ওটার মাথার গোল আছে, এস এখন খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক, সকালে উঠে নিজের পথ নিজে দেখা যাবে।" তারপর দুম্বার দিকে চেয়ে বললে—"মশায় যদি জানতেন আমরা আজ সারা রাস্তাটা কি কষ্টে কাটিয়ে এখানে এসেছি, তবে এই রাতে আমাদের মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা না করে বরং কিছু অতিথি সৎকারের বন্দেবস্ত করে দিতেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়েই এখানটায় আশ্রয় নিয়েছি, এখন উচিত হয় আপনার আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের জন্যে জলযোগ এবং তারপরে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া।"

এবারে দুম্বা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বললে—"আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি, দেখুন কি কাণ্ড হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না!"

চকা এবার সত্যি ভয় পেলে, কোন দিক থেকে বিপদ আসে ভেবে চারিদিকে চাইতে লাগল।

দুম্বা ডাকলে—"আসুন আহার প্রস্তুত কিন্তু দেখবেন চটপট আহার সেরে উঠবেন, না হলে ব্যাঘাত হতে পারে। আপনারা আসন গ্রহণ করুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আসন-বন্ধন মন্ত্রটি পাঠ করছি।" রিদয় আর হাঁসেরা খেতে বসে গেল। দুম্বা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল—

মেষ চর্মের আসন তোরে করিরে পেননাম
আমার কার্যে তুই হ রে সাবধান।
কামিখ্যার বরে তোরে করিলাম বন্ধন
এ কার্যে যেন তুই না হোস লঙ্ঘন।।

হাঁসেদের অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় দূরে কেউ ডাকল। দুম্বা মন্তর জপতে-জপতে বলল—"ওই শুনেছেন তো এঁরা আসছেন, এরি মধ্যে খবর হয়ে গেছে। ব্যাঘাত হল চটপট খেয়ে নিন" বলেই দুম্বা তাড়াতাড়ি মন্তর পড়তে লাগল;

লাগ-লাগ ফেরুপালের দন্তের কপাটি
কোনো ভূতে করিতে নারিবে আমার ক্ষতি
শীঘ্রি লাগ শীঘ্রি লাগ।

মন্তরের চোটে কেউ আর ঢুকতে সাহস পেলে না বটে কিন্তু বাইরে চারদিকে ফেরুপাল চিৎকার করে কানে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল—"হুয়া-হুয়া, খাওয়া হুয়া, হুয়া খাওয়া, হুয়া খাওয়া।"

রিদয় বললে,—"এত গোল করে কে?" রিদয়ের কথা তখন আর কে শোনে? তখন দুম্বা ব্যোঘাৎ-বেঘ্যাৎ বলে চেঁচাচ্ছে আর ঘরের মাঝে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যেন সর্বনাশ হচ্ছে। রিদয় দুম্বার রকম দেখে চেঁচিয়ে বললে—"আরে মশায়, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না, অত বুক চাপড়ে ছুটোছুটি করছেন কেন!"

দুম্বার তখন ভয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছে সে কাঁপতে কাঁপতে বললে—"সর্বনাশ হল, হায়-হায় কি উপায়, কি উপায়!"

রিদয় আরো চটে বললে—"আরে মশাই হয়েছে কি তাই বলুন না?"

দুম্বা তখন একটু স্থির হয়ে বললে—"ওই খেঁকি-খেঁকি-খেঁকি খেঁকশেয়ালি ওই তিন ফেরুপাল ওঁরা যদি আমাদের দেওয়া মুড়ো কিম্বা ভেড়ার মাংস না খান তো আপনাদেরই তো লাভ, এতে আপনার দুঃখুই বা কি, ভয়ই বা কি?"

দুম্বা শিং নেড়ে বললে—"আহা আপনি বুঝবেন না, ওঁদের মুড়ো মাংস খাওয়ানো যে ভেড়াবংশের সনাতন প্রথা, সেটা বন্ধ হলে যে আমাদের জাত যাবে, আমরা একঘরে হয়ে যাব, তার করলেন কি?"

রিদয় গম্ভীর হয়ে বললে—"আগে আপনি কি করতে চান শুনি?"

দুম্বা কেঁদে বললে—"আমি এ প্রাণ রাখব না—আমি সমাজ-দ্রোহী, আমি নরকে যাব স্থির করেছি, আমি হতভাগ্য।"

রিদয় দুম্বার শিঙে হাত বুলিয়ে বললে—"ওদের ঠান্ডা করবার কি আর কোনো উপায় নেই।"

দুম্বা ঘাড় নেয়ে বললে—"আর এক উপায়—তুষানলে জ্বলে পুড়ে মরা, কিন্তু তার চেয়ে নরককুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই সহজ।"

রিদয় বলে উঠল—"কাজ আরো সহজ হয় ওই তিনটে কুকুরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া!"

দুম্বা দুই চোখ পাকল করে অবাক হয়ে বললে—"একি সম্ভব!"

রিদয় বললে—"দেখি তোমার শিং খুব সম্ভব এক ঢুঁয়ে তিনটেকে একেবারে নরকে চালান করে দেওয়া যায় যদি তুমি তাল ঠুকে লাগ।"

দুম্বা বলল,—"তাল ঠুকে ঢুঁ লাগাতে আমি মজবুত কিন্তু ওদের দেখলেই যে আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, তার কি?"

রিদয় দুম্বার পিঠ চাপড়ে বললে—"তোমরা চোখ বুজে থেক—আমি যেমন বলব 'শিং টিং চট' অমনি একসঙ্গে সবাই ঢুঁ বসিয়ে দিও, দেখি ওরা কি করে!"

এবারে অন্য-অন্য ভেড়ো তুলাডু ঝাঁকাডু তারা এগিয়ে এসে বললে—"আমরা দু-একটা কথা বলতে চাই, আমরা ঢুঁসোতে রাজী কিন্তু তার আগে ভেবে দেখা কর্তব্য যে ফেরুপালদের সরিয়ে দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? তাঁরা হলেন আমাদের ধোপা নাপিত এবং চরাবার কর্তা, ধরতে গেলে মেঘবংশের মাথা। রাজদ্বারে শ্মশানে চ ওঁরা আমাদের বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব বললেই হয়। ওঁরা মাঝে-মাঝে আমাদের চিরুনী দাঁতে টেনে নখে

আঁচড়ে, রোঁয়া ছেঁটে, চাম ছাড়িয়ে, চেটে-পুটে সাফ না করে দিলে—কে মড়মড়ায় কে পড়পড়ায় কে ভাঙে খড়ি? আমাদের গা-শুদ্ধি হবারই যো নেই যদি না পাল-পার্বণে তাঁদের মাঝে-মাঝে মেষ চর্মের আসনে বসিয়ে মেষমাংসে আমরা মুখশুদ্ধি করিয়ে দিতে পারি, এছাড়া আমরা খাঁড়া আর হাড়িকাট সামনে রেখে হাড়িপ-বাবা আর হাঁড়ি-ঝি মাতাজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি খণ্ডা দ্বিখণ্ডা সুমুক্তি বাহার গরল ভাবহং মানুরিক্ত ঘুমাইয়া আছি স্মটিকের মুণ্ডি। আমাদের এ-মাথায় কোনো কাজ করতে গেলেই গুরুর কোপে পড়তে হবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হয়ে নরকেও যেতে হবে, এর জবাব আপনি কি দেন?'

রিদয়কে আর কোনো জবাব দিতে হল না—খেঁকি-খেঁক-খেঁকি-খেঁক-খেঁকানি তিনটে হেঁড়েল হঠাৎ এসে তিন ভেড়ার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল, হাঁসেরা ডানা ঝটাপট করে গুহার মধ্যে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল, রিদয় তাড়াতাড়ি দুম্বার পিঠ চাপড়ে দুই হাতে তার ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে হুকুম দিলে—"শিং টিং চট, দে টুঁসিয়ে চটপট।" দুম্বা আর ভাবতে সময় পেলে না, অন্ধকারে, সামনে আর ডাইনে-বাঁয়ে তিন-টুঁ বসিয়ে দিলে। খটাশ-খঠাশ করে তিনটে হাঁড়িমুখো হাড়খেকো হেঁড়েলের মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল! ঠিক সেই সময় বাইরে দুদ্দাড় করে ঝড়-বৃষ্টি নামল—

শিল পড়ে তড়বড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়
হড়হড় কড়মড় বাজে—ঘন-ঘন ঘন-ঘন গাজে।
ঝঞ্জনার ঝঞ্ঝানী বিদুৎ চকচকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জল ঝরঝরি
তড়তড়ি শিলার জলের তরতরি
ঘুটঘুট আঁধার বজ্রের কড়মড়ি
সাঁই-সাঁই বাতাস শীতের থরথরী।

ভেড়গুলো কুবরী-কুবরী বলতে বলতে এ ওর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে, এমন সময় ঝড়ে একখানা পাথর খসে গুহার মুখটা একেবারে দরাজ হয়ে কত বড় যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই। ঝড় থামলে সেই খোলা পথে সকালের আলো এসে গুহার মধ্যে সবাইকে জাগিয়ে দিলে। চকা সেই আলোতে ডানা মেলে, রিদয় আর খোঁড়া আর কাটচাল আর নানকৌড়িকে নিয়ে, হাড়গিলের চরে যেখানে আণ্ডামানি লালসেরা হাঁসদের বড় দলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই দিকে চলল।

ভেড়ার দল হঠাৎ কতকালের অন্ধকার গুহার মধ্যে দিনের আলো পেয়ে প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে হতভম্বের মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে-আস্তে পাহাড়ের উপর বুনো-ভেড়ার দলে মিশে দিব্বি চলে বেড়াতে লাগল। রাতের কথা, রিদয়ের কথা, হাঁসদের কথা কোনো কথাই তাদের মনে রইল না। তারা যেন চিরকালই বুনো-ভেড়া এইভাবে সহজে খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের চাতালে-চাতালে ঘাস খেয়ে পাতা-লতা খেয়ে মনের সুখে

দিন কাটাতে লাগল। ভেড়ার মধ্যে দুম্বাই কেবল মনে রাখতে পারলে রিদয় কেমন করে, তাদের নরককুণ্ডের মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের উপরকার এই খোলা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই! দলের ভেড়ারা সন্ধ্যেবেলায় অভ্যেস মতো যখন তাদের পুরোনো ঘর গুহাটার দিকে চলল তখন দুম্বা তাদের এক-এক ঢুঁ মেরে বনের দিকে ফিরিয়ে দিলে।

আসামী বুরুঞ্জি

উত্তর থেকে বড় নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে মিলেছে ঠিক সেই বাঁকের মুখেই কতকালের পুরোনো ভিমরুয়ার আসামী রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি। নাটবাড়ির নিচেই নদী মজে গিয়ে মস্ত চর পড়েছে। এতকাল থেকে হাড়গিলে পাখিরা এই চর দখল করে আছে যে, ক্রমে চরটার নামই হয়ে গেছে হাড়গিলের চর। এই চরের ওপারেই দেওয়ানগিরি মস্ত একটা বুড়ো আঙুলের মতো আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। এই দেওয়ান-গিরি হল যত ফরিয়াদি পাখির আড্ডা। একপারে রইল আসামী মাছেদের রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি আর একপারে দেওয়ানী ফরিয়াদীর আড্ডা দেওয়ানগিরি, মাঝখানে বসে রয়েছেন হাড়গিলে। আসামী ফরিয়াদি লড়াই মোকদ্দমা প্রায়ই হয়, তাতে দুই দলই মাঝে-মাঝে মারা পড়ে।

হাড়গিলের খাম্বাজং রাজা দুই দলের মধ্যে আরামে বসে দুই দলেরই হাড়-মাস খেয়ে সুখে আছেন; এমন সময় চর মুখে খবর পৌঁছল বুড়ো-আংলা আসছেন। হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের ধারে তাঁর কাশবাগিচায় বেরিয়ে বেড়াচ্ছেন। "চুপিম-পা" আর "চোরম-পা" দুই সেনাপতি পায়ে পায়ে হাড়গিলের রাজার কাছে হুকুম নিতে এল—রিদয় হংপালকে এ-পথে আসতে দেওয়া হবে কিনা! খাম্বাজং হাড়গিলে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচিয়ে ভেবে বললেন—"আসতে দিতে পার।" হঠাৎ দেশের মধ্যে মানুষ আসতে দিতে হাড়গিলে-চরের প্রজারা রাজী ছিল না। দুই সেনাপতি একটু ইতস্তত করছে দেখে খাম্বাজং সভাপণ্ডিত চুহুংমুংকে ডেকে বললেন—"দেখ তো বুরুঞ্জি পুঁথিতে কলির কত হাজার বছরে এখানে মানুষের আগমণ লিখেছে?"

চুহুংমু মুখ গম্ভীর করে বুরুঞ্জির পাতা উলটে-পালটে মাটিতে খানিক আঁক-জোঁক কেটে বললেন—"আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপভ্রষ্ট একজন উপস্থিত হবেন, বারো বৎসর এগারো দিন এক-দণ্ড তিনপল ঊনপঞ্চাশ বিপল বয়সে, বুরুঞ্জতে লেখে—সুন্দরবনস্থ আমতলি গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এই মহাপুরুষ তার আগমনে দেশের সুখসৌভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গ মুষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতির প্রচুর ভোগ ঐশ্বর্য এবং সর্ব-সিদ্ধি যোগ। গণেশ চতুর্থীতে এই কলির বামন অবতার হংসরথে গৃহত্যাগ করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে ঊনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্পাব্দ ঊনশত ঊনপঞ্চাশের সুর্যাস্তের দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ট বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ" বলে চুহুংমং বুরুঞ্জি বন্ধ করলেন।

সেইদিন থেকে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং ভাঙাচোরা পুরোনো নাটবাড়ির চুড়োয় গিয়ে

একপায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে ঘাড় তুলে রইলেন—হংপাল কখন আসেন দেখতে, ওদিকে কাকচিরাতে কাকেদের রাজা যোম কাকের কাছে চাঁদপুরী শেয়াল খবর দিয়ে গেল—টিকটিকির মতো এক মানুষ এসে ভেড়াদের বিদ্রোহী করে তুলে হেঁড়েল বংশ ধ্বংস করলে, এবারে কাকেদের আর এঁটো-কাঁটা হাড়গোড় কিছু পাবার উপায় থাকবে না। মাংসখোর সব মারা গেল, কেইবা আর ভেড়া মারবে, ছাগল ধরবে। কাকচিরাতে কাকের ঘোঁট বসে গেল, কি করলে মানুষটাকে সরানো যায় দেশ থেকে, আর ভেড়া গরু ছাগল এদের আরো বেশি করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়—যাতে কোনো দিন তারা ফেরুপাল বা সনাতন স্বধর্মের ভুঁড়ো-শেয়ালদের বিরুদ্ধে শিং চালাতে না পারে।

নদী মাঠ আর জঙ্গল এই তেমাথার মধ্যে রয়েছে কাকচিরার না-জঙ্গল না-মাঠ, না-পাহাড়, না-বালুচর—দুরে থেকে দেখলে বোধ হবে জমিটাতে ঘাসও যেমন গাছও তেমন, পাহাড়ও রয়েছে, নদীও বইছে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ কেবল চোরকাঁটা শেওড়া আর বড়-বড় নোড়ানুড়ি, কাঁকর, বালি। আর তার মধ্যে এখানে-ওখানে কাদাজল নালা নর্দমা!

কোনকালে ফেনচুগঞ্জের এক নীলকর সাহেব এখানে এক মস্ত কুঠি বানিয়েছিল। সেই বাংলা-ঘরখানা এখনো রয়েছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই। কুঠিবাড়ির বাগানে চোরকাঁটার সঙ্গে গোটাকতক দোপাটি ফুলের গাছ, ঘরের সমস্ত সার্সি দরজা বন্ধ, জিনিসপত্র যেখানকার সেখানে গোছানো অথচ কেউ নেই এখানে। দরজায় চাবি দিয়ে বাড়িওয়ালা যেন দু-দিনের মধ্যে আসবে বলে গেল, যেখানে সার্সিটা ভাঙা ছিল সেখানে কাগজ মেরে ঘরগুলি গুছিয়ে রেখে চোরের ভয়ে তালাবন্ধ করে সব ঠিকঠাক রেখে গেল, কিন্তু কোনোদিন এসে আর চাবি খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। বর্ষা এসে সার্সির ফাঁকে আঁটা পুরোনো খবরের কাগজটা গলিয়ে দিলে, কাক-চিরার একটা কাক কোন সময়ে একদিন ঠোঁটে করে সেই কাগজখানা ঠেলে ফেলে ঘরের ভিতরে যাবার আসবার একটা পথ করে রেখে দিলে। তারপর একদিন বোশেখ মাসে ডিম পাড়বার সময় দলে-দলে কাক এসে কাকচিরায় চিরকাল যেমন বাসা বেঁধে আসছে তেমনি ঘরকন্না পেতে জায়গাটা দখল করে বসল। সকাল না হতে দূর-দূর গ্রামে তারা চরতে যায়, এঁটো-কাটার সন্ধানে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দলে-দলে এই আপন রাজত্বে তারা ফিরে আসে, রাঙা আকাশ কালো করে।

আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালি যুগি কায়েত বামুন এমনি নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায় মানুষ, তেমনি কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে—যেমন ডোমকাক বা যোমকাক, ধাড়িকাক বা দাঁড়াকাক বা দাঁড়কাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, ঢোঁড়াকাক, পাণিকাক বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বাব ছিটেকাক, ভুষোকাক বা ভুষুণ্ডেকাক! সব কাকেরই চালচলন এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনো দল তারা ভদ্দর সভ্য-ভব্য কাক, ছোলাকলা চিংড়িমাছটা আঁসটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়, আর একদল কাক তারা যা তা খায় বাচবিচার নেই, পাখিরছানা খরগোসের ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোনো দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরিচামারি খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরের কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই! আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথায় ঠোকর বসায়, চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় ছোঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে

বেড়ানোই এদের কাজ।

কাকেদের ডাক নাম শুনলেই বোঝা যায় কোন দল কেমন—যেমন যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদের সবাই ভয় করে। মরা জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি মারামারি এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক—এরা পুরোনো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে-বসিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরীতে মজবুদ বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদের পরামর্শ মতো চলে। তারপর, ঝোড়োকাক—এরা এককালে সব চেয়ে সাহসী বড়ই নামজাদা রাজবংশ ছিল, এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়াকাক হয়ে পড়েছে কাজেই চুপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পাণিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু কোনো দলেই এদের পোঁছে না, পুকুর পাড়ে এরা গুগলি শামুক এঁটো-কাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক—এরা আসলে দিশি কালো কাকেরই বংশ কিন্তু রঙ বদলে শাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে—এদের কারু গলা শাদা, কারু ডানা শাদা, কারু মাথা শাদা, এখনো দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে। পৃথিবীর আদিকাক হল ভুষুণ্ডিকাক, তারি বংশ ভুষুণ্ডে বা ভুষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই কাকের বংশ চলে আসছে—এদেরই পূর্বপুরুষ রামের সঙ্গে লড়াইয়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বোঝাতে চাইছে এদেরই একজন, আসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব ভুষুণ্ডি। এই সব নানা ধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাক সমাজকে সে নিজের মতো ভালো-মন্দ নরম-গরম ভাবে চলায়, এই হল সমাজের নিয়ম।

যে কাকটা নীলকর ঃ হবের ঘরের সার্সিতে মস্ত ফাঁকটা আবিষ্কার করেছিল, সে বহুকালের পুরোনো রাজবংশী ঢোঁড়াকাক। যতদিন এই ঢোঁড়াকাক দলপতি ছিল ততদিন কাক সমাজ ভদ্ররকম ছিল, কোনো পাখিই তাদের কোনো দোষ কোনো খুঁত ধরতে পারেনি। কিন্তু কাক সমাজে ক্রমে প্রজা বৃদ্ধি হয়ে নানারকম কাক তাতে এসে যখন সেঁধোল তখন চাল-চোলও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করলে। শেষে একদিন সবাই মিলে ঢোঁড়াকাককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ডোমকাককে সর্দার করে এমন লুটতরাজ মারামারি আরম্ভ করে দিলে যে, পায়রা, সিকরে, গেরোবাজ এমন কি পেঁচারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে কাকচিরে ছেড়ে পালাতে পথ পেলে না।

পুরোনো দলপতি ধোড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়াগাছের ডালে দিন কাটায়, কেউ তাকে কোনো কথা শুধোয় না, সবাই মিলে বলতে লাগল ওটা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে, বুড়ো হয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরা-কাক, দেশের লোক তাকে বললে ঢোঁড়াকাক। একেবারে কাজের বার ভেবে সবাই তাকে তুচ্ছ করছে দেখে ঢোঁড়াকাক মনে-মনে একটুখানি হেসে আপনার কোণটিতে চুপচাপ রইল। নতুন রাজা ডোম জাঁক দেখাবার জন্যে প্রায়ই ঢোঁড়াকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ দিত। কোনো দিন বা নিজের বীরত্ব আর বাহাদুরি দেখাতে শিকারের সময় প্রায়ই সঙ্গে নিত। ঢোঁড়া সব বুঝত কিন্তু বুঝেও বোবা হয়ে থাকত।

ফেনচুগঞ্জের নীলকর সাহেব যদিও অনেক কাল হল কুঠিবাড়ি ছেড়ে গেছে, কিন্তু

এখনও কোনো কাকের এমন সাহস হয় না যে সেদিকে যায়, কিন্তু ডরাকাক বলে ডোমকাকের দল যাকে তুচ্ছ করছে সেই কাকটি গিয়ে একদিন কুঠিবাড়ির মধ্যে যাবার একটি রাস্তা করে এল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একলা গিয়ে, কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানায়নি! একে মানুষ তাতে গোরা, তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার চেয়েও অসমসাহসের কাজ, কোনো কাক এ পর্যন্ত যা পারেনি ডোড়া সেই কাজটা করেছে—অথচ মুখে তার কথাটি নেই, অন্য কাক হলে চীৎকারের চোটে কাকচিরে মাত করত। নতুন দলপতি ডোমকাকটা দিনের বেলায় এই বুকে পাটকিলে ডোরা-টানা ধোড়াকাককে ভয় করে খাতির করে চলত, ধোড়ার বুকের লাল-ডোরা দেখে তার মনে হত যেন কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এখনো এর বুকে দাগা রয়েছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যখন লাল-কালো সব এক হয়ে গেছে তখন ডোমকাক ধোড়াকে জ্বালাতন করতে ছাড়ত না—একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সেইদিন থেকে ধোড়া বা ঢোঁড়াকাক শেওড়া গাছে আর ঘুমোতে যেত না, সেই সার্সি দিয়ে চুপিচুপি ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বেলা আড়াইটা বেজে বন্ধ হওয়া একটি ঘড়ির পিছনে বসে রাত কাটাতে আরম্ভ করলে।

রিদয় যে ঝড়ে পড়ে যোগী-গোফায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঝড়ে কাকচিরার বহুকালের পুরোনো শেওড়া গাছটা গোড়া সুদ্ধু উপড়ে রাজ্যের ডোমকাকের বাসা ডিম ছানা-পোনা নিয়ে উল্টে পড়ল ঠিক বেলা আড়াইটাতে। বাসা গেল, ডিম ভাঙল, তাতে কাগেদের বড় একটা দুঃখ হল না, কিন্তু গাছের গোড়াটা যেখানে উল্টে পড়ে বড় একটা গর্ত দেখা দিয়েছে, সেই গর্তটায় কি আছে না আছে খুঁজে দেখবার জন্যে দলে-দলে কাক আকাশের দিকে পা-করা গাছের মোটা-মোটা শিকড়গুলো নিয়ে টানাটানি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক, ঢোঁড়াকাক পাতিকাক দুজনকে নিয়ে একেবারে ডোবাটার মধ্যে উড়ে পড়ে এদিক-ওদিক তদারক করে ইট পাটকেল উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। হঠাৎ এত বড় গর্তটা কেন এখানে আছে, ঠোকর দিয়ে সন্ধান করতে-করতে গর্তের একদিকে খানিক কাঁকর-মাটি ঝরঝর করে খসে পড়ল, আর দেখা গেল, ইঁটে-গাঁথা একটা চোর-কুঠুরী, তার মধ্যে তালা দেওয়া ছোট একটা পেঁটরার সামনে একটা মড়ার মাথা, কতকালের কলঙ্ক ধরা একটা পিদুম আর গোখরো সাপের একটা খোলস। মড়ার মাথা সাপের খোলস দুটোই সব কাকের দেখা ছিল, পিদুম নিয়েও অনেকবার তারা পালিয়েছে, কিন্তু পেঁটরাটার মধ্যে কি আছে কোনো কাকই তা জানে না, কাজেই এদিকে-ওদিকে ঠোকর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে এমন সময় গর্তের উপর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে এমন সময় গর্তের উপর থেকে খেঁকশেয়াল আস্তে-আস্তে বললে—"হচ্ছে কি? ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া কর না, ওতে সাত রাজার ধন আছে: যদি খুলতে চাও তো একজন যক্ ধরে আনো, যকের ধন যক্ না হলে কেউ খুলতে পারবে না।"

সাত রাজার ধন আছে শুনে কাকদের চক্ষু স্থির! চকচকে পয়সা মোহর ভালোবাসতে তাদের মতো দুটো নেই, ডেমকাক পাতিকাক ভুষোকাক ছিটেকাক দাঁড়কাক সব কাক এসে শেয়ালকে ঘিরে —ক্যা-ক্যা-ক্যা কও-কও-কও রব করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে শেয়ালকে শুধোলে—"যক এখন কেমন করে পাওয়া যায়?"

শেয়াল ডাঁওর করে মাথা চুলকে নাক রগড়ে যেন কতই ভেবে বললে—"আমি জানি

এক যকের সন্ধান, সে ছুঁলেই এই বাক্স খুলে যাবে।"

কাকেরা অমনি চীৎকার করে উঠল—"কই-কই"—বলে এগিয়ে গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোমকাক তাড়াতাড়ি পেঁটরার উপরে চেপে বললে—"রও-রও"।

তারপর শেয়াল এগিয়ে এসে বললে—'আমি সেই যকের সন্ধান তোমাদের দিতে পারি, যদি তোমরা এই সিন্দুক খুলিয়ে নিয়ে যক্‌টিকে আমার পেট ভরাবার জন্যে দিতে রাজী হও।'

কাকেরা শেয়ালের কথায় রাজী হলে শেয়াল তাদের রিদয়ের খবর জানিয়ে দিলে। তিনকুড়ি কাক সঙ্গে ডোমরাজা ঢোঁড়াকাককে সঙ্গে নিয়ে যক্ ধরতে চলল পাহাড়-জঙ্গলের উপর দিয়ে।

হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং যখন চৌষট্টিখানা নাটবাড়ির নহবতখানার চুড়োয় পশ্চিমমুখো হয়ে রিদয়ের আশায় রয়েছেন, আর কাকদের রাজা ডোম রিদয়কে ধরবার জন্যে বনে-জঙ্গলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় গণেশের নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে পাহাড়ি চুয়োদের যুদ্ধ বেধে গেল। ব্রহ্মপুত্র আর বড়নদী মোহনার পুরোনো নাটবাড়িটা ইঁদুরদের দখলে, কতকাল থেকে আছে তার ঠিকানা নেই। দেওয়ানগিরির উপরের কেল্লার মতো আড়িমাও রাজাদের নাটবাড়ি, প্রকাণ্ড কারখানা, এত বড় নাটবাড়ি যে সেখানে রাজাদের আমলে যে-সব হাতি ঘোড়া সেপাই শান্ত্রী থাকত সেগুলোকে দূর থেকে মনে হত যেন ছোট পুতুল চলে বেড়াচ্ছে। দশ-বারো হাত চাওড়া এক-একখানা পাথরের ইঁটে-গাঁথা বাড়ির দেওয়ালগুলো, এক-একটা থাম যেন এক-একটা তালগাছ। সাততলা বাড়ি কিন্তু তার নিচের পাঁচতলা নিরেট দেওয়ালে ভরাট করা, তার মাঝে পাহাড়ের গহ্বরের মতো অন্ধকার একটা সিংগি দরজা, আশে-পাশে বাক্‌সের মতো চোরকুঠুরী। সেগুলোতে দেওয়ালই সব, থাকবার জায়গা অল্পই, তাও আবার এখানে-ওখানে লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, কত কালের অস্তর-শস্ত্র, রাজাদের আসবাব-পত্র, চাল-ডাল, ঘি-ময়দা, ধন-দৌলত দিয়ে ঠাসা। যেমন সোঁতা তেমনি অন্ধকার, সে-সব ঘরে একবার ঢুকলে রাস্তা হারিয়ে চিরকাল গোলকধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, আর বাইরে আসবার উপায় নেই, এমনি প্যাঁচাও রকমে সে-সব ঘর সাজানো। ছ-তলার উপরে রাজসভা, সেখানে কতকটা আলো-বাতাস আসবার জন্যে সারি-সারি জানলা-বারাণ্ডা, সাততলায় অন্দর মহল, সেখানে জানলা সব খাঁচার মতো পাথরের জাল দিয়ে বন্ধ, পোষা-পাখির মতো রানীদের ধরে রাখার জন্যে ছোট-ছোট কুলুঙ্গি দেওয়া দরজায় শিকল-আঁটা সব শয়ন-মন্দির।

অন্ধকূপ এই নাটবাড়িতে আড়িমাও রাজাদের বংশ ভালো আলো-বাতাস না পেয়ে গুষ্ঠিসুদ্ধ লোকলস্কর সমেত অল্পদিনের মধ্যেই মরে ভূত হয়ে গেল, রইল কেবল বাড়ির চুড়োয় মস্ত একটা পাথরের আল্‌সের উপরে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে এক ঠেঙে—সে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং। রানীর শয়ন-ঘরের কুলুঙ্গিগুলোতে গোটাকতক লক্ষ্মী-পেঁচা কালো-পেঁচা, ভুতুম-পেঁচা, রাজসভার কার্নিশে-কার্নিশে ঝুলে দলে-দলে বাদুড়, রন্ধনশালায় একটা কালো বেরাল, আর ঘি-ময়দা চাল-ডাল শাল-দোশালা ধন-দৌলতে ঠাসা নিচেকার ভাঁড়ার ঘরগুলোতে গড়বন্দি পালে-পালে গণেশের নেংটি ইঁদুর। হাড়গিলে পেঁচা বেরাল এরা সবাই ইঁদুরের শত্রু হলেও গণেশের ইঁদুরকে তারা খাতির করে চলত, পৃথিবীর যেখানে যত গণেশ আছে, সবার জন্যে এই নাটবাড়ি থেকে ইঁদুর যায়, এদের কেউ কিছু বলবার যো নেই, কাজেই নেংটি ইঁদুরের দল দেশ জুড়ে নানা উৎপাত আর রাজত্ব করছিল, এই সময় কোথা থেকে

তাতারি-চুয়ো এসে হানা দিয়ে, যেখানে-সেখানে গণেশ উল্টে, ফেলে নেংটি বংশ ধ্বংস করতে শুরু করে দিলে।

গোলাবাড়ি, ঠাকুর-বাড়ি, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কাচারিঘর, হেঁসেল-ঘর শোবারঘর, বসবারঘর, তোষখানা, বৈঠকখানা দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নেংটি সরে পড়তে লাগল, লড়াইয়ে হারতে থাকল, না খেয়ে মরতে লাগল; শেষে এমন হল যে, এক পুরোনো নাটবাড়ি ছাড়া গণেশের ইঁদুর আর কোথাও রইল না। গণেশের সিংহাসন টলমল করতে থাকল, মানুষে নেংটি ইঁদুর মারত বটে, কিন্তু গণেশ তাতে টলেননি কেন না এত ইঁদুর বাইরে-বাইরে জন্মাত যে মানুষ জন্ম-জন্ম মেরেও তাদের বংশ লোপ করতে পারত না। কিন্তু নেংটিরই বড় জাত যে চুয়ো, তারা যখন এসে হানা দিয়ে পড়ল, তখন গণেশ ভেবে অস্থির হলেন।

এই চুয়োরা একেবারে চোয়াড়, যা-তা খায়, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি মোটেই নেই, একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ, দুটি-একটি করে, যেন ভালোমানুষের মতো, প্রথমে নদী-নালার ধারে-ধারে নৌকোর খোলে এসে বাসা বাঁধলে, দেবতার মন্দিরে কিংবা মানুষের ভাঙা ঘরের উপরে গ্রাম-নগরের দিকেই ঘেঁষতো না—নেংটি ইঁদুরগুলোর যে সব পোড়ো-বাড়ি, পতিত জমি ছেড়ে গেছে সেই জায়গাগুলোয় এসে রইল, নেংটিদের ফেলে-দেওয়া যা কিছু কুড়িয়ে খেয়ে বড় হতে লাগল। ক্রমে তারা বড় হতে হতে শেষে নেংটিদের মাটির কেল্লাগুলো দখল করে জমিদারী ফাঁদলে, সেখান থেকে এ-জমিদারী, সে-জমিদারী, এ-পরগণা সে-পরগণা, এদেশ-সেদেশ, করে সারা দেশ তারা দখল করলে। মাটির নিচেটা দখল করে মাটির উপরে চুয়োর দল লড়াই দিতে যখন বার হল, তখন নেংটিরা বুঝলে দাঁড়াবার স্থান গেছে, নিরুপায় হয়ে তারা যে ক'টা পারে তাদের পুরোনো নাটবাড়ির কেল্লায় এসে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। নাট-বাড়ির দেওয়াল মোটা, কাজেই নেংটিরা কতকটা নির্ভয়ে রইল, কিন্তু চুয়োরাও ছাড়বার পাত্র নয়? তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে একদিন নাটবাড়ির উঠোনটা দখল করতে বারোজন তাতারি সওয়ার পাঠিয়ে দিলে। যুদ্ধং দেহি বলে শত্রুদল চারদিক ঘিরে লেজ আপসে লাফালাফি সুরু করে দিয়েছে, চারদিকে সাজ রে সাজ রব পড়ে গেছে—

পায় দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল তাতরি।
দামিনি তক-তক জামকী ধক-ধক
ঝকমক চমকত খরতর বারি।
ধৃধৃ ধৃধৃধৃ নৌবত বাজে,
ঘন ভোরঙ্গ ভম-ভম, দামমা দদদম্‌
ঝনন্ন ঝম-ঝম ঝাঁজে—
ধা—ধা গুড়-গুড় বাজে।
নিশান ফরফর নিনাদ ধর-ধর
তাতারি গর-গর গাজে।
ধৃধৃ ধম-ধম ঝাঁ-ঝাঁ ঝম ঝম

দামামা দম-দম বাজে।
রণজয় ভেরী বাজে রে ঝাঁগড়-ঝাঁগড় ঝাঁ-ঝা ঝাঁজে রে
মুচকিয়া গোঁফে চলে লাফে-লাফে
খেলে উড়ো পাকে থাকে-থাকে-থাকে ঝাঁপে রে
বাজে রণ ভেরী বাজে রে।
ভয় পেয়ে মরে নেংটি হাজার-হাজার
তল গেল মানমত্তা ইঁদুর রাজার
ঘাসের বোঝায় বসি ইন্দুরানী কাঁদে
ইন্দুরায় এতদিনে পড়িয়াছে ফাঁদে
কান্দি কহে ইন্দুরানী গণেশ গোঁসাই
এমন বিপাকে কভু আর ঠেকি নাই।

এইভাবে ইঁদুর রানী কাঁদছেন, এদিকে একশো বছরের ইঁদুরের রাজা তাতারিদের ভয়ে থরথরি কম্পমান, রানীর আঁচল ধরে মন্ত্র পড়ছেন, খট ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালি—আর কেঁদে বলছেন সুর করে;

চল-চল যাই নীলাচলে। (রে অরে যাই)
ঘটালে বিধি ভাগ্যফলে।
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ।
দেখি অক্ষয় বটতলে,
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচি বেড়াই কুতুহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি।
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।

নেংটির রাজা যখন কেল্লা ছেড়ে রানীকে নিয়ে পাছ-দুয়োর দিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে পলায়নের মতলব করছেন—লড়াই না দিয়ে, সেই সময় হাঁসের দল বিদয়কে নিয়ে দেওয়ানগিরির তলায় এসে উড়ে বসল। একদিকে নাটবাড়ির পাথরের পাঁচিল, আর একদিকে হাড়গিলের চর, এরি মাঝে জলের ধারে শুশনি কলমি শাক খেয়ে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আণ্ডামানি হাঁসের সঙ্গে দেখা, ছোট দল বড় দল দুই দলে অমনি কথাবার্তা চলল, সাঁতার খেলা আরম্ভ হল।

যোগীগোফাতে ভেড়াদের নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছে শুনে আণ্ডামানি বললে—"তা হলে শেয়াল লোভ সহজে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে, আর এখন দুদিন উড়ে কাজ নেই, এইখানেই থাকা যাক, আর ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ধরে মানস সাগরেও গিয়ে কাজ নেই। এইখান থেকে বাঁহাতি মোড় নিয়ে একেবারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলাই ভালো।"

চকা বললে—"অজানা রাস্তা কেমন করে যাব।"

আণ্ডামানি অমনি জবাব দিলে—"অজানা নয়, উত্তর সমুদ্রের ধারে রুশ দেশে যে

সব পাখিরা থাকে তারা পাহাড়ের এই গলি পথটা দিয়ে সোজা হিমালয়ের ওপারে চলে যায়। আজ ক'দিন ধরে দলে-দলে সারস বুক কাদাখোঁচা জলপীপী এরা দেখি এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে।"

বুড়ো চকা ঘাড় নেড়ে বললে—"ওহে রাস্তা তো আছে জেনেছ, রাস্তার কোথায়, কেমন দানাপানির ব্যবস্থা তার খবর নিয়েছ কি?"

আণ্ডামানি লালসেরা মাথা নেড়ে বললে—"সে খবরও নিতে বাকি রাখিনি। এই দেওয়ানগিরি থেকে বড়নদীর রাস্তা বেয়ে সোজা উত্তরে গেলে তাসগং তাউয়াং দুটো বড়-বড় বস্তি তার পরই চুথাং-এর জলা। সেখানে এক রাত্তি কাটিয়ে তার পরদিন সন্ধ্যায় চোনা হ্রদ পাওয়া যাবে, তারপর একদিনে নারায়ুম হ্রদ, সেখান থেকে একবেলার পথ, তিগুৎসো।' সেখান থেকে পশ্চিমে গেলে পেমো চাং বাসাং সো, চোলু, খাম্বাজং গোঁসাইথান হয়ে ধবলাগিরি, আর উত্তর-পুবে গেলে যমদক্ষা নগরের ধরে প্রকাণ্ড পালতি হ্রদ তার পরে তামলং কঙ্কজং হয়ে আবার ব্রহ্মপুত্রের রাস্তায় পড়া যেতে পারে, অনেক পাখিই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেথোর অভাব হবে না। তাছাড়া কঙ্কজং-এর রাজা কঙ্ক-পাখির সঙ্গে যখন তোমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে, তখন সেখানেও কিছুদিন জিরিয়ে যাওয়া যেতে পারে।"

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—"সে সব ভালো, কিন্তু ওদিকের আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকছে, দেওয়ানগিরির উত্তর গা-টাতে মেঘের ছাওয়াটাও দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ ওদিকে যাওয়া নয়, দু-একদিন দেখা যাক।"

হাঁসদের মধ্যে এই সব পরামর্শ চলেছে এদিকে রিদয় একটা ডোবায় পা ডুবিয়ে আড়িমাও রাজার পুরোনো নাটবাড়িটার পাঁচিলের দিকে চেয়ে রয়েছে, এমন সময় দেখলে সন্ধ্যের অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে রাশ-রাশ নুড়িগুলো যেন নড়তে-চড়তে আরম্ভ করলে, তারপর সার বেঁধে সব নুড়িগুলো কেল্লার দিকে এগোতে লাগল। রিদয় চেঁচিয়ে উঠল—"দেখ-দেখ!" অমনি সব হাঁস সেদিকে চেয়ে দেখলে দলে-দলে চুয়া রাস্তা ঢেকে চলেছে।

রিদয় যখন বড় ছিল তখন একবার ইঁদুরের কামড় কেমন টের পেয়েছে, এখন এই বুড়ো-আংলা অবস্থায় ইঁদুরের পাল্লায় পড়লে যে কি হবে তাই ভেবে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাঁসেরাও রিদয়ের মতো ইঁদুরের গন্ধ মোটেই সইতে পারত না, যতক্ষণ সেদিক দিয়ে ইঁদুরগুলো গেল ততক্ষণ সবাই চুপচাপ মুখ বন্ধ করে রইল। তারপর 'ছি-ছি' বলে যেন কেবলি ডানা ঝাড়া দিতে শুরু করে দিলে।

চুয়োর দল ছোট-বড় নুড়ির ঝরনার মতো গড়াতে-গড়াতে পাথরের পাঁচিলের গোড়া বেয়ে নাটবাড়ির সিংগি দরজার দিকে চলে গেল, ঠিক সেই সময় আকাশে পা লটপট করতে-করতে হাড়গিলে-রাজ খাম্বাজং ঝুপ করে হাঁসদের মধ্যে এসে পড়লে। রিদয় এমনতরো পাখি কোনোদিন দেখেনি, এঁর মাথা, গলা আর পিঠ শাদা রাজহাঁসের মতো, ডানা দুখানা কালো দাঁড়কাকের মতো, তেলে পাকানো গেঁটে-বাঁশের ছড়ির মতো লাল দুখানা সরু ঠ্যাং, আর বারো-হাত কাঁকুড়ের তেরো-হাত বীচির মতো এতটুকু মাথায় এত বড় এক লম্বা ঠোঁট—এক আঙুল কলমের যেন দশ আঙুল নিব তার ভারে মাথাটা ঝুঁকেই আছে, মুখের দু-পাশে বোয়াল মাছের মতো দুটো চোখ বসানো! রিদয়ের বোধ হল, পাখি মাছ কাঁকুড় কলম বাঁশ সব মিলিয়ে যেন এই পক্ষীরাজ সৃষ্টি হয়েছে!

হাড়গিলেকে দেখে চকা তাড়াতাড়ি ডানার পালক ঝেড়েঝুড়ে সামনে এগিয়ে এসে

দণ্ডবৎ হয়ে দু-তিন বার প্রণাম করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল হঠাৎ খাম্বাজং কি কাজে এলেন। নাটবাড়ির চুড়োয় হাড়গিলের বাসা চকা জানে আর ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই হাড়গিলেদের আনবার পূর্বে খাম্বাজং বাসাটা একবার তদারক করতে প্রতি বছরে এখানে থাকেন সেটাও জানা কথা। কিন্তু হাড়গিলেরা তো হাঁসেদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-সালাপ রাখে না, হঠাৎ আজ হাঁসের দলে রাজার আগমন হল কেন, এটা চকা না ভেবে পেয়ে একবার ঘাড় চুলকে বললে—"জং বাহাদুরের বাসার খবর ভালো তো, গেল ঝড় বৃষ্টিতে কোনো লোকসান হয়নি তো?"

হাড়গিলেরা সবাই তোতলা, সহজে কথা কওয়া তাদের মুশকিল, খাম্বাজং অনেকক্ষণ ঠোঁট কাঁপিয়ে এ-চোখ বুজে ও-চোখ খুলে ভাঙা গলায় কাঁদুনি শুরু করলেন—"বুড়োবয়সে বাসাটা ঝড়ে পড়ে গেছে, একে উঁচু নাটবাড়ি, তার আবার চুড়ো, গিন্নী দেখে-দেখে সেখানেই বাসা বাঁধলেন, টিকবে কেন? এই বুড়ো বয়সে জল-ঝড়ের মধ্যে ওই গোটা কতক ভাঙা কাঠির বাসায় তো আমার টেকা দায় হয়েছে। এদিকে আবার মানুষগুলো সমস্ত জলা আর খাল-বিল ভরাট করে তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত করচে, দু—একটা সাপ ব্যাঙ যে ধরে খাব তারও রাস্তা বন্ধ! শুনেছি নাকি আবার এই নাটবাড়িটাতে ইস্টিশান বসাবে, তাহলে তো আমাকে এদেশ ছাড়তে হয় দেখি!"

চকা খুব দুঃখ জানিয়ে বললে—"আপনি তো তবু এতকাল এই নাটবাড়িতেই কাটালেন, ইচ্ছে করলে পরেও আপনি ইস্টিশানের চুড়োটায় বাসা বাঁধতে পারেন। মানুষে কোনোদিন আপনার উপরে গুলিও চালাবে না। আর বাসা থেকে আপনার আণ্ডাবাচ্চা চুরি করে ভেজেও খাবে না, আপনার তো কোনো পরোয়া নেই। বড় জোর এখন চুড়োয় আছেন, না হয় চরে নেমে বসবেন; কিন্তু আমাদের দশা দেখুন দেখি—

ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে
মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!

এই ভাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে। আপনার তো যাহোক একটা দাঁড়াবার স্থান আছে, আমাদের দশাটা ভাবুন তো। ভবঘুরের মতো—

যেখানে-সেখানে শোও আর খাও
পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও
শেষে একদিন অকস্মাৎ!
বিনা মেঘে বজ্রঘাৎ।

"তাগে পেলেই মানুষ গুলি চালাচ্ছে আমাদের দিকে!"

হাড়গিলে গলার পালকের দাড়ি দুলিয়ে বললেন—"কথাটি তো বলেছ ঠিক, কিন্তু নাটবাড়ি হয়ে পর্যন্ত ঐ চুড়োটায় বাস করে আসছি সাতপুরুষ ধরে, আজ হঠাৎ চুড়ো থেকে চরে নেমে বসা কি কম কষ্টের কথা, আর ঐ হাড়গিলের চরটাও শুনেছি মানুষেরা চেঁচে ফেলে ওখান দিয়ে বড়-বড় মালের জাহাজ চালাবে!'

চকা এবারে আমতা-আমতা করে বলল—"তা হলে তো মুশকিল দেখছি, মানুষের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, এবিষয়ে আপনি—"

এবারে হাড়গিলে ঠোঁট বাজিয়ে বলে উঠলেন—"আঃ, সে মানুষের কথা, যখন তারা আসবে তখন ভাবা যাবে। এখন একটা কথা শুধোই, এদিক দিয়ে চুয়োদের পল্টন যেতে দেখেছ কি?" হাজার হাজার চুয়ো এই মাত্র এইদিক দিয়ে গেছে শুনে হাড়গিলে আকাশে চোখ তুলে বললেন,—এতদিনে বুঝি গণেশের ইঁদুরের দফা রফা, আজ রাতের মধ্যেই চুয়েরা নাটবাড়ি দখল করবে।"

চকা ভয় পেয়ে বললে—"কি বলেন লড়াই বাধবে নাকি?"

হাড়গিলে বলে উঠলেন—"বাধবে আর কি, বিনা যুদ্ধে চুয়োরা আজ কেল্লা মেরে নেবে, রাজা গঙ্গাসাগরের দিকে রানীকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর, কেল্লায় যারা ছিল তারা মানস-সরোবরের ধারে আসছে পূর্ণিমায় পক্ষিরদলের বারোয়ারীর নাচ দেখতে ছুটেছে, ঠিক ঝোপ বুঝেই চুয়োর দল কোপ দিতে চলেছে। কেল্লায় গোটাকতক অর্কমণ্য বুড়ো নেংটি ছাড়া আর তো কেউ নেই, এতকাল নেংটিদের সঙ্গে এই নাটবাড়িতে কাটালেম, এখন বুড়ো বয়সে আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়ার মতো চুয়োর দলে ভিড়তে আমার ইচ্ছে যায় না, তাই ভাবচি থাকি কি যাই।'

হাড়গিলে যে ইঁদুরের বিপদের খবরটা না দিয়ে হাঁসের দলে এসে কাঁদুনী শুরু করেছে এটা চকার মোটে ভালো লাগল না। সে একটু এগিয়ে গিয়ে হাড়গিলেকে বললে—"গণেশের ইঁদুরের আপনি ও-খবরটা পাঠাননি এখনো?"

হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে বললে—"খবর দিয়ে লাভ? তারা আসবার আগেই সে কেল্লা দখল হয়ে যাবে।"

চকা এবারে চটে বললে—"হয়ে যাবে বললেই হয়ে গেল, এমন অঘটন হতে দেব না আমি বলছি।"

যে চকার ঠোঁট একেবারে ভোঁতা নেই বললেই হয়, আর যার পায়ের নখও ততোধিক ধারাল, সন্ধ্যে না হতেই যার ঘুম আসে, তিনি লড়তে চান চিরুনিদাঁত চুয়োদের সঙ্গে! হাড়গিলে হেসেই অস্থির! ঘাড় নেড়ে চকাকে বললেন—"বুরুঞ্জিতে লেখা আছে এই ঘটবে, কারো সাধ্য নেই তা রোধ করা, আমি পণ্ডিতদের গিয়ে গণিয়ে দেখেছি কোনো উপায় নেই, না হলে আমি চুপ করে বসে আছি!"

চকা হাড়গিলের কথায় কান না দিয়ে ডাক দিলে—"পাঁপড়া নানকৌড়ি নোড়োল কাটচাল লালসেরা আণ্ডামানি, চোখ-ধলা ডানকানি, পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারাগুই চাপড়া তীরগুলি আকায়ব, তোমরা যাও মানস-সরোবরের পথে যত নেংটি দেখবে সবাইকে খবর দাও লড়াই বাধবে।" অমনি সাতটা বুনো-হাঁস অন্ধকারে ডানা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল। চকা আবার বাঙলাদেশের হাঁসদের ডাক দিলে "সনদ্বীপের বাঙাল, ধন-মাণিকের কাওয়াজী রায়মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগণার সরাল।" অমনি তেল চুকচুকে মোটাপেট পাঁচজন উপস্থির হল হেলতে-দুলতে চকা তাদের বললে—"চট করে যাও গঙ্গাসাগরের দিকে, নেংটিদের রাজা পলাতক ইন্দুরায় আর ইন্দুরাণীকে ফিরিয়ে আনো!' কিন্তু এবারের দল অত চটপট উড়ে পড়ল না, বাঙাল মাথা চুলকে বললে—"এ-কাজটা কি সমীচীন হবে, ইঁদুরের যুদ্ধে হাঁসেদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া কি সঙ্গত, তা ছাড়া এই অন্ধকার রাত্রে আপনাকে একলা

এই শত্রুদের মাঝে—'

চকা ধমকে উঠল: "বড় দেরি করছ তোমরা!" বাঙলার হাঁসরা পটাস-পটাস করে ডানা ঝাপটে দক্ষিণ মুখে আস্তে আস্তে উড়ে চলল।

চকা তাদের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে থেকে সুবচনীর হাঁসকে বললে—"তুমি গিয়ে হাড়গিলে চরে চুপচাপ বসে থাক, আমি কেবল হংপাল বুড়ো-আংলাকে পিঠে নিয়ে নাটবাড়িতে যাব, যদি কেউ চুয়োদের তাড়াতে পারে তো এই ছোকরা।" বলে চকা হাড়গিলের সঙ্গে রিদয়ের আলাপ করে দিলে।

টিকটিকির মতো বুড়ো-আংলাকে দেখে হাড়গিলে একবার গলার থলি ফুলিয়ে খানিক হেলে-দুলে হেসে নিলে। তারপরে ঝপ করে ঠোঁটে করে রিদয়কে আকাশে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে লোফালুফি শুরু করে দিলেন, রিদয় ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। চকা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে—"জং বাহাদুর করেন কি! ওটা মানুষ—ব্যাঙ নয়, ওকে ছাড়ুন, গেল যে!"

"মানুষ!" বলেই হাড়গিলে মাটিতে রিদয়কে নামিয়ে দিয়ে দু-চারবার ডানা আপসে নৃত্য করে বললেন—"বুরুঞ্জিতে ঠিক তো লিখেছে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এই মহাপুরুষ এসেছেন ঠিক ভূত চর্তুদশীতেই, আর ভয় নেই, আমি এখন গিয়ে নাটবাড়ির সকলকে এ খবর দিচ্ছি। জয় গণেশের জয়"—বলে হাড়গিলে নাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল।

হাড়গিলের ব্যবহারে রিদয় ভারি চটে ছিল, সে গোঁ হয়ে চকার পিঠে উঠে বসল। নাটবাড়ির চুড়োয় একখানা যাঁতার মতো পাথর, তার মাঝখানটায় রাজাদের ধ্বজি গড়বার একটা গর্ত সেই গর্তে খান দুই পুরোনো রাজাদের ধ্বজি গাড়বার একটা গর্ত, সেই গর্তে খান দুই পুরোনো হোগলা-পাতার মাদুর বিছানো, তার উপরে কাঠকুটো আর পালকের তোশক, একপাশে কোন কালের রানীদের ছেঁড়া কাপড়ের এক টুকরো জরির আঁচল মাদুর-ছেঁড়ার মধ্যে ঝিকমিক করছে, কতকালের মরচে ধরা একটা খিল-ভাঙা তালা, একটা কলঙ্ক পড়া রুপোর চুষিকাঠি, ভোঁতা একটা শরের কলম, ছেঁড়া একপাটি জরির লপেটা জুতো, আধখানা পরকলা লাগানো শিং-এর চশমা একটা, গেল বছরের ফাটা চিনের পেয়ালার মতো গোটাকতক ডিমের খোলা, পেটটা ফুটো-করা একটা আধমরা ব্যাঙ, এমনি সব নানা সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে বাসাটা ভর্তি। কতকালের যে বাসা তার ঠিক নেই তার গায়ে ছোট বড় ঘাস পাতা গজিয়ে গেছে, এমন কি গোটাবারো লতাওয়ালা একটা বটগাছ পর্যন্ত, তাতে আবার ফল ধরছে।

চকার সঙ্গে রিদয় এসে দেখলে নাটবাড়ির সবাই এসে আজ বাসায় হাড়গিলেকে ঘিরে কি সব পরামর্শ করছে, বুড়ো ভুতুম পেঁচা একদিকে বসে গোল দুই চোখ বার করে কেবলি হুঁ-হুঁ সায় দিচ্ছে, কালো বেরালটা লেজ নাড়ছে আর মিউমিউ করে কি যে বকছে তার ঠিক নেই, হাড়গিলে মাঝে বসে কেবলি গলার থলি ঝাড়ছেন আর পাঁচ গণ্ডা বুড়ো নেংটি ইঁদুর শুকনো মুখে একধারে চুপটি করে বসে এদিক-ওদিক কান ঘোরাচ্ছে।

ইঁদুর বেরাল পেঁচা হাড়গিলে এখানে জমা হয়েছে দেখেই রিদয় বুঝলে নাটবাড়িতে আজ বিষম গণ্ডগোল। চকা আর রিদয়ের দিকে কেউ আজ চেয়েও দেখলে না, সবাই চেয়ে রয়েছে হাঁ করে যেদিন দিয়ে দলে-দলে চুয়ো সার বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে আসছে!

ভুতুম পেঁচা খানিক ভুতের মতো নাকিসুরে চুয়োদের বিষম উৎপাতের কথা বর্ণনা করে চলল। বেরাল মিউমিউ করে খানিক কাঁদুনি গাইলে—'এই বুড়ো বয়সে শেষে কি চুয়োর

পেটে যেতে হবে নাকি, আণ্ডাবাচ্চা কাউকেই তারা রেহাই দেবে না!'

হাড়গিলে ইঁদুরদের ধমকে বললেন—'এই দুঃসময়ে তোমাদের চাঁইদের বারোয়ারিতে যেতে দিয়ে যত মুখ্যমি করেছ, লড়াই দেবার জন্যে একটা লোক পর্যন্ত রইল না কেল্লায়! আমি কি এই বুড়ো বয়সে চুয়ো মেরে ঠোঁটে গন্ধ করতে পারি, ছি-ছি! এমন করে কেল্লা ফাঁকা রেখে সব নেংটির চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে।'

ইঁদুরগুলো কেবল হতভম্ব হয়ে বেরালের দিকে চাইতে লাগল।

বেরাল ফোগলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে—"আমার দিকে দেখছ কি? তোমরা নিজেদের ঘর সামলাতে না পার নিজেরাই মরবে। আমার কি, আমি ষষ্ঠীর দুয়োরে গিয়ে ধন্না দেব। সেখানে পেসাদের কিছু না পাই দুই তো আছে।"

ইঁদুররা হাড়গিলের দিকে চাইতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমি আর কি করতে পারি বল? এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ টিকটিকির মতো মানুষটিকে তোমাদের এনে দিলেম, এঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভালো হয় কর। আমার যথাসাধ্য তো তোমাদের জন্যে করলেম, এখন যা করেন গণেশ ঠাকুর। আঃ আর পারিনে।" বলে হাড়গিলে পা মোড়া দিয়ে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে চোখ বুজলেন।

ইঁদুর বেরাল পেঁচা একবার রিদয়ের মুখের দিকে চাইলে তারপর আস্তে-আস্তে সভা ছেড়ে যে যার বাসায় যাবার উদ্যোগ করলে। এদের রকম দেখে চকার এমনি রাগ হচ্ছিল যে সব কটাকে ঠেলে সে চুয়োদের মুখে ফেলে দেয়, বিশেষ করে ওই একঠেঙ্গে হাড়গিলেটাকে এক ধাক্কায় নাটবাড়ির চুড়ো থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেবার জন্যে চকা নিসপিস করতে লাগল।

রিদয় তাকে চোখ টিপে বললে—"চুয়োদের জব্দ করা শক্ত নয়, যদি নাটবাড়ির ঠাকুরঘরের লক্ষ্মী পেঁচা আমাকে এখনি একবার, ঠাকুরঘরে যে দুয়োরের উপরে কুলুঙ্গীতে গণেশ বসে আছেন, তাঁর কাছে নিয়ে যান!"

ভুতুম অমনি তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী পেঁচাকে ডেকে আনলে। রিদয় লক্ষ্মী পেঁচাকে গণেশের কথা শুধোতে সে বললে—"ঠাকুর তো এখন শয়ন করেছেন, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ।"

রিদয় চকার সঙ্গে চুপিচুপি দু-একটা কথা বলাবলি করে পেঁচাকে বললে—"পুরোনো দরজা খুলে নিতে কতক্ষণ? চল, পথ দেখাও।"

লক্ষ্মী পেঁচা আগে পথ দেখিয়ে চলল, সঙ্গে রিদয়।

চকা বললে—"এই ভূতচতুর্দশীর রাত্রে পোড়ো বাড়িতে একা তোমার সঙ্গে যেতে দিতে মন সরছে না—যদি পেঁচোয় পায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।"

হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"না, না, সে হতে পারে না, তুমি গেলে গোল হবে, বুরুঞ্জিতে লিখেছে এই ভূতচতুর্দশীতে একা এই অঙ্গুলি প্রমাণ মানুষটি এসে নাট্যবাড়িতে মুষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে বংশের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখ, ভূত পালাবে।" বলে রিদয়ের হাতে হাড়গিলে তাঁর বাসার ছেঁড়া মাদুর একটু ভেঙে দিয়ে তার কানে মন্তর দিলেন।

রিদয় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে চিলে ছাতের গোল সিঁড়ি বেয়ে পেঁচার সঙ্গে নেমে চলল, মনে-মনে ভূতের মন্তর আওড়াতে-আওড়াতে-হং সং বং লং হাঃ ফুঃ।

ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না। রিদয় সেই অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে চিলে ছাতের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে। দুদিকে পিছল পাথরের দেওয়াল, তার মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘুলঘুলি, সেখান দিয়ে একটু যা আলো তার বাতাস আসতে পায়। রিদয় দেওয়ালের গা ঘেঁষে টিকটিকির মতো পায়ে-পায়ে নামছে, অন্ধকারে পেঁচা যে কোন দিকে চলে সেই জানে, কেবল সে এক একবার হাঁকছে—'উঁচা-নিচা।' আর সেই ডাক শুনে রিদয় চলেছে, ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক-দেওয়া সিঁড়ি পার হয়ে অন্ধকারে।

একটা কিসের গায়ে হাত পড়তেই সেটা ক্যেঁ বলে ঝটপট করে উঠল, এক জায়গায় জল পড়ে ডোবা মতো হয়েছে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে পা রেখেই রিদয় থমকে দাঁড়াল, পেঁচা অমনি বলে উঠল—"বাঁয়ে ঘেঁষে।" কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে কখনো উঁচায় কখনো নিচায় এইভাবে রিদয় চলেছে! চোখে কিছু দেখছে না, কানে শুনছে খালি যেন এখানে কি একটা ঝটপট করে উঠল, ওখানে মাথার উপর থেকে কে ঠিক-ঠিক করে ডাক দিলে, কখনো শুনলে পাথরের গায়ে কে নখ আঁচড়াচ্ছে, ওদিকে কারা যেন দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছে কি একটা পাশমোড়া দিলে, হঠাৎ গালে যেন কে একটা চিমটি কেটে গেল, কানের কাছে চট করে একটা কে 'টু' দিয়ে পালাল। এর উপরে রিদয় নানা বিভীষিকা দেখছে—হঠাৎ এক জায়গায় গোটাকতক চোখ আলেয়ার মত জ্বলেই আবার নিভে গেল। যেন ইলিশ মাছের জাল নাকের সামনে কে একবার ঝেড়ে দিয়েই সরে পড়ল, হঠাৎ একটা গরম হাওয়া মুখে লাগল, তার পরেই বরফের মতো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিলে।

রিদয়ের মনে হচ্ছে এইবার সিঁড়ি শেষ হল কিন্তু খানিক গিয়ে আবার সিঁড়ি, আবার চাতাল, আবার ধাপ, আবার দেওয়াল, এমনি ক্রমাগত ওঠা, নামা করতে-করতে চলা—এর যেন শেষ নেই। আঁধি ধাদি ভূত পেত্নি, ব্রহ্মদৈত্য, ঝাম ঝামড়ি কন্ধকটা শাঁকচুন্নি ডাকিনী যোগিনী ফ্যাল ভেলকি, পেটকামড়ি, সবাই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝম-ঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল। খুস-খাস খিট খাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ে, কেউ হাড় মড়-মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে কেউ বা চটি চটপট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সরু গলির শেষে মস্ত একটা চাতালের উপর এসে পেঁচা 'ঠাকুরবাড়ি' বলেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে কারুর সাড়া শব্দ নেই, রিদয় অন্ধকারে হাতড়ে দেখলে চারদিকে দেওয়াল, দরজাও নেই, কিছুই নেই! রিদয় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কে তার পায়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আস্তে-আস্তে দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর কিচ করে যেন চাবি খোলার শব্দ হল। একটা মস্ত দরজা হড়-হড় করে গড়িয়ে আপনি যেন খুলে যাচ্ছে, পায়ের নিচে পাথরের মেঝেটা তারই ভারে কাঁপছে!

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে মাথার উপরে ঘটং-ঘং ঘটং-ঘং করে রাত বারোটার ঘড়ি পড়ল। অমনি দপ-দপ করে চারদিকে আলোয়-আলো এসে দেওয়ালির পিদুম জ্বালিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে-নাড়তে ভয়ঙ্কর এক কাপালিক ব্রহ্মদৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত—

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা।
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা।

রিদয় দেখলে ঘরের মধ্যে কালো পাথরের প্রকাণ্ড এক মূর্তি, তাতে কতকালের রক্তচন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিব লক-লক করছে আর গায়ে সোনা-রুপো হীরে-জহরত আর মুন্ডমালা ঝুলছে। ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন!

রম্-ঝম্ রম্-ঝম্ শব্দ উঠে
ভূত-প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে।
তাধিয়া-তাধিয়া বাজায় তাল
তাতা থেই-থেই বলে বেতাল
ববম-ববম বাজায়ে গাল
ডিমি-ডিমি বাজে ডমরু ভাল
ভবম-ভবম বাজায়ে শিঙ্গা
মৃদঙ্গ বাজায় তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা
ধেই-ধই নাচে পিশাচ দানা।

রিদয় হাঁ করে ভূতের কাণ্ড দেখছে এমন সময় পেঁচা কানের কাছে ফিস-ফিস করে বললে, 'এখানে নয়, পায়ের কুঠরীতে গণেশ ঠাকুরের সভা। হোমের ধোঁয়ায় আলোগুলো ক্রমে ঘোলাটে হয়ে এল; সেই সময় রিদয় পেঁচার সঙ্গে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে গণেশ মহলের গলিতে সেঁধোল। দেউড়িতে একটা মোটাপেট হিন্দুস্থানী দারোয়ান সিদ্ধি খেয়ে খালি গায়ে ভোঁ হয়ে ঢোলক পিটছে, অন্ধকারে রিদয় তাকেই গণেশ ভেবে টিপ করে একটা পেন্নাম দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

দারোয়ানজী ভারি গলায় বললে, "কৌন হোঃ?"

রিদয় কিছুই বুঝলে না, তব ঘাড় নেড়ে বললে—"আজ্ঞে আমি রিদয়, নেংটি ইঁদুরেরা বড় বিপদে পড়েছে তাই—"

"ক্যা বক-বক লাগায়া"—বলে দারোয়ান আবার ঢোল পিটতে লাগল।

রিদয় ভাবলে গণেশ বকের কথা শুধোচ্ছেন; সে তাড়াতাড়ি বললে—"আজ্ঞে বকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কিন্তু আজ আমি ইঁদুরের হয়ে লড়াই করতে চাই, সেইজন্যে আপনার ওই জয়ঢাকটি আমি চাই।" বলে রিদয় যেমন ঢোলকে হাত দিয়েছে, অমনি গণেশের দারোয়ান ধমকে উঠল—"ধেৎ তেরি।"

রিদয় ভয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়ল—সেই সময় পেঁচা এসে তার কানে-কানে বললেন—"করছ কি? উনি গণেশ নন, ভিতরে চল!" তারপর দারোয়ানের সঙ্গে পেঁচা গিয়ে কি খানিক বকাবকি করলে, তখন দারোয়ান দুয়োর ছেড়ে দিয়ে বললে—"আইয়ে বাবু।"

মহলের মধ্যে গণেশের পরিচয় চৌষট্টি ভাগ কলাবৌ, কেউ রঙ তুলি নিয়ে আল্পনা দিচ্ছিল কেউ সেতার বাজিয়ে গান-বাজনা করছিল, কেউ মালা গাঁথছিল, কাঁথা বুনছিল, এমনি চৌষট্টি খাম্বা ঘরের মধ্যে সবাই এক-এক কাজে, হঠাৎ রিদয়কে দেখে সবাই মাথার ঘোমটা

টেনে জুজু-বুড়িটি হয়ে বসল।

পেঁচা সেখান থেকে রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিশুঁড়ো গজদন্তের খিলানের মধ্যে দিয়ে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোশে গের্দা হেলান দিয়ে থান-ধুতি মেরজাই পরে এক ভদ্রলোকে বসে আছেন, তাঁর গজদাঁতও নেই শুঁড়ও নেই মোটা পেটও নয়, দিব্যি দেবতার মতো চেহারা।

পেঁচা রিদয়ের কানে-কানে বললে—"ইনিই রাজা গণেশ, এঁকে যা দরবার করতে হয় কর।"

রিদয়ের মুখে কথা নেই, ইনিই গণেশ! ভয়ে-ভয়ে সে এগিয়ে বললে—"মশায়েব নাম?"

উত্তর হল—"আমি গণপতি, কি চাই?"

রিদয় খুব নরম হয়ে বললে— "যে ইঁদুরগুলিতে চড়ে মশায় বেড়িয়ে বেড়ান সেগুলির বড় বিপদ উপস্থিত।"

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললেন—"ইঁদুর! আমি তো কোনোদিন ইঁদুরে চড়িনে।"

রিদয় বললে—"আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হস্তী-বেশ ধরে যখন হাওয়া খেতে বেরোন, সেই সময় যে ইঁদুর আপনার গাড়ি—

গণেশ হোঃ-হোঃ করে হেসে বললেন—"তুমি পাগল নাকি আমাকে সুদ্ধ গাড়ি টেনে চলতে পারে যে ইঁদুর তাকে তুমি কোথায় দেখলে? ছেলেবেলায় আমি দু-একটা ইঁদুর পুষেছিলেম কিন্তু সবগুলোর বাচ্চা হয়ে আমার ঘরে এমনি উৎপাত লাগালে যে, সব ক'টাকে আমি ইঁদুর-কলে ধরে বিদায় করেছি। তুমি ভুল খবর শুনেছ, ইঁদুর আমি চড়িনে, হস্তীবেশেও সঙ সেজে আমি হাওয়া খেতে যাইনে, নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ঠকিয়েছে!'

রিদয় অবাক হয়ে বললে—"সে কি মশায়, ঘরে-ঘরে ইঁদুর-চড়া আপনার ছবি, তাছাড়া আমি নিজে চোখে দেখেছি, আপনি ঢোল বাজিয়ে ইঁদুর নাচ করছেন, আমাকে শাপ পর্যন্ত দিয়ে এলেন, এখন বলছেন উলটো, আমাকে ছলনা করছেন!'

গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—"বাপু আমি যাই করি, এটুকু জেনো আমি ছলনাও করিনি শাপও দিইনি। ইঁদুরেও চড়িনি কোনোদিন, ঢোলও পিটিনি। ওই আমার দারোয়ানগুলো মাঝে-মাঝে হোলিতে দেওয়ালিতে ঢোল পিটিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে, ওদের গিয়ে শুধোও। যদি আর কোনো গণেশ থাকেন তো বলতে পারিনে।"

রিদয় চোখ মুছে বললে—"মশায় যে আমাকে শাপ দিলেন, এখন শাপান্ত না করে দিলে তো আমি মারা যাই!"

গণপতি চোখ পাকিয়ে বললেন—"কোনো সাপের ওঝাকে শুধোওগে বলে দেবে, কে তোমায় শাপ দিয়েছে আর কেমন করে শাপান্ত হবে—যাও, আমাকে বিরক্ত কর না।"

রিদয় মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—"মশায়, আমি গরীব!"

গণেশ বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালেন।

রিদয় জানত স্তুতি করলেই দেবতারা খুশি হন তাই সে একেবারে গলায় বস্তর দিয়ে গণেশের রূপ বর্ণনা করে গণেশ বন্দনা শুরু করে দিলে :

খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ,

পূজা হোম যোগে যাগে তোমার অর্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।
শুণ্ডে তুলি খৈ মোয়া দন্তে খাও চিবাইয়া
ইঁদুর বাহন গণপতি,
আপনি আসরে উর রিদয়ের আশা পুর
নিবেদিনু করিয়া প্রণতি

গণেশ কানে হাত দিয়ে বললেন—"আরে রাম রাম কি বাজে বকছ, তুমি তো ভালো বিপদে ফেললে দেখি, বোসো আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসছি, বিশেষ কাজ আছে।" বলে গণেশ উঠে গেলেন।

এতক্ষণ গণেশের চৌষট্টি কলাবৌ ঘরে কি হচ্ছে দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলেন, কর্তা উঠে যেতেই গণেশ-দাসীকে দিয়ে রিদয়কে ডেকে তাঁরা শুধোলেন—"হ্যাঁগো, তুমি কর্তার কাছে কি নালিশ করছিলে?" রিদয়ের মুখে ইঁদুরের খবর শুনে তাঁরা বলে উঠলেন—"ওমা, এই দরবার করতে এসেছে তা বলতে হয়, ওই আমাদের কুমোর-বৌ-কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে-গড়ে ভটচায্যি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরে-ঘরে বিক্রি করতে পাঠায়, সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ? ওই দারোয়ানজীকে বল সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে।"

রিদয় কলাবৌদের পেন্নাম করে আবার দেউড়িতে এসে দারোয়ানজীর সঙ্গে আর একটা ঘুপসী ঘরে গিয়ে দেখলে, দোকানঘরের এক-এক কুলুঙ্গীতে এক-এক রকম গণেশ—গোবর-গণেশ তিনি কলম হাতে পুঁথি লিখছেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ তিনি এক ধামা দিল্লির লাড্ডু নিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারি-পটির টঙ্ক-গণেশ বসে-বসে খালি আকাশে আঁকশি দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ, তিনি খুব আড়ম্বর করে ঢোল পিটছেন।

রিদয় টিপ করে তাঁকে নমস্কার করে বললে—"গণেশদাদা, চিনতে পারেন?" হেড়ম্ব রিদয়ের কথার জবাব দিলেন সমস্কৃত দেবভাষায়—"বুং!" রিদয় ভাবলে এ তো মুশকিল, যদি বা কত কষ্টে এসে ধরলেম এখন কথা না বুঝলে উপায়? সে একবার ইঁদুরের দিকে, একবার ঢোলকের দিকে, একবার নিজের দিকে আঙুল নেড়ে ইশারায়, বোঝালে ঢোলকটা চাই। গণেশ ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে ওদিক-ওদিক শুঁড় নেড়ে কি বললেন বোঝা গেল না। রিদয় শুধু শুনলে—"বুং চটাপট ত্বং কং করং বাদনং পুনস্তম্ ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম্ পৌউনড্রবর্দ্ধনম্ গণ্ডস্থলম্ আগচ্ছতু।

রিদয় গণেশের মুখ দেখে বুঝলে তিনি খুব বেশি হয়েছেন। সে অমনি আচার্জি পুরুতকে দুর্গোপুজোয় শ্রাদ্ধে শান্তিতে যেমন করে সব মন্তর আওড়াতে শুনেছিল ঠিক তারি নকলে বললে—"হুং ভূত স্বাহা, কুরু-কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহ্যং কুরু তুভ্যং হং যং ছট ফট ব্রহ্মবিদ্যা হবিষে স্বাহা অহঃ চিটিপটাং হুং শান্তি ভূশান্তিং ভূত্যরশান্তি অযুধেঃশান্তি ছিহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবেলা সূর্য প্রণাম। গণেশ খুশি হয়ে দুবার ঘাড় নেড়ে "তথাস্তু" বলে চোখ বুজলেন।

রিদয় আস্তে-আস্তে ঢোলক নিয়ে বেরিয়ে এল। দরোয়ান ঘরের দুয়োরেই দাঁড়িয়েই ছিল, সে অমনি বখশিশের জন্যে হাত পাতল, রিদয় এদিক-ওদিক দেখে আস্তে আস্তে মান-

কচুর শিকড়টি বার করে বললে—"দারোয়ানজি আর তো সঙ্গে কিছু নেই, এইটে নাও।"

দারোয়ান "হাৎ তেরি", বলে হাত ঝাড়া দিলে।

শিকড় যেমন মাটিতে পড়া অমনি পেঁচা রিদয়কে ছোঁ দিয়ে একেবারে ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে-সঙ্গে পেঁচো এসে রিদয়কে পেয়ে বসল—রিদয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বহুরূপীর চামড়ার মতো তার গায়ের রং লাল, নীল, হলদে, রকম-রকম বদলাতে আরম্ভ করলে। হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মন্তর পড়ে পেঁচো ঝাড়তে বসে গেলেন ঃ

স্কন্ধাপসার শকুনি
অন্ধ পুতনা শীত পুতনা মুখমণ্ডিকা
নৈগমেষ প্রসীদতু
ক্লীং চর্চ্চ হুং হুং ঝংশা
ওঁলং শ্রীং কপালিকং জং জং
তিষ্টতি মুষকিং চং চং চর্ব্বশং হংসঃ
হুং ফট স্বাহা।

মন্তরের চোটে রিদয় হাঁ করলে, যেন খেতে এল, অমনি চট করে হাড়গিলে ধুলোপড়া বেড়ি দিয়ে পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিলেন ঃ

ধুল-ধুল স্বর্গের ধুল
মর্তের মাটি
লাগ-লাগ পেঁচোর দন্ত কপাটি
হাঁ করে নাড়িস তুণ্ড খা পেঁচির মুণ্ড
যাঃ ফুঃ
কার আজ্ঞে হাড়িপ বাবার আজ্ঞে
হাড় মড়-মড় হাড়গিলের আজ্ঞে
শিগ্‌গির যাঃ শিগ্‌গির যাঃ।

পেঁচো রিদয়কে ছেড়ে পালাতেই রিদয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চকা রিদয়ের কানে-কানে শুধোলো। —"গণেশ কি বললেন?"

রিদয় বললে—"তা তো সবটা বুঝলুম না, কেবল আসবার সময় তিনি বললেন—তথাস্তু।"

চকা হেসে বললে—"তবে আর কি, কেল্লা মার দিয়া। আর তোমার ভয় নেই। একদিন সকালে উঠে দেখবে, যে বিদয় সেই রিদয় হয়ে গেছ। চল এখন যুদ্ধং দেহি করা যাক গে।'

এদিকে কেল্লা খালি পেয়ে চুয়োর দল এ-ওর পিঠে চড়ে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার পর একটা নেংটি ইঁদুরের গড়-ভাণ্ডার সব দখল করে লুঠের চেষ্টায় দলে দলে পিলপিল করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় চৌতলায় পাঁচতলায় উঠে ছতলায় রাজসভার ঠাকুরবাড়িতে, এমন কি অন্দরমহলে পর্যন্ত ঢোকবার যোগাড়, দু-একটা

চুয়ো ছাতেও উঠে হাড়গিলের বাসাটা পর্যন্ত প্রায় এগিয়েছে। এমন সময় উত্তর দক্ষিণ থেকে নেংটি ইঁদুরের দলকে খবর দিয়ে চকার বাকি হাঁসেরা ফিরে এল। ঠিক সেই সময় গণেশের ঢোলকে রিদয় চাঁটি বসালে—ধিক-ধিক-ধিক ধাঁকুড়-ধাঁকুড়।

ঢোলের শব্দে চুয়োর দল লেজ উঁচু করে শিউরে উঠে যে যেখানে ছিল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তালে-তালে লেজ দোলাতে দোলাতে দলে-দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। চুয়োতে চুয়োতে কেল্লার প্রকাণ্ড ছাত ভরে গেল, রিদয় চুড়োয় বসে ঢোল বাজাচ্ছে—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো
নেংটি ধিং নিগিরি টিং
ধাতিং তিং নাতিং থিং
চুয়ো হাততালি দুয়ো।

আর সব চুয়ো লেজে-লেজে জড়াজড়ি করে নৃত্য করছে, পেঁচা পালক ফাঁপিয়ে, বেরাল লেজ ফুলিয়ে, হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্ছে! সব চুয়ো যখন ছাতে এসে জড়ো হল, তখন রিদয় চকার পিঠে চড়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে, চুয়োগুলো নাচতে নাচতে লাফাতে থাকল। আনন্দে তারা মনে করলে যেন সবার ডানা গজিয়েছে, তারা প্রথমে ছাতের পাঁচিল, তারপর ছাতের আলসে, শেষে একেবারে আকাশে ঝম্প দিয়ে ডিগবাজী খেতে-খেতে মাটিতে এসে পড়ে জোড়া-জোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চার পা তুলে চেয়ে রইল।

চুয়োগুলো নাটবাড়ির লীলাখেলা সাঙ্গ করে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। হাড়গিলে, বেরাল, পেঁচা পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজে এমনি মশগুল হয়ে গেছে যে পায়ে-পায়ে কখন সবাই একেবারে হাতের প্রায় কিনারায় এসে পড়েচে টেরই পায়নি, হঠাৎ রাত একটার ঘন্টা পড়ল, অমনি রিদয় ঢোল বন্ধ করলে, সবাই চটকা ভেঙে দেখলে কেল্লা খালি, আকাশে অমাবস্যার চাঁদ দেখা দিয়েছে, চুয়ো আর একটাও নেই। রিদয়কে নিয়ে চকা উড়ে চলেছে। হাড়গিলে, পেঁচা চটকা ভেঙেই দেখলে বেরাল আলসে থেকে আকাশে একটা পা বাড়িয়ে চুয়োদের মতো ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হাড়গিলে তার লেজ ধরে এক টান দিয়ে বললে—"কর কি, পড়ে মরবে যে!"

বেরাল ফ্যাল-ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে—'ইকি"—বলেই ফ্যাঁচ করে হেঁচে আস্তে-আস্তে পেছিয়ে এল।

ওদিকে নেংটির দল আস্তে-আস্তে কেল্লায় এসে যে যার ঘরে ঢুকে ধান ভানতে বসে গেল। চুয়ো তাড়াবার জন্যে হেড়ম্ব-গণেশের ঢোলককে ছাড়া আর কাউকে যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার সেটা তাদের মনেই এল না।

রাতের মধ্যে পেঁচার দল প্রায় বারো আনা মরা চুয়ো খেয়ে সাফ করে দিলে, বাকি যা রইল সেগুলের উপরে সকালবেলায় কাক চিল এসে পড়ল। বেলা আটটার মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

আজ অমবস্যা তিথি, রাত্তিরটা হিমালয়ের এপারটায় কাটিয়ে কাল থেকে হাঁসেরা

পাহাড়ের ওপারে নিজের-নিজের দেশের দিকে রওনা হবে, দেশের কথা ছাড়া আজ আর কারু মুখে অন্য কথা নেই। আকাশে মেঘ করেছে, বিষ্টি নেই, কেবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর শীতালু বাতাস। মাথার উপর দিয়ে দলে-দলে পাকি হু-হু করে উত্তরমুখো চলেছে—সবাই দেশে যেতে ব্যস্ত, তার উপর এ-বছর পাখিদের বারোয়ারি পড়েছে। কুঁচেবক কুঁচিবক তারা বারোয়ারির নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে চেঁচিয়ে জানাচ্ছে পুন্নিমার দিনে বারোয়ারিতে যেতে হবে ভারি জলসা।

চকা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারি খুশি, রিদয়কে বললে—"তোমাদের দুজনের কপাল ভালো, বারো বছর অন্তর কৈলাস-পর্বতের ধারে মানস-সরোবরে এই বারোয়ারির মজলিস হয়, সেখানে সারসের নাচ, হরিণ-দৌড়, আর্গিন পাখির কনসার্ট গাঙ-শালিকের গীত, ছুঁচোর কেত্তন, শেয়ালের যুক্তি মেড়ার লড়াই, ভালুক-নাচ, সাপ-বাজি, মাছের চান, এমনি আরো কত কি হবে তার ঠিকনা নেই। ব্রহ্মার হাঁস কর্মকর্তা, স্বয়ং পশুপতি হবেন সভাপতি, পৃথিবীর পশুপক্ষী সেখানে হাজির হবে। মানুষের কপালে এমন আশ্চর্য কারখানা দেখা এ-পর্যন্ত ঘটেনি, কোথায় লাগে তোমাদের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। আর পাহাড়ের ওধারে আমাদের দেশটা কি চমৎকার তোমায় কি বলব, পালতি জলা—যেটা ব্রহ্মার হাঁস আর পৃথিবীর জলচর পাখি, কি পোষা কি বুনো সবাইকার আড্ডা সেটা যে কত বড় তা কেউ জানে না, উত্তরের সমস্ত নদী সমস্ত পাহাড় এসে সেইখানেই শেষ হয়ে আবার নতুন-নতুন নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে। এই পালতির উত্তর গায়ে ঢোলা পর্বত, সেই ঢোলা পর্বতের ওপারে পাঁচিলে ঘেরা চিন মুল্লুক, তারো ওধারে বরফের দেশের ধারে 'তন্দ্রা' বলে একটা দেশ। বছরে প্রায় দশ মাস সেখানে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ফুল পাতা নদ নদী সবাই ঘুমিয়ে থাকে, কেবল বসন্তের মাস দুই সেখানে সূর্য দেখা দেন, আর অমনি সারা দেশ ফুলে-ফুলে পাতায়-ঘাসে দেখতে-দেখতে সবুজ হয়ে ওঠে, আর আমরা সব পাখিরা মিলে সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে চলে আসি। বসন্তের শেষে পালতি জলায় বাচ্চারা বড় হবার জন্যে আপনারাই উড়ে আসে, আমরা সারা বছর দেশে-বিদেশে ঘুরে আবার বছরের এই সময়টিতে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলে-পিলেরা কেউ বড় হয়েছে, কেউ বড় হয়ে নিজের পথ দেখে নিতে বিদেশে চলেছে, কোনো-কোনো বাচ্চা বা মরে গেছে, কেউ-কেউ বা এরি মধ্যে বিয়ে-থাওয়া করে ঘরকন্না পাতবার চেষ্টায় আছে, কোনো বাচ্ছা বা সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, কাউকে ধরে মানুষে খেয়ে ফেলেছে, কাউকে মানুষে গুলি করে মেরে ফেলেছে, আর কাউকে বা তারা জেলখানার মতো খাঁচায় ভরেছে আর কাউকে বা ডানা কেটে পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বছরের এই সময়টিতে আমরা একবার করে নিজেদের জন্মস্থানে আর পুরনো বাসায় ফিরে আসতে পাই, নিজের ছেলেমেয়ের দেখা পাই, সুখ-দুঃখের দুটো কথা কয়ে নিই, তারপর আবার চলি এদেশ-সেদেশ করে।'

রিদয় বলে উঠল—"আমারও তো দেশ আছে, কিন্তু আমার তো সেখানে ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।"

চকা বললে—"সে কি! তোমার বাপ-মা কেউ নেই নাকি? যখন বড় হবে, বৌ হবে সংসার হবে, ছেলে-পুলে নাতি-পুতি হবে তখন বুঝবে সারা বছরের পরে দেশে ফিরতে কি আনন্দ। তখন দেশের ডাক যখন এসে পৌঁছবে দেখবে মন অমনি উধাও হয়ে ছুটেছে আর কিছুতে মন বসছে না, প্রাণ নীল আকাশে প্রজাপতির মতো সোনার পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে

পড়তে চাচ্ছে, তখন দেশের কথা কইতে থাকবে। এর সঙ্গে, তার সঙ্গে, দিন নেই রাত নেই কি সকাল কি সন্ধ্যে কেবল বঁধুর মুখে মধুর হাসিই মনে জাগবে তখন।"

চকার কথা শুনতে-শুনতে রিদয় কেমন আনমনা হয়ে গেল। সারাদিন ধরে আজ তার কেবলি মনে পড়তে লাগল—আমতলির সেই ঘর ক'খানি সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁসপুকুরের কাদা জল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো-লতার মাচা তার উপরে দুগ্‌গা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটি-লেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মীপুজোর আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরোনো শোবার তক্তা তার উপরে শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে লাগল, আর থেকে-থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি-বিকুলি করতে থাকল—সকাল কেটে দুপুর হয়েছে, তখনো রিদয় আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথা ভাবছে—দলে দলে কত পাখির ঝাঁক দেশমুখে চলে গেল—"চল-চল চলরে চল" বলতে-বলতে। নাটবাড়ির জলায় যত পাখি—

কাদাখোঁচা জলপিপি কামি কোড়া কঙ্ক
পালতির কুঁচেবক আর মৎস্য বঙ্ক।
ডাহুকা ডাহুকি আর খঞ্জনী খঞ্জন
সারস সারসী যত বক বকীগণ।
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকি
কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকি।

সবাই দলে-দলে দেশমুখে উড়ে পড়ছে। রিদয় দেখলে মাথার উপর দিয়ে কত পাখির ঝাঁক দেশ-বিদেশ থেকে, কেউ বন ছেড়ে, কেউ খাঁচা ভেঙে হু-হু করে দেশে চলেছে—

ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।
ময়ূর ময়ূরী সারিশুক আদি খগ
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ।
সীকরী বহরী বাসা বাজ তুরমুতী
কাহা-কুহি লগড় ঝগড় জোড়া ধুতি।
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।
ঠোঁট ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়-গুড়—
বাকচা হারিত পারাবৎ পাকরাল
হাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।

চড়ুই মুনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি বুলবুলি ফুলঝুঁটি ভিংরাজ রঙে-রঙ্গে সবুজে-লালে সোনালীতে-রুপোলীতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয়

কেবলি বসে-বসে দেখতে লাগল আর মনে-মনে বলতে লাগল—"যদি ডানা পেতুম!"

পাখিদের দেখাদেখি ভীমরুল ডাঁশ মশা দলে-দলে উড়তে আরম্ভ করেছে, চকার দলের হাঁসেরা আর থির থাকতে পারছে না। এখনো সারারাত এখানে কাটাতে হবে, তারা কেবলি উসু-খুসু করছে আর ডানা ঝাড়া দিচ্ছে।

চকা একবার রিদয়ের কানের কাছে বলে গেল, যা কিছু নেবার আছে সঙ্গে, এইবেলা বেঁধে-ছেঁদে রাখ, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। রিদয়ের দেশের জন্যে মনটা আনচান করছে, কিন্তু বেড়াবার শখ এখনো মেটেনি। সে পথের মাঝে নিজের আর খোঁড়ার জন্যে গোটাকতক গুগলী টোপাপানা এটা-ওটা সেটা নিয়ে উলুখড়ের একটি গেঁজে বুনতে বসে গেল।

থলেটা তৈরি হতে প্রায় সন্ধে হয়ে এলো। হাঁসেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চোখ বুজে রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দেবার যোগাড় করছে এমন সময় চকা এসে রিদয়কে শুধালো—"খোঁড়াকে দেখেছে কি? তাতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

রিদয় তাড়াতাড়ি থলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"সে কি, গেল কোথায়, শেয়াল নিলে না তো?"

চকা শুকনো মুখে বললে—"এই তো এখানে একটু আগেই ছিল, হঠাৎ গেল কোথায়!"

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। একে সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে পাখির ডাক শোনে সেইদিকেই রিদয় ছুটে যায় ঝোপ-ঝাড় নেড়ে দেখে, নাম ধরে ডাক দেয়, এমনি সারারাত রিদয় ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারে জল কাদা ভেঙে! নাটবাড়ির উঠোনটা পর্যন্ত রিদয় খুঁজে এল, কিন্তু সুবচনীর খোঁড়া-হাঁস কোথাও নেই!

এদিকে সকাল হয়ে এল, চকা বললে—"সে নিশ্চয়ই অন্য দলে মিশে এগিয়ে গেছে, আর মিছে খোঁজা, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি, সময় উৎরে যাচ্ছে!"

রিদয় ঘাড় নেড়ে বললে—"তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছিনে, তোমরা যেতে চাও যাও!"

চকা মুশকিলে পড়ল! রিদয় নড়তে চায় না, এদিকে সব হাঁসেরই দেশে যাবার টান রয়েছে, তবু খোঁড়ার জন্যে চকা আরো এক ঘন্টা দেরি করলে, তাতেও যখন খোঁড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তারা রিদয়কে একলা রেখে চট করে দেশ থেকে ঘুরে আসবার জন্যে উত্তরমুখে উড়ে পড়ল—আসি-আসি বলতে-বলতে।

চকার দল চলে যেতে রিদয়ের চারদিক যেন শূন্য বোধ হতে লাগল। সে আস্তে-আস্তে নাটবাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা আর একবার সন্ধান করতে চলেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখলে খোঁড়া কিরাশ-কলমীর ডাঁটা মুখে নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাঁচিলের গায়ে একরাশ ভাঙাচোরা পাথরের মধ্যে গিয়ে সেঁধোলে। এমনি খোঁড়াকে শেওলাগুলি নিয়ে সেখানটায় আনাগোনা করতে দেখে রিদয়ও লুকিয়ে-লুকিয়ে পাঁচিলে উঠে দেখলে—জড়ো করা পাথরের মধ্যে চমৎকার ছাই রঙের একটি বালিহাঁস শুয়ে আছে, খোঁড়া তার মুখে খাবার তুলে-তুলে দিচ্ছে আর দুজনে কথা হচ্ছে—"আজ কেমন আছ? তেমনিই? ডানার ব্যথাটা যায়নি?"

"না, এখনো নাড়তে গেলে বুকটায় বেদনা করে।"

"মানুষগুলো কি নিষ্ঠুর! ভাগ্যি গুলিটা বুকে লাগেনি।"

"লাগলে আর কি হত, না হয় মরে যেতুম।"

"ছি-ছি অমন কথা বল না, আমার ভারি দুঃখ হয়।"

"আমি তোমার কে যে আমার জন্যে দুঃখ হবে, আজ এই দেখা শোনা এত ভাব এত যত্ন, কাল হয়তো তুমি চলে যাবে, দুদিন পরে মনেও থাকবে না, কে বালি কোথাকার বালি।"

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—"অমন কথা বল না, যতদিন বাঁচব তোমায় ভুলব না, জলার মধ্যে এই দিনটি মনে থাকবে।"

বালিহাঁস একটু ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়ার গা ঘেঁষে বললে—"আমি দল ছাড়া হয়ে পড়লুম, কতদিনে সারবো তার ঠিক নেই।"

খোঁড়া বুক ফুলিয়ে বললে—"ভয় কি আমি তোমার কাছে রইলুম, এখন একটু ঘুমোও আমি একবার ঘুরে আসি।"

খোঁড়া চলে গেলে রিদয় আস্তে-আস্তে গর্তর মধ্যে ঢুকে দেখলে এমন সুন্দরী হাঁস সে কোনোদিন দেখেনি, এতটুকু তার মুখটি, পালকগুলি নরম যেন তুলো, সাটিনের মতো ঝকঝক করছে, চোখদুটিও কাজলটানা যেন ঢলঢল করছে। রিদয়কে হঠাৎ দেখে বালিহাঁস ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বেচারার ডানায় বেদনা, উড়তে পারে না, বালি চআঁ করে কাঁদতে লাগল।

রিদয় তাড়াতাড়ি বললে—"আমি হংপাল হাঁসেদের বন্ধু, খোঁড়া-হাঁসের সেঙাত, আমায় দেখে ভয় কি?"

বালিহাঁস রিদয়ের কথায় সাহস পেয়ে ঘাড়টি একটু নিচু করে বললে—"তার মুখে আপনার নাম শুনেছি, আপনি অতি মহাশয় লোক।" এমনি ভাবে এই কথাগুলি বালি বললে যে, রিদয়ের মনে হল কোনো রাজকন্যে যেন তার সঙ্গে আলাপ করছেন।

রিদয় বললে—"দেখি, আপনার কোথায় হাড়টা ভেঙেছে সোজা করে দিই।" আস্তে-আস্তে বালিহাঁসের ডানার তলায় হাত দিয়ে রিদয় মচকানো হাড়টা ধরে খুট করে যেমন সরিয়ে দেওয়া, অমনি বালিহাঁসটি 'মাগো' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রিদয় কখনো ডাক্তারি করেনি, পাখিটা মরে গেল ভেবে সে তাড়াতাড়ি পাছে খোঁড়া এসে দেখে সেই ভয়ে লম্ফ দিয়ে চোঁচা চম্পট। খোঁড়া বেশি দূর যায়নি, দু-ঢোক জল খেয়েই ফিরে আসছে, পথের মধ্যে রিদয়ের সঙ্গে দেখা! রিদয় তাড়াতাড়ি খোঁড়াকে বললে—"কোথায় ছিলে, সবাই যে চলে গেল, সারারাত তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি, চল আর দেরি নয়, এই বেলা গিয়ে তাদের ধরি; বেশি দূরে এখনো যায়নি।'

খোঁড়া আমতা-আমতা করে বললে—"বোসো, এখনই যেতে হবে? এত শিগ্‌রি কি না গেলেই নয়!"

রিদয়ের ভয় হল পাছে খোঁড়া গিয়ে দেখে বালিহাঁস মরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খোঁড়ার পিঠে চেপে তাকে ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—"দেখ ভাই আমার এক বন্ধু বড় বিপদে পড়েছে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া তো হতে পারে না, বেচারার ডানাটি জখম হয়েছে নড়তে পারে না, আমি গেলে তাকে কে বা খাওয়ায় আর কেই বা যত্ন করে!"

রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সেদিকে না যায়, সে কেবলি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যের মতো সুন্দরী বালিহাঁসের দিকে, রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বলল—"ভাই, বড় মন

কেমন করছে, মানস-সরোবরের এই নাটবাড়ির চালায় দু-চারদিন কাটিয়ে চল বাড়িমুখো হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না।"

রিদয়েরও মনটা সকাল থেকে দেশের দিকেই টানছিল, সে কোনো কথা কইল না। খোঁড়া-হাঁস আস্তে-আস্তে উড়ে এসে আবার নাটবাড়ির ধারে নামল ঠিক বেছে-বেছে সেইখানটিতে, যেখানে তার বালিহাঁস রয়েছে। খোঁড়া রিদয়কে পিঠ থেকে নামিয়ে গলা উঁচু করে দুবার ডাক দিলে—"বালি ও বালি!" কোনো উত্তর এল না, তারপর ছুটে গিয়ে দেখলে পাথরের মধ্যে শুকনো ঘাস-পাতা বিছানো তাদের দুদিনের বাসাটি খালি হা-হা করছে, কেউ কোথাও নেই। রিদয় চুপ করে রইল, ভাঙা গলায় খোঁড়া-হাঁস আবার ডাক দিলে—"বালি, কোথায় বালি!"

রিদয় ভাবছে নিশ্চয় শেয়াল এসে মরা হাঁসটা টেনে নিয়ে গেছে, ঠিক পরেই মিঠে সুরে—"এই যে আমি, একটু গা ধুয়ে নিচ্ছি" বলে বালি আস্তে-আস্তে জলা থেকে উঠে এল! তার ঝকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো ঝকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।

খোঁড়া হেলতে দুলতে বালির কাছে গিয়ে আস্তে-আস্তে গলা চলকে দিয়ে বললে—"বেদনা আছে কি?" বালি ঘাড় নেড়ে বললে—"একটুও না তোমার বন্ধুর কৃপায় আর তোমার যত্নে আমি ভালো হয়ে গেছি।" তারপর দুজনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে, রিদয় জলের ধারে বসে একটা বেনার শিষ চিবোতে থাকল।

বালিহাঁসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া এর মধ্যে একদিন চুপিচুপি পদ্মবনে পদ্ম ফুলের সোনালী রেণু এ-ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গায়ে হলুদ মেখে, মাছরাঙা পাখিদের বৌ-ভাতে মাছ খাইয়ে, বিয়ে থাওয়া খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে জলার ধারে বাসা বাঁধবার যোগাড়ে আছে, দেশে ফেরার কিম্বা বিদেশে উড়ে চলার আর নামটি করে না। রিদয় শুধোলে বলে—"আমরা যেখানে থাকি সেইখানেই আমাদের দেশ।"

রিদয় ব'লে—"আমার তো দেশ আছে, আমাকে তো সেখানে যেতে হবে, বিয়ে-থাওয়াও করতে হবে। এই জলার মধ্যে না পাওয়া যায় ভালো খাবার না আছে ভালো শোবার জায়গা, এখানে বাসা বাঁধলে তো আমার চলবে না।"

বালিহাঁস বললে—"তা বেশ তো, এই জলার ওপারেই একটা গয়লাপাড়া আছে, চলুন আপনাকে তাদের গোয়ালে রেখে আসি। একটা বুড়ি গাই তাদের আছে এক ছটাক করে দুধ দেয়, দুধ ভাত সবই সেখানে পাবেন।"

রিদয় শুধোলে—"আর তোমরা?"

বালিহাঁস লজ্জায় মুখটি নিচু করে রইল। খোঁড়া চুপি-চুপি রিদয়ের কানে-কানে বললে—"ভাই, ওর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে, দুটো মাস অপেক্ষা কর, তারপরে সবাই এক সঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে, এই কটা দিন তুমি কোনো রকমে গৌহাটিতে কাটাও।"

হাঁসের বাচ্চা হবে রিদয় ভারি খুশি, সে একখানা শালপাতার নৌকোতে ভর দিয়ে গয়লাপাড়ার ঘাটে গিয়ে উঠল। গয়লাপাড়া নামেই পাড়া, একঘর বই গয়লা নেই, তাও আবার গয়লা-বুড়ো অনেককাল হল মরেছে, আছে কেবল এক বুড়ি গাই আর এক বুড়ি গয়লানী!

গয়লাবাড়ির উঠোনে ঢুকে রিদয় এদিক-ওদিক চাইতে লাগল, ঘুটঘুটে আঁধার রাতটা

বাড়ির কোথাও একটি আলো নেই, কোনোদিকে গোয়াল কোনদিকে ঢেঁকিশাল কোথায় বা হেঁসেল কিছুই দেখবার যো নেই, একটা কেবল বেল গাছ ভূতের মতো এঁকে-বেঁকে টেরা-বাঁকা মোচড়ানো -দোমড়ানো শুকনো ডাল নিয়ে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার উপরে বসে একটা কালো পেঁচা কেবলি চেঁচাচ্ছে—"যো-মেঁ-র বাড়ি যাঃ, মাথা খাঃ!"

ঝড় উঠল, তার সঙ্গে টিপটিপ বৃষ্টি নামল, আরও দুটি পথিক নেউল, আর খটাস তাড়াতাড়ি উঠোনে ঢুকে এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে রিদয়কে দেখে শুধোলে —"এটা কি গৌহাটির চটি, রাতে থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি এখানে?"

রিদয় বললে—"আমি তো গয়লাবাড়ি বলে এখানে ঢুকেছি কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছিনে। এটা গোয়াল কি চটি কি ধর্মশালা বা পাঠশালা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারু সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে, কেবল একটা পেঁচা ডাকছিল একটু আগেই শুনেছি।"

খটাস বললে—"তবে নিশ্চয় এটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর।"

নেউল বলে উঠল—"মাঠের মধ্যে কখনো মড়া পোড়ার ঘাট হয়? বাড়িই বটে, তবে একটা কলুর বাড়ি কি গয়লাবাড়ি কিম্বা পুলিসের খাদাবাড়ি তা বোঝা যাচ্ছে না।"

খটাস বললে—"সেটা বোঝবার সহজ উপায় আছে।"

রিদয় শুধোলে—"কোনো বাড়ি সহজে চিনবার উপায় কি প্রকাশ কর!"

খটাস খানিক ভেবে বললে—"মানুষের নানা কাজের জন্যে নানারকম বাড়ি-ঘর বাঁধে তা তো জানো—উত্তরমুখো, দক্ষিণমুখো, পুবমুখো, পশ্চিমমুখো। গয়লা বাঁধবে একরকম, তেলি বাঁধবে অন্যরকম, মালি বাঁধবে একরকম, কুমোর বাঁধবে একরকম আর্ট বোঝো না? কে কি রকম বাঁধবে তার হিসাবটা জানলেই কোনটা কি বাড়ি বোঝা যাবে।"

নেউল বললে—"হিসেবটা কেমন শুনি?"

"শোনো তবে, প্রথমে মালির বাড়ি কেমন তা বলি শোনো," বলে খটাস খনার বচন আরম্ভ করলে ঃ

চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাই গলি কুচা
পুষ্ট বনে ঢাকে রবি শশি
নানা জাতি ফোটে ফুল উড়ে বৈসে অলি কুল
কোকিল কুহুরে দিবা নিশি।
মন্দ-মন্দ সমীরণ বহে সেথা অনুক্ষণ
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল!

রিদয় বলে উঠল—"এখানে তো ফুলের গন্ধ মোটেই পাচ্ছিনে! তবে এটা মালির ঘর নয়।"

"আচ্ছা, গন্ধে-গন্ধে বোঝো এটা তেলির বাড়ি কিনা" বলেই খটাস আবার শুরু করলে ঃ

সরষের ঝাঁঝে তেলি হাঁচে ফ্যোঁচ-ফ্যোঁচ
বলদেতে ঘানি টানে ঘোঁচ-ঘোঁচ ঘোঁচ।

নেউল বাতাসে নাক উঁচিয়ে বললে—"কই হাঁচি তো পাচ্ছে না। তবে এটা তেলির বাড়ি নয়, মালির বাড়িও নয়।"

"কুমোর বাড়ি কিনা দেখ তো" বলে খটাস শোলক আওড়ালে ঃ

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠাকুর কলসীর কাঁধা
পাতখোলার সোঁদা গন্ধ কুমোর বাড়ি বাঁধা।

রিদয় এদিক-ওদিক নাক ঘুরিয়ে বললে—"নাঃ, কোনো গন্ধই পাচ্ছিনে।"

"আচ্ছা দেখ দেখি গয়লাবাড়ি কিনা।"
গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হামা নেহাল বাছুর
ঘোল মউলি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর
ভালো দুধ টোকো দই দিচ্ছে সেথা বাস
মোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গরু চিবায় ঘাস।

রিদয় পূর্বদিকে নাক তুলে বললে—"এসব কিছুই নেই এখানে।"

নেউল পশ্চিম দিকে শুঁকে-শুঁকে বললে—"যেন ভিজে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি।"

খটাস উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে কান পেতে নাক ঘুরিয়ে বললে—"এটা গয়লাবাড়ি বটে, কিন্তু তেমন গোঁড়া গয়লা নয়, শব্দ আর গন্ধগুলো কেমন ফিকে ফিকে ঠেকছে, বিচিলী আছে, ঘাসও কিছু আছে, গরুও একটা যেন আছে বোধ হচ্ছে।"

ঠিক সেই সময় বুদিগাই "ওমঃ" বলে একবার ডাক দিলে! তিন পথিক তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলে—কত কালের পুরনো চালাখানা তার ঠিক নেই, বিষ্টির জলে মাটির দেওয়াল গলে গিয়ে বুড়ো মানুষের পাঁজরের হাড়গুলোর মতো ভিতরের চাঁচ আর খোঁটাখুঁটি বেরিয়ে পড়েছে, দরজার একটা ঝাঁপ খুলে কাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর একটা পচা দড়ি ধরে পড়ো-পড়ো হয়ে এখনো ঝুলে রয়েছে। চালের খড় এখানে-ওখানে উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে ঘুণ ধরা বাঁপের আড়া দু-চারটে ফোগলা দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে।

তিন পথিকের পায়ের শব্দ পেয়ে গোয়ালের মধ্যে থেকে বুদি ভাবলে গয়লাবুড়ি তার জাব নিয়ে এল—সে দরজা থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে—"মাগোঃ মাঃ, রাত হল আজ কি খেতে দিবিনে!"

খটাস, রিদয় আর নেউল বুদির কথায় উত্তর দিলে—"তিন পথিক মোরা, রাতের মতো জায়গা মিলবে কি?"

বুদি মাথা হেলিয়ে কেবলি শুধাতে লাগল—"কে গাঃ কে?"

রিদয় বললে—"আমি আমতলির তাঁতির পুত্তুর শাপভ্রষ্ট বুড়ো-আংলা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।"

বুদি নেউলের দিকে শিং হেলিয়ে বললে—"ইনি?"

"নেউল পুত্তুর ইনিও বেরিয়েছেন মৃগয়া করতে।"

খটাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বুদি রিদয়কে শুধালে—"আর ইনি কে?"

"ইনি হচ্ছেন খটাসের পুত্তুর দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।"

বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদি গাই লেজ নেড়ে বললে—"আর জন্মে কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্তুর পাত্তরের পুত্তুর আর কোটালের পুত্তুরের পা পড়ল।" রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিনি বন্ধুতে চোখ বুজলে।

এদিকে বুদিগাই সারাদিন জাব পায়নি, সে পেটের জ্বালায় কেবলি উসখুস করছে—"ওমঃ মাগোঃ কোথায় গেলে আজ কি আর খাব না? ও ভাই রাজপুত্তর মাচানের উপর থেকে এক বোঝা খড় নামিয়ে দিতে পার, বড় খিদে লেগেছে!"

রিদয় দেখলে চালের বাতাস মস্ত এক বোঝা খড় চাপানো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা টেনে নামানো রিদয়ের সাধ্যি নয়, একটা আঁটি কোনো রকমে টেনে রিদয় বুদির মুখের কাছে ধরে দিলে। গাই খড়গুলো মুখে নিয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রিদয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় বুদি আবার বসে উঠল,—"ওমা গো, ভাই পাত্তরের পুত্তুর একটুখানি জল এনে দিতে পার?"

নেউল ঘুমের ঘোরে বললে—"এত রাত্রে জল পাই কোথা!"

বুদি বিনয় করে বললে—"বাইরেই বিষ্টির জল জমা হয়েছে, উঃ বড় তেষ্টা, আমার গলার দড়িটা যদি খুলে দাও তো ওখানে গিয়ে একটু জল খেয়ে বাঁচি!"

নেউল বুদির গলার দড়িটা দাঁতে কেটে দিয়ে বললে—"যাও তবে!"

বুদি দু-পা গিয়ে বললে—"ইস ভারি অন্ধকার ভাই কোটালের পুত্তর!"

খটাস আধবোজা চোখ মেলে বললে—"কী?"

বুদি একে রাতকানা তাতে আবার কানে কালা হয়েছে, খটাস কি বললে—শুনতেই পেলে না। আবার ডাকলে—"ও ভাই কোটালের পুত্তুর আমি রাতকানা, যদি গলার দড়িটা ধরে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে এস তো ভালো হয়!'

"ভালো বিপদেই পড়া গেল", বলে খটাস দড়িটা ধরে বুদিগাইকে উঠানের মাঝে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে সরে পড়ল।

রাত তখন বারোটা, খড়ের গাদায় তিন বন্ধুতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় বুদি গাই এসে সবার কানে-কানে বললে—"বড় বিপদ, বুড়িটা মরে গেছে।!"

রিদয় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—"সে কি! মরলো কেমন করে?"

বুদি নিশ্বেস ফেলে বললে—'দুঃখের কথা কইব কি,এই সন্ধ্যেবেলা সে আমার গলাটি ধরে বলে গেল—'বুদি শুনেছিল এই নাটবাড়ির জলায় রাজা এবার ধান বোনবার হুকুম দিয়েছেন এতকালে জমি সব আবাদ হবে? আমাদেরও দুঃখ ঘুচবে।' আমি বললেম—'মা, তোমার আর দুঃখ ঘুচবে কি, তোমার ছেলেপুলে ক'টাই বিদেশে গিয়ে সংসার ফেঁদে কাজ-কারবার করতে বসে গেল, বুড়ি মাকে তো তারা একটিবার মনেও করলে না।' মা বললে—'বুদি লো বুদি, তাদের দুষিসনে, ঘরের ভাত পেলে কি তারা আমাকে একলা ফেলে বিদেশে যায়, না পরের চাকরি করে? এইবার তাদের চিঠি দেব দেখিস কেমন না তারা আসে! আমার মরবার সময় সব ছেলেরা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াবে আর আমি ডঙ্কা মেরে স্বর্গে চলে যাব এই সাধটি আমার কি পুর্ণ হবে বুদি।' এই বলে মা ঘরের মধ্যে চিঠি লিখতে গেল, গোয়াল-

ঘরে আর জাবও দিতে এল না, পিদুমও জ্বাললে না! সন্ধ্যেবেলা মাকে যেন কেমন-কেমন দেখনু, তাই বলি একবার যাই দেখে আসি। ওমা, ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি যেখানকার যেটি সব তেমনি গোছানো রয়েছে—পিদুমটি জ্বলছে বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মা আমার চিঠিটুকু হাতে নিয়ে আলুথালু হয়ে দরজার ধারে পড়ে রয়েছেন, ছেলেরা আসবে ছেলেরা আসবে করেই বুড়ি মলো গো।

'আহা! এই গয়লা বোয়ের দশা কি এমন ছিল। এই বাড়িতে দেখেছি ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর গিসগিস করছে—ঐ নাটবাড়ির সমস্ত জলাটা ওদের জমিতে পড়েছে, আজ এখনও কত জমি যে বেখবর পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কর্তা যতদিন ছিলেন যেমন বোলাবোলা তেমনি লক্ষ্মিরছিরি। আহা, ওই গয়লা-বৌ তখন দুবেলা সেজেগুজে পাঁচজন গয়লানি সঙ্গে গাই দোহাতে আসত, নুপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হামা দিয়ে ছুটে আসত গো। এমন লক্ষ্মী বৌ কচি-কাচা নিয়ে বিধবা হল গো! তখন এক-একদিন সে আমার গলা ধরে কানতো আর বলত—'বুদি, আর পারিনে যন্ত্রণা সইতে।' আমি বলি, মা এই শরীর তোমার, একা সবদিক দেখা কি তোমার কর্ম দু-চারটে দাস দাসী নায়েব-গোমস্তা বেশি রাখলে হয় না?' কিন্তু সে বড় কর্মিষ্টি, নিজেদের হাতে ছেলে মানুষ ধান বোনা রান্না-করা গাই-দোয়া সব করবে! আমি বলি—"মা, শরীর যে ক্ষয় হল!" কিন্তু বৌ কেবলি বলে—'ভালো দিন আসছে বুদি আসছে!' আর ভালো দিন! ছেলেগুলো বড় হয়ে চাকরির চেষ্টা বিভুঁয়ে বিদেশে টো-টো করে ঘুরতে লাগল, কেউ বিদেশ গিয়ে সংসার পাতলে, ছেলেপুলে হল কিন্তু বুড়িকে আর কেউ দেখলে না। জমি জমা গহনা-গাঁটি বেচে ছেলেমেয়ে নাতি-পুতি এমনি তিন পুরুষ ধরে সবাইকে বিয়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে-পাঠাতে বুড়ি ক্রমে সর্বস্বান্ত হয়ে না খেয়ে মরবার দাখিল হল। ছেলে-মেয়ে কত যে জন্মাল, মানুষ হল, বড় হয়ে বুড়িকে একলা রেখে চলে গেল, এই গয়লাবাড়িতে ক'পুরুষ ধরে কত কারখানাই দেখলুম যে, তা কি বলি!

"এদানি বুড়ি আর দুঃখু করত না, ছেলেদের কথা হলে বলত—'বুদি এখানে এলে তাদের তো কষ্ট বই আরাম হবে না, তবে কেন আর তাদের ডেকে পাঠাই; এই তো ভাঙাবাড়ি, এখানে জায়গা কোথায় তাদের বসবার শোবার খাবার। ওই বাপ-মা-হারা, আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোট নাতিটি বেঁচে থাক, মরবার সময় তবু মুখে জল দেবার একজন তো রইল—কি বলিস!' কিন্তু এ নাতিও বড় হয়ে যেদিন কুলির সর্দারি করতে বিদেশে গেল সেদিন থেকে বুড়ির আর চোখের জল থামল না। সে দিন-দিন কুঁজো হয়ে পড়ল, হাল-গরু জোত-জমা সমস্ত পাঁচভুতে লুটে পালাল, বুড়ি দেখেও দেখলে না—শেষে এখানে আর কেউ রইল না—এই বুদি আর এই বুড়ি ছাড়া। বুড়ি খেতে পায় না দেখে আমি একদিন বললুম—'মাগো কসায়ের কাছে আমাকে বেচলে তো পয়সা পাও, তা কর না কেন! বুড়ি অমার গলা ধরে বললে—"বুদি সব ছেলেমেয়ে তোর দুধ খেয়ে মানুষ হল তোকে আমি কি ছাড়তে পারি! আহা সেই আমার সেঙাতনী, মনিবনী, গিন্নি মা-জননী আজ নিজেই চলে গেল গোঃ, ওমা"—বলে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রিদয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—"আহা বুদি, আমতলিতে মাকে আমি এমনি করে ফেলে এসেছি যে!"

বুদি বলে উঠল—"যাও কালই ফিরে যাও, না হলে হয়তো এই বুড়ির মতো ছেলে-

ছেলে করে শেষে সেও মরবে। তোমার তো এখনো গিয়ে মাকে দেখবার সময় আছে কিন্তু এই বুড়ির ছেলেরা কি পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিল, কখনো দেশে এল না, মা মরে গেল তাকেও দেখতে পেলে না।"

সকাল বেলায় মিউনিসিপালের মুর্দোফরাসগুলো এসে বুড়িকে পোড়াতে নিয়ে গেল, খটাস চলে গেল দিগ্বিজয়ে, নেউল চলে গেল মৃগয়াতে, রিদয় বুড়ির ঘর থেকে, তার ছেলেদের নামের চিঠিখানি ডাকে ফেলে দিয়ে, বুদিকে মাঠে রেখে খোঁড়ার কাছে ফিরে চলল। পাতি-জলার কাছ বরাবর এসে রিদয় দেখলে খোঁড়া-হাঁস সকালে উঠে জলের মাঝে একটা মাটির টিপিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে, বালি-হাঁস তখনো ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রিদয় সারারাত কিছু খায়নি, হাঁসের কাছে না গিয়ে সে বরাবর বুদিগাইটার পিছনে-পিছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। দু-একটা পাত-বাদামের চেষ্টায় রিদয় একটা শিরীষ গাছের উঁচুডালে কাঠবেড়ালিদের ঘরে ভিক্ষে করতে চলেছে। মস্ত শিরীষ গাছ, তার উপরের ডালে কাঠবেড়ালিদের খোপ বসতি, ঝোপ বসতি। এমনি এপাড়া-ওপাড়ায় রিদয় 'জয়রাম' বলে গান গেয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কেউ এসে তাকে দুটো শুকনো ছোলা, কেউ একটা বাদাম, এমনি টুকি-টাকি ভিক্ষ দিচ্ছে। রামের দোহাই দিলে কাঠবেড়ালিদের ভিক্ষে দিতেই হয়, কিন্তু এক-এক কাঠবেড়ালি গিন্নি ভারি কিপটে, রিদয়কে দূর থেকে দেখেই বলছে—"ওগো ঘরে কিছু নেই, কর্তা হাটে গেছেন, ওবেলা এস—এখন কিছু হবে না।" রিদয় পাকা ভিখিরী, সহজে ছাড়বে কেন, গান শুরু করলে।

বাসনা করায় মন পাই কুবেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুমি যত আশ না
আস তাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই
ক্ষুধা মাত্র সুধা খাই মরি-মরি ফাঁস না
ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাসনা!

কাঠবেরালি গিন্নী এতেও সাড়া দেয় না, রিদয় এবার হিন্দী গান ধরলে ঃ

ধুম বড়া ধুম কিয়া খানে জোনে নাহি দিয়া
চহুঁয়ার ঘেরালিয়া ফোজ কি গিতাপয়া!
আরে চহুঁয়ার, আরে চহুঁয়ার।

এক থোকা শিরীষ-ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো-আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একটা কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর একটা কাক, তারপর আর একটা আর একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোমকাকের দল রিদয়কে চোখে-মুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না—"যাক-যাক" বলে এর মুখ থেকে ও, তার মুখ থেকে সে, এমনি রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুঁড়ে দিতে-দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে-করতে চলেছে দেখে বুদি গাই 'ওমা-ওমা' করে চেঁচাতে-চেঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা

কাকগুলোকে শিং দিয়ে গোঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে বেচারা মাটিতে—বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছুটোছুটি করতে লাগল।

খোঁড়া-হাঁসও আকাশে কাক দেখে—"ক্যা-ক্যাঁ" বলে একবার ডাক দিলে কিন্তু দেখতে-দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতি-জলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে-ঝুলতে চলা অন্য একরকম। রিদয় দেখলে জলা-জমি যেন একখানা ফাটা-ফুটো গালচের উল্টো পিটের মতো পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কালো কত রকমের যেন সুয়োঁ-ওঠা পশমে বোনা, বাঙলাদেশের পরিষ্কার ছককাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে-মাঝে ছোট বড় আয়না ভাঙা।

দেখতে-দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনা রুপো আর নানা রঙের উলে-বোনা কাশ্মীরি শালের মতো দেখাতে লাগল। তারপর জলা পার হয়ে বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল। কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়া-হাঁস, কোথায় বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি।

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাক ডাক দিলে—"খবরদার!" অমনি সব কাক রিদয়কে নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল। চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঁচিয়ে তার চারিদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—"তোরা যে আমাকে বড় ধরে আনলি।"

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে—"চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব।"

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি। গোলযোগ করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কি করে, শুকনো মুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারাল ঠোঁট বাড়িয়ে একচোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত-কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না-কোট পরা নতুন উকিল কৌঁছিলের মতো চালাক চতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলো রুখো মড়মড়ে যেন কালিতে ছুপোনো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে-গেঁটে কাদামাখা খরখরে ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো, একটা চোখ যেন ছানি পড়া আর একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো। কোথায় শাদা ধপধপে সুবচনীর হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব।

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপরে অনেক দুর থেকে হাঁসের ডাক এল—"কোথায়-কোথায়?" রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে বালি হাঁসও ডাক দিয়ে গেল "সেঙাত সেঙাত" বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাঁক দিলে—"ওগোঃ ওগোঃ!" রিদয় বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে হেথায় বলে চেঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে—"কিও! আয় দিই চোখ দুটো খুবলে!" রিদয় অমনি মুখ বুজে গোঁ হয়ে বসল।

হাঁসেরা চলে গেল বুদি গাইও ডেকে-ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে—

"উঠাও!" দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে—"বাপু তোমাদের মধ্য কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে করে নিয়ে চল, অমন ঝোলাঝুলি করলে আমার হাত পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!"

ডোমকাক ধমকে বললে—"চল-চল, অত বাবুগিরিতে কাজ নেই। কাগে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব!"

এবারে ঝোড়োকাক এগিয়ে এসে বললে—'মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙে দ করে নিয়ে গেলে তো ওটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কি বলেন?"

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে—"তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি-বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখ পালায় না যেন!"

রিদয় দেখলে ঢোঁড়াকাকটা ওর মধ্যে দেখতে-শুনতে ভদ্দর রকম, সে আস্তে-আস্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকেরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বৌ-কথা কও পাখি বকুল গাছের আগডালে বসে বৌকে শুনিয়ে কেবলই গাইছে—"কথা কও বৌ কথা কও, মাথা খাও বৌ কথা কও।" রিদয় অমনি বলে উঠল—"কথা কইবে কি ছলে, কথা শুনলে গা জ্বলে!"

"কে রে?" বলে হলদী পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে—'কাকে-ধরা যক্।"

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল—"আবার কথা!"

আরও দক্ষিণ মুখো গিয়ে দয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বৌকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে—"বুবু ওঠো দেখি মম।"

রিদয় অমনি বলে উঠল—"আদর দেখ উহু।"

ঘুঘু গলা তুলে বললে—"কে রে কে রে?"

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে—কাকে ধরা যাক।'

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে—"ফের বকচিস, চুপ।"

ঢোঁড়াকাক বলে উঠল—"বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা-তামাশা শিখেছি।"

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে সব পাখিকে জানিয়ে দিতে-দিতে চলল—তাকে কাকে ধরেছে।

এমনি বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিব-মন্দির, তারি চুড়োয়, ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বৌকে শুনিয়ে রাগরাগিণীতে গলা সাধছে; বৌ তার পঞ্চবটির বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে—"সা রে গা মা পা—চারটে ডিমে তা ধা নি সা—দুই-জোড়া ছা।"

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল—"কাগে খাবে গা!" শালিক কেও? বলে মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—"কাকে-ধরা যক্।"

যতই দক্ষিণ দিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড়-বড় নদী খাল-বিল ক্ষেত মাঠ-ঘাট গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, "চেয়ে দেখো আমি তোরি চিরদিন আমি তোরি।"

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দুজনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল—"এসা দিন রহে থোড়ি! রহে থোড়ি!"

"কেও—কেও?" বলে হাঁস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—"কাকে-ধরা যক্।" এমনি যাকে দেখে, তাতেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে-দিতে রিদয় চলেছে।

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মাঠের জমিতে নেমে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কিনা সে দিকে কারু লক্ষ্য নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় টোঁড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বললে—"মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক।" ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা টোঁড়াকাক জানত—ডোম-রাজা নাক তুলে বললে—"ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ।" টোঁড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে, তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভালো ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে টোঁড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে। সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্য সব কাক খেয়ে-দেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গাল-গল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়কাককে শুধোলেন—"দাদা চুপচাপ ভাবছ কি শুনি।"

দাঁড়কাক গলা খাঁকরি দিয়ে বললে—"ভাবছিলুম এই তল্লাটে এক মিয়া সাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ঐ মোসলমানের বিবিকে এত ভালোবাসতো যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটে করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে-খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সেই লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল না? তার নামটা কি মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোড়োকাক?"

পাতিকাক বলে উঠল—"ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টম-বাড়ির সেই কালো বেরালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টম-বৌয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত, কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে-কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?"

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের-নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে—"মাছ চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোসের লেজ ঠুকরে দিয়েছিলাম, আর একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কি, এমন সময় সেটা তার গর্তে সেঁধিয়ে গেল।'

আর এক কাক বলে উঠল—"আরে বাবা খরগোসছানা বেরালছানা এদের নিয়ে খেলা করেছ—মানুষের কাছে কখনো এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিঙ্গির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবিলের রুপোর কাঁটা চামচে চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি।"

রিদয় থেকে-থেকে বলে উঠল—"এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এই বেলা ওসব চুরিচামারি ছাড়, না হলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!"

"কি বলিস? বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনি তাকে ছিঁড়ে খাবে।

"ঢোঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে—'ছেলেমানুষ কি বলতে কি বলেছে। থাম হে ওকে মেরো না, রাজা তাহলে ভারি দুঃখিত হবেন। মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই। ছোঁড়াটা না হলে সে কাজটা করে কে? তাছাড়া এটা মানুষ, একে মারলে পুলিস হাঙ্গামা হতে পারে।'

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে ঢোঁড়াকেই ধমকাতে লাগল—"হাঃ মানুষ, ভারি তো উনি বড়লোক যে ভয় করতে হবে, ঢের-ঢের অমন মানুষ দেখেছি—"

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে—"চালাও।" এবারে কাকের দল রিদয়কে নিয়ে কাকচিরার পতিতজমির দিকে চলেছে—গ্রাম নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধু-ধু বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই, গরু নেই, পাখি নেই—কেবল আগুনের মতো রাঙা সূর্যটা পশ্চিম দিকে ডুবছে—সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভর সন্ধ্যাবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দুত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকিনী 'বা-বা-বা তোবা তোবা' বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল আহ্লাদে লেজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে—"হুয়া—কয়েদ হুয়া তোফা হুয়া।" চারদিকে হৈ-চৈ—ক্কা-ক্কা হুয়া শব্দ উঠছে, তারি মধ্যে ঢোঁড়া রিদয়ের কানে-কানে বললে—"আমি তোমার দিকে আছি, দেখ খবরদার ওদের কথা শুনে কোনো কাজ কর না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।"

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে-টানতে সেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনিভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ডোম রাজা ডাকলে—"ওঠ, যা বলি তা কর।" রিদয় যেন শুনতেই পেল না, চোখ বুজে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটরার কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে—"খোল এটা।"

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে—"খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।"

"খোলো আভি!" বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটরার গায়ে ঠেলে দিলে ঃ রিদয় গোঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে—"বাবা যে মরচে-ধরা তালা, এ তো খোলা সহজ নয়, আজ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে।"

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে একটা ঠোকর বসিয়ে বললে—"খোল বলছি।"

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কষিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে—"ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!"

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না—"তবে রে" বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দু'বার ডানা

ঝটপট করেই অক্কা পেলে।

"হুত্যা হুয়া, হুত্যা হুয়া" বলে শেয়াল চেঁচাতে লাগল, "ক্যা-ক্যা" বলে কাকরা গোলমাল করে তেড়ে এল। ঢোঁড়া বোকা সেজে কেবলি রিদয়কে আড়াল করে-করে ডানা ঝাপটাতে লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায় পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু-চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে।

এতক্ষণ কাকরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালী বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক-একটা তুলে বাসার দিকে দৌড়—চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে-যার ঘরে গেছে, তখন ঢোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে—"তুমি জানো না আমার কি উপকার করেছ। এস আমার পিঠে চড়ো আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।"

এত হুটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে-ঢুলে পড়তে লাগল। ঘুমের ঘোরে তার যেন মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মত হয়ে যাচ্ছে—কাক বগ হাঁস শেয়াল সব একসঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমনসময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে—"কোথায়?"

"হেথায়" বলে যেমন রিদয় চেয়েছে অমনি দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন—'কিছু ভাঙিসনি তো?'

রিদয় ভয়ে-ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে—দুবার মাথা চুলকে রিদয় এক দৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোঁড়া-হাঁস পুকুর পাড়ে একটা বুনো হাঁসের সঙ্গে ভাব করছে—আর একটা ঝোড়োকাক চলে বসে "কা-কা" করে ডাকছে—গোয়ালঘর থেকে কপ্‌লে গাই ডাক দিলে "ওমঃ," ঠিক সেই সময় একটা গুগলী পুকুর ঘাট বেয়ে আস্তে-আস্তে জলে নেমে গেল!

রিদয় পুকুর পাড়ে হাঁ করে কি ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে—"কি হল তোর?"

রিদয় মাথা চুলকে বললে—"মা, আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?" বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেই সময় ডালিমগাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল—"ওকি রিদয় হল কি!"

"মাথা আর মুণ্ডু হল।" বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে—"এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ।"





রাজকাহিনী

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, সে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনকসেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুন্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুন্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনি আকশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য-মন্দিরে সূর্যপুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন, আর মনে-মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যায় আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করেছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল—পরনে ছিন্নবাস কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা- সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন—কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি? কি চাও?' তখন সেই ব্রাহ্মণবালিকা কমলকলির মতো ছোট দুইখানি হাত জোর করে বললে—'প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জর দেশের বেদাবিদ ব্রাহ্মন দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মা-ও নেই, আমায় আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আরে অনাথিনী, এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন।'

ব্রাহ্মণ মনে-মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—'হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পুজা করলেম আজ শেষ-দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার

সেবাদাসী। হে আমার প্রিয় ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে—আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন—'পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি করুন।' ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন—'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই! নতুন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি হবে।' সেই দিন ঠি দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন—যে-মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন যে-মন্ত্রজীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরতি শেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে-ধীরে নিভে গেল—সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে-কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতদিন মন্দিরের পাথরের দেয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ছোট পাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকারাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফলে পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল—চারিদিকে কালো মেঘেরে ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন—সেই সময় একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল! প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল, কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ির নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রের সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন; আর মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—'হায় এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।' হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো-কালো দুটি বড়-বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি

পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তর দক্ষিণে—চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, এই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির-কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কি জানি কি মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মরি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল। সুভাগার মনে আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে-ধীরে, ভয়ে-ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে-আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার-পিঠে আলোর রথে কোটি-কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময়-সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুহাতে মুখ ঢেকে বললেন—' হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়।' সূর্যদেব বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর!' বলতে-বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো, একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন—'প্রভু, আমি পতিপুত্রহীন, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।' সূর্যদেব বললেন—'বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর।' তখন সুভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু, যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি। ছেলেটি তোমারি মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী!'

সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে-ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোট পাখি কি সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বরসফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন, গায়েব, গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন; তখন পুবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে

সূর্যের আলো ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে-মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোট-ছোট মেয়ে সেধে-সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে—গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায় পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুশিতে সেই সকল ছোট-ছোট ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময়ে একটি খুব ছোট ছেলে বলে উঠল—'আমি রাজার পুজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।' তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময় সেই ছোট ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে—'গায়েব, তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কি? বাপের নাম কি?' গায়েব বললেন—"আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী—মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম—কি?" গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবরে বরপুত্র। নাব বলতে পারলেন না, লজ্জায় আধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল। লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়-চাপড়ে ছোট ছেলেদের ফোলা গাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। নীরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্যদেবের মূর্তি-আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বললেন—'আরে উন্মাদ কি করলি? সূর্যদেবের মঙ্গল আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি? গায়েব বললেন—'দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে; বল, আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।' যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল—কি জানি কি করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বললেন,—'বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্যদেবের অপমান করিসনে; পিতার নামে কি কাজ? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব?' গায়েব তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন,'তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারীর অধম?' কথাগুলো তীরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে-মনে ভাবলেন—হায় ভগবান, কি করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কি বলে প্রবোধ দিই। গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের

চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার স্মরণ হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বললেন—'বাচ্চা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।' গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বললেন—"তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখন তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না।" সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বললে—'ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও? গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুভাগা দুজনের হাত ধরে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেনন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সুযদেব দর্শন দিলেন—সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বললেন—'প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?' সূর্যদেব একটি কথা কইলেন না। দেখতে-দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিণী সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উটল-'মা, মা!' গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'মা কোথায়?' সূর্যদেব কোনোই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন! গায়েব বুঝলেন মা আর নেই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি-আঁকা সেই পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুঁড়ে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'সূর্যদেব কোথায়?' গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বললে—ওই নাও ভাই আদিত্যশীলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয়ই মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন আর বলেছেন তুমি তাঁর ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সুর্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে-মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ! যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা হাতে পৃথিবী জয় করে এসো।' গায়েব বললেন—'তোকে কোথা রেখে যাব বোন?' গায়েবী বলল—'ভাই আমাকে এই মন্দিরে বন্ধ রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেও।'

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মারে! ভাইরে!' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝনঝন শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি-মণ কালো পাথরের

প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগল। গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—কাচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে।' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে, গায়েব এই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশবিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনো দিকে সাড়া শব্দ নেই, পায়ের ধারে চামরধারিণী চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হল যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে। আর সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে যে যেন ডাকছে—'ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!'

শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন ভীমের বর্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কপাট একেবারে বন্ধ—কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন—দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার, কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল—'হায় গায়েবী! কোথা গায়েবী!' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন—উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে। কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপরে জেগে আছে। যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই-বোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে-শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী!' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে-ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে, পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেই দিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে-মন্দিরে আর অন্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল তেমনি রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে সূর্যকুণ্ডের চারিদিকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে

দিলেন। যখনি কোনো যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন; তখনি তার জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, সবচেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যর উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না। শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনি রইল! শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজ-রথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটখাটো পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর তেমনি মনোরাম ছিল! স্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত-বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ-মায়ের কছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড় ইচ্ছা ছিল যেন যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে-সাধে বাধ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্দঃপুর যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোট একটি শ্বেতপাথরের বারান্দা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে-মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হালকা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেবে; তারপর দুজনে মিলে, পঁচিশ গজ ভাঙনের

গায়ে—পাতলা একখানা মেঘের মতো শাদা শ্বেতপাথরের সেই বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবে।

মাঝে-মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তায় বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকঝক করে উঠত; তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারান্দায় রাজরানি পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত।

যে-দিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারান্দায় মহারাজের চিঠি হাতে বসে থাকতেন।

সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে-যেতে, কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চরাতে-চরাতে চন্দ্রবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক কারো হতে বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে রাজভক্ত প্রজা হাজার-হাজার সেই সকল আশীর্বাদ করতে-করতে সকালবেলায় কাজে যেত; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম-হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে-পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন—কখনো কোনো বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত! তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘন্টা বেজে উঠত, তখন পুস্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন। আর মনে মনে বলতেন—"হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয়-ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো। ভগবতী, আমার যে ছেলে হবে, সে যেন মহারাজের মতো তেজস্বী হয়, আর তাঁরই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে।' হায়, মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড় সাধ ছিল—সেই শ্বতপাথরের বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন—তাঁর যে বড় সাধ ছিল—নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যে-দিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে রূপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করেছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল একখানি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত

জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ-ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁদে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—'মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল!' রাজরানী বললেন—'আর কটা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক।'

পুষ্পবতী বললেন—'না, না, না, মা।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর, আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমী-মোড়া একখানি ছোট ডুলি, বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া-পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই। বিধর্মি ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখের এক ফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ-ধূ করতে লাগল; তিনি লক্ষ-লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া-পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রানী পুষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন—'প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো! তোমায় আর কি বলব ভাই? দেখ রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে! আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও—যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখতে-দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল—'জয় মহারানীর জয়! জয় সতীর জয়! কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে

মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে-সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত-বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত-বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁর বলতেন—'আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন। এই তাঁর রাজপ্রাসাদ।'

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন। কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহরে লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে-বনে পাহাড়ে-পাহাড়ে কোনোদিন ভীলদের সঙ্গে ভীল-বালকের মতো, কোনোদিন বা সেই রাজপুত-বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভুমির উপর সিংহ-শিকার করে, কখনো বা জাল ঘাড়ে বনে-বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।

মালিয়া-পাহাড়ের নীচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চড়ে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল দিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল বালকের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম-হাতে বাঘের ছাল পরা হাজার-হাজার ভীল-বালক, ঘোড়ায়-চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে 'আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!' বলে, মাদল বাজিয়ে নাচতে-নাচতে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন—'হা রে, কোথায় রে, তোদের নতুন রাজা? ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন—'ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপাল তিলক লিখে দে।' তখন একজন ভীল-বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহরে কপালে রাজ-তিলক টেনে দিল, ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য কারো নেই।

গোহ সত্যই-সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়োরাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোট পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীনদুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-করা কালো-বাঘের মতো কালো ছেলে; কিন্তু হায়, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল! সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল!

ভীলরাজের এক ছোট ভাই ছিলেন। দশ বৎসর আগে একদিন কি-জানি-কি নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোট ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন—'এ রে ভাইয়া! বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হয়েচিস? বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হল না, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়েয় বসালি কি বলে।' মাণ্ডলিক বললেন—'ভাইজি, ঠান্ডা হ। ভাই-রাজ বললেন—'ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।' এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে-ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বললেন—'দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।' তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল-সর্দার আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে গোহকে রক্ষা করে—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ-আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি-চুপি গিয়ে বললেন—'গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।' গোহ কোমর থেকে নিজের নাম লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে-দূরে দু-একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাতদুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন—কারো সাড়াশব্দ নেই! ভীলরাজ ধীরে-ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাঁর ছোট ভাই সামান্য ভীলের মতো মাটির উপরে এক-হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল। তিনি কালো-পাথরের পুতুলটির মতো ছোট ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। মনে ভাবলেন আমি কি নিষ্ঠুর! হায়, ছোট ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি!

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল-রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন—'ভাইয়া!' একবার ডাকলেন, দুবার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন—'ভাইয়া!'—কোনোই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—'ভাইয়া রাগ করেছিস? ভাইয়া, আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব? তুই উঠে বস, কথা ক! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি! কেন আমার কাছে-কাছে চোখে-চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালোবেসেছি? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না, সে সময়ে গোহ যে আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল। ভাই ওঠ, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার

তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি, এই নে এই ছুরিখানা—আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক।'

মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন। ধারাল ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল—বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন, ছোট ভাইয়ের গা-টা যেন বড়ই ঠান্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই! 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা-ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপরে গিয়ে পড়ল। গোহ্ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোট ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীল-রাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে-দুঃখে বুক-ফেটে মারা পড়ত। মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোট ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন? কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনি সেই ভীল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না; ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—'গোহ্ রে তুই কি করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি; গোহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?' হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল—'আহা কি সুন্দর রাজা দেখেছিল ভাই!' আর একজন বললে—'নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপারা দেখলুম।' মাণ্ডলিক নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায়, এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—'ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীলরাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?' অন্যজন বললে—'গোহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।' মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসি-মুখে মনে-মনে বললেন—'ধন্য গোহা! ধন্য তার ভালোবাসা!' হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন,ছোট ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি 'ভাই রে!' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ছুরি ভীলরাজের বুকে বিঁধে গেল—পাহাড়ে পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল—হায়-হায়, হায়-হায়, হায়-হায় হায়!

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে-যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ,বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা! রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, করেছ কি! আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?' গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন।

তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাগুলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বাপ্পাদিত্য

তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিক-ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে-বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোন রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন; যখন কোনো রাজকুমার, কোনো একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর—দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন। ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত—হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধে সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন।

এত অত্যাচার এত অপমান,তবু সেই বিশ্বাস ভীল-প্রজাদের সরল প্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে,খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার-হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হত না, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাঁদের একমাত্র আমোদ—বনে-বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত, দলের পর দল, বড়-বড় ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোট ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ এমন শিকারের দিনে

ঘরের ভিতরে বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন, বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে-ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত—শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে কেউ খাঁড়া হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিম্বা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না—মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন—'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল-প্রজা এ-বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার-হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজপরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তার পর রানী দেখলেন সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল—পিছনে তার শত শত ভীল—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর-ধনুক। মহারানী দেখলেন কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর

বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপরে ধড়পড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া-পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কি ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন, আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বছরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসদাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারো সাড়া শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোট একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন—রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়-বড় দরজা খোলা—হাঁ-হাঁ করছে; অত বড় রাজপুরী, যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে এক-হতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল; চামড়ার জুতো-পরা রাজপুত বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয়; রুপোর বাঁকি-পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পরা পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়—এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ। মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরের মতো এখজন ভীল সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুই? কি চাস?' ভীল সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে—'জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কী সুখের দিন! এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েছি, আজ এই হাতে তার ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।' মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা কর!' বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড়-বড় চাবির গোছা সজোরে ভীল সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল 'মা-রে!' বলে চিৎকার করে ঘুরে পড়ল। মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে করে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল—তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর! —পাহাড়ের পথ কত দূর? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই! রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে-পাশে বীরনগরের

দু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা, পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আট-পুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিত্যের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোট-ছোট দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিল। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজেদের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ-তিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেল, বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডারের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল—কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে! ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের ক'টিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকুট পাহাড় আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে, নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি-বংশের একজন রাজপুত, রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরের ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুই ভাই—ভীল বালিয় ও দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে বাপ্পা, রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন—তাঁর মনে বড় ভয় ছিল পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড় হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ার ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ একহাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া-পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজা শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু, মাণ্ডলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রায় কাঁপত। বাপ্পা সারা রাত্রি কখনো সূর্যের মন্ত্র, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন—আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নুতন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য এক-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন, সকাল না হতে দলে-দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে,কেউ ছোট ভাই বোনকে কোলে করে কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই—ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে—'ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?' বাপ্পা শুদু ঘাড় নাড়লেন—'না যাব, না।' হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটিমাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনি-ঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো। মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কি সুন্দর রঙ, কি সুন্দর গন্ধ! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন—বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন—'শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে।' সখীরা বললে—'আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো-খেলা খেলি আয়!' কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে। সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশি। সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো। এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে জড়ানো হাতের বালা, সখীর হাতে দিয়ে বললেন—'যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।'

রাজকুমারীর সখী সেই বালা হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—'এই বালার বদলে রাজুকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?' হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন—'পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে।'

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—'আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!' খেলা শেষ হল সন্ধ্যা হল? রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন-আজ কি আনন্দ।

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়-বড় দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে গুরুগুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে! বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মাতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর জায়গায়-জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন—এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই শাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতে ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন—'শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি—তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি! আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া এই অক্ষয় ধুনঃশর—এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়—এই দুটি তুমি লও। আর বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখ, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল—"একলিঙ্গকা দেওয়ান", তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।' তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ-ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে-পিছনে ফিরে চললেন—মেঘের গুরুগুরু, দেবতার দুন্দভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রপুর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমায় খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন—'পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড় হয়েছি, আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়? ব্রাহ্মণ বললেন—'বৎস, তুমি জানো না তুমি কে! তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন; আমি আজ এই অল্প-বয়সে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?' বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন—'পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।' ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—'যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি—পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস, সুখে থাক!'

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় নিয়ে বাপ্পা ভীলনীদিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলনীদিদি বললেন—'বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নে! ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন করে যে!' তারপর তিনজনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়-বড় পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে আছে, কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর এক জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে-দেখতে, কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সে প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল; রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি

চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র খাবার-দাবার; বড় বড় জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায়-রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সামন্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন—চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়-বড় পাথরের বাড়ি বাপ্পা এপর্যন্ত কখনো দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেওয়াল। সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোট! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড় বড় হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময় রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; শাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করেছ, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর দোলাচ্ছে; বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি, কি চাও? বাপ্পা বললেন—'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই।' এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে। চারিদিকে বড়-বড় সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোনো ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন—'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ার চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—'হ্যাঁ বীর বটে; যেমন চেহারা, তেমনি শরীর।' চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভলোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কি? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক!' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে

বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!' রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন—'তবে তাই হোক।' তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী-সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না—সভার মাঝে অপমান হবে। কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন—পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা—যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত্র প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন। সেদিন সমস্ত রাজস্থান জুড়ে কি আনন্দ, কি উৎসাহ!

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না,সর্দারেরা দুতের মুখে বলে পাঠালেন—'আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।'

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন! রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেরন—হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজ-তিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বকশিশ পেলে! বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশাবলীর হাতে

রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও এই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান-রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট-রাজকুমার গোহের বংশীয়!—সূর্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর রাজকুমারীর ছেলে নয় তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয় তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন—চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভা মুখো হলেন না।—একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন! হায় তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা! তিনি তাঁর পালক পিতা, সেই রাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব-গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে, চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড় হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল—অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন এ কি! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন—'পড় তো শুনি।' বাপ্পা নিজে এত অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে—'বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।' বাপ্পা হাসি-মুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশী বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন-পূর্ণিমার সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে! কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোট শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম, সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর-অরণ্য তবে কোনো গোলই হত না। হায় হায়! জন্মাবধি লেখা-

পড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড় তো শুনি আর কি লেখা আছে।' রানী কবচের আর-এক পিঠ উলটে পড়তে লাগলেন—'জন্মস্থান মালিয়া পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর-কুমারী, নাম বাপ্পা।'

মহারানীর বড়-বড় চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড় হয়ে উঠল—তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড় একখানা লাল আঙটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়-হায়! কি পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি। 'মহারানী! আমি মহাপাপী; আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।'

এক লিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড় ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল-রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তারপর দেশ-বিদেশ—কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার ইরান, তূরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল; মালিয়া-পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়-বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল; কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে—সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল!

এই রকম দেশে-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নীনগরে যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোলো বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী নগর থেকে তাড়িয়ে চিতোরে ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরনো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নীনগরে ফিরে এলেন। গায়নীনগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ। চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—'আজ কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!'—এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দঁড়িয়ে গাইছে—আজ কি আনন্দ!' বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জনে শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিনী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি-রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলন-পূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?' ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বলল—'মহারাজ, অর্ধেক-রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কি তামাশা!' বাপ্পা বললেন—'তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?' ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে—'আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম—কি সুন্দর মুখ, কি প্রকাণ্ড শরীর! আর আজ তোমায় কি দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই! এমন দশা তোমার কে করলে? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ? বাপ্পা বললেন—'সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।' ভিখারিণী গাইতে লাগল—'আজ কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।' বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল; বাপ্পা বললেন—'নবাবজাদী তোমায় কি দেব বল?' ভিখারিণী বললে—'আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর—কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে-কাছে রাখ।' বাপ্পা বললেন—'তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।'

তার পরদিন, সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন! সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে—হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল; হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়ালেখা

প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না—কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল! চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন! ইরানী বেগম একটি গোলাপ ফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ ফুলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন—'সখী, তোরা সেই গান গা।' চারদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল—'আজ কি আনন্দ।'

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ—দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

পদ্মিনী

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ-সিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা-মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনো সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান—যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগদাদের খালিফ হারুণ অল রসিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন; আশীর্বাদ করতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে—'খোমান তোমায় রক্ষা করুন।' আর একজন রাজা মহারাজ সমরসিংহ—যেমন বীর তেমনি ধার্মিক। তিনি যখন নাগা-সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালাগলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দিন ঘোরি যখন দিল্লির সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক-ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে-পাশে, কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু—তাঁর আদরের মহিষী মহারানী পৃথার ছোট ভাই। দুইজনে বড়ো ভালবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন! যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ-লক্ষ হাতি ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন, ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনো আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে-একে নিজের নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন, তখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের

বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ঘোরযুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোলো বছরের ছেলে কল্যাণ, আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথ্বিরাজ বন্দী হলেন, এবং দিল্লির হিন্দু-সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দিনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দিন কোথায়, কোথায় বা সেই দিল্লির রাজভক্ত! কিন্তু যে ধর্মাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে; এখানে রাজপুতানায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশো বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লিতে পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দিন। সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল-দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুতরানী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে-দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে! কি দীনদুঃখীর সামান্য কুটির, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ—এমন সুন্দরী, এ হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে, সাদা-পাথরে-বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশাহ আল্লাউদ্দিন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালা-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কি ছাই, আরবী গজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!' তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—'হিন্দুস্থানের এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, জুড়ি নেই। সে কি ফুল? সে কি ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল—চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল। দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল! কার সাধ্য, সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!'

আল্লাউদ্দিন বলে উঠলেন, 'আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!' বাঁদী আবার গাইতে লাগল—' কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?—মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান—রানা ভীমসিংহ—নির্ভয়, সুন্দর!'

আল্লাউদ্দিন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হয়—'আজ চিতোরের অন্তঃপুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজরানী—চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।' আল্লাউদ্দিনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—চিতোরের

রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!' তিনি আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠলেন, 'বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস? সে কি সত্যই সুন্দরী?' বাঁদী উত্তর করলে 'জাঁহাপনা! দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম; পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রানীর মহলে নেচে এসেছি।'

আল্লাউদ্দিন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, 'পিয়ারী, আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।' পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন, 'শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি।' কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভালো লাগল না। দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ তিনি কি একজন রাজপুত রানীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন—মনে-মনে বলে গেলেন, 'থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।'

তার পরদিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দিন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে-দিক দিয়ে গেল সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের খেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে-দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' ঘরে-ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দিন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ একনিমেষে নিবে গেল! তখন কোথায় রইল রানার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাশা আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর!

আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে-ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনার সঙ্গে আর-এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ!! শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, ''কেল্লার দরজা বন্ধ কর।' ঝনঝন শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দিন ভেবেছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী, তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, তেমনি সমুদ্র?' পদ্মিনী বললেন, 'তামাশা রাখ, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার

ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নিচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো শাদা-শাদা ঢেউ উঠছে দেখ।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! —ওই দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ওই শোনো সৈন্যের কোলাহল। আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।'

ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠান্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের ওপর কার যেন দুখানা ঠান্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—এ কি অলক্ষণ! এ কি অলক্ষণ!

তার পরদিন পুবের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দিন তখন রুপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন; খবর হল, 'রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির। বাদশা হুকুম দিলেন, 'হাজির হোনে কো কহো।' রানার দূত তিনবার কুনির্শ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোর উপস্থিত হলেন?' আল্লাউদ্দিন উত্তর করলেন, 'রানার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।' দূত উত্তর করলে 'শাহেনশা, আপনি রাজপুত-জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এমন কথা বলছেন। রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য-কিছু নেবার থাকে তবে—' আল্লাউদ্দিন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।' রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত-সর্দার একত্র হলেন, কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর। মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়-বড় হিন্দুরাজের রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনো অটল, এখনো স্বাধীন আছে। কি করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরে উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্কবিতর্ক চলল। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, "পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত তখন না হয় 'পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই, চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে" কথাটা বলে

ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রানীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, 'মহারানা কি বলেন?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'যদি সমস্ত সর্দারের তাই মত হয়, তবে তাই করা কর্তব্য। তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত-সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানীও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানার হয়ে লড়ে? মহারানা, আমরা প্রস্তুত হুকুম হলে যুদ্ধে যাই!' মহারানা হুকুম দিলেন, 'আপাততঃ যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, সাবধানে কেল্লার দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দিন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক!' সভাস্থলে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত-সর্দারি তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে বলে উঠল, 'জয় মহারানার জয়! জয় ভীমসিংহের জয়! জয় পদ্মিনীর জয়!' রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক-পারে শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানীর জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সম্বৎসর কেটে গেল, তবু সন্ধির নাম-গন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান-সৈন্যরা দিল্লীতে ফেরবার জন্য অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি-চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে! আর তারা কিনা কি বর্ষা, কি হিম, এই হিন্দুর মল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে। এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান-তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা—যার গান শুনলে ভুলে থাকা যায়! এখানকার লোকগুলোও যেমন কাটখোট্টা, তাদের গানগুলোও তেমনি বেসুরো পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেকে না।

আল্লাউদ্দিন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন; যে-কোনো উপায়ে হোক সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক-একদিনে এক-এক-দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দিন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের খেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড়-বড় হরিণ ঘাড়ে গাইতে-গাইতে চলেছে, তার পর বড়-বড় আমীর-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন—এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আর হাতে সোনার জিঞ্জীর-বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি!। বাদশা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন—এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর

দখল হল না; সৈন্যরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেন, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেন না। বাদশা একবার বাঁ-হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল—যদি কোনো রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি! হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, যে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ, নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো এক জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে-করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজ-পাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে-ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন! আর সেই তোতাপাখির জোড়া-পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল। শেষে ক্রমে-ক্রমে আস্তে আস্তে, ভয়ে-ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ্ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতীও এসে আপনি ধরা দিয়েছে!' আল্লাউদ্দিন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে ওই কথা শুনে তাঁর মনে হল—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন!

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটিতে লাগলেন। দু-একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হল যে আল্লাউদিন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে এক মাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত্র-রানী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোনো বিপদ না ঘটে সেজন্য স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আল্লাউদ্দিন স্বপ্নেও ভাবেননি; তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমরাহ্দের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির করলেন! তারপর বৈকালে গোলাপ জলে স্নান করে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা, হীরে-পান্নার শিরপ্যাঁচ পরে শাহেনশা শাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন—সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান-বীর—যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা। বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন; আর

সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে-একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দিন রানা ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না—কেবল হাজার-হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর-একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবত দিয়ে বললেন, 'শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।' আল্লাউদিন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন—যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শক্রর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা-হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রানা ভীম আল্লাউদ্দিনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন 'শাহেনশা বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজন রাজপুত আপনার গায়ে হাতে তুলতে সাহস পাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি!' আল্লাউদ্দিন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রানা, আমি সে কথা ভাবছিনে! আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?'

আল্লাউদ্দিন মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে-অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে যখন দেখলেন বিয়ের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনী রানীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই।'

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দিলেন—কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কি কালো চোখ! সে কি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল-পরা কি সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্না চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক। বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন; গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়। ভীমসিংহত বলে উঠলেন—'শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।' রানার মনে হল, রাজ-দরবারের একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রানী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছে। রাগে রানীর দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার

একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে, সজোরে ছুঁড়ে মারলেন—ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আল্লাউদ্দিন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রানীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'রানা, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম—আমায় ক্ষমা করুন।' তারপর অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দিন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল—রানা আদর করে নতুন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার; ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে; চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই, আল্লাউদ্দিন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত সেপাই।

আজ রানার মনে বড় আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখনো চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন, চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয়ে রানা-রানীর জয়-জয়কার দিয়ে যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল! তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরও অন্ধকার হয়েছে, পাহাড়ের গায়ে বড়-বড় নিমগাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক-একবার প্রহরীদের হৈ-হৈ আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট!

আল্লাউদ্দিন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায়-কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের খেত, আর-একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুইধারে প্রায় দুশো-পাঠান আল্লাউদ্দিনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান-সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল। তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত-শত শত্রুর মাঝে কুড়িজন মাত্র রাজপুত্র তাদের রানাকে উদ্ধার করাবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ-মেরে শিকার নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান আল্লাউদ্দিন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন রাজপুত চিতোরে ফিরল। প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল—ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন; পদ্মিনীকে না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।

আল্লাউদ্দিন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে

স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজী হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। —আল্লাউদ্দিন মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরানী পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনী এলেন না। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল এ ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোনো সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দিন বন্দী রাজাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রানা বাঁধা সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?' রানা উত্তর করলেন, 'পাঠান! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?' আল্লাউদ্দিন বললেন, 'যদি তুমি সত্যিই ভীমসিংহ হবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনোই চেষ্টা দেখছি না যে?' রানা বললেন, 'যে মুর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধ হয় আর কোনো সম্মন্ধ রাখতে চান না।' কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল—যদি, সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন? আল্লাউদ্দিন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল পদ্মের মতো তাঁর দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন। একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড়-ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা বাদল, দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রানী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক-হাতে তলোয়ার, আর-হাতে মা-বাপ হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারানা কি আমার কথা-মতো কাজ করতে রাজী হয়েছেন? গোরা বললেন, 'তাঁরই হুকুমে রানীজীকে পাঠান শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্যে এখনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।' পদ্মিনী একটু হেসে বললেন, 'যাও, বাদশাকে বোলো, আমার জন্যে যেন দিল্লীতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।'

গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে-দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দিনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকালবেলার সূর্যের আলোয় ক্রমে-ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল! তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠলেন—'ধূর্ত পাঠান, তোতে-আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা।'

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দিন ফজিরের নামাজ করে দরবারে

বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে—'পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই। আরও রাজরানী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মতো দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন; তাছাড়া চিতোরের রানী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে যে-সব বড়-বড় ঘরের রাজপুতানী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনো অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছা যে, এর পর থেকে আল্লাউদ্দিন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।' চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি হাসিমুখে গোরা ও বাদলের দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রানীর আসবার কোনোই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজী হলেম।'

গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন—তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাব-পত্র যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অন্য কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপালের উপর কড়কড় শব্দে নাকড়া বাজাতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে-একে পার হয়ে চার-চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশো ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে—মাঝে রানী পদ্মিনীর চিনাপোত-মোড়া সোনার চতুর্দোল, তার এক-পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর একপাশে বারো বৎসরের বালক বাদল—দুইজনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে বাদশা প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে-একে যখন সেই সাতশো পালকি কানাতের ভিতর পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, 'শাহেনশা, রানীজী উপস্থিত; এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান-বাদশাহের বেগম হলে আর তো দুজনের দেখা হবে না।' বাদশা বললেন, 'পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কি! আমি আধঘণ্টা সময় দিলাম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।' গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আল্লাউদ্দিন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক, দুই করে প্রায় সাতশো পালকি, কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে, চিতোরের মুখে চলে গেল; সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বারো বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব পালকিতে কারা যায়? শুনলেন, চিতোর থেকে যে-সকল বড়-ঘরের রাজপুতানী রানীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীমসিংহ কোথায়?' উত্তর হল, 'অন্দরে আছেন।'

আল্লাউদ্দিন শিবিরের এককোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘন্টা হয়ে

গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ, হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি—কোথাও সোনার আতরদানে হাজারটাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপ্যাঁচ, কৌটো-ভরা মানিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরির লপেটা।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জরির লপেটা পরে আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশো পালকির একখানিতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা-বাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ক্রমে আল্লাউদ্দিনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ-ঘন্টা শেষ হয়ে একঘন্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনো পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না। বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন, গোরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আল্লাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রানী পদ্মিনীকে মানিকের খাঁচায় পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার। কোথায় পদ্মিনী, কোথায় তাঁর একশো সখী আর কোথায় বা বন্দী ভীমসিংহ; পাঠান-শিবিরে হুলস্থুল পড়ে গেল। সকলেই শুনলে পালকি-বেয়ারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেছে।

বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিয়ে দু'হাজার ঘোড়া-সওয়ার সঙ্গে নিয়ে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন।

সবেমাত্র রানার পালকি চিতোর ফটক পার হয়েছে, এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন-দীন শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল।

তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা, একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধের শেষ হয় না। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল; বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না! শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান বাদশার আশা-ভরসা নির্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধেক ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দিন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয় জয়! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল!

সেই দিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ-শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?' রানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী, চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে, দেবলোকে চলে গেছে।' দুজনের আর একটিও কথা হল না। রানী পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন; দক্ষিণের

হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দিন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু-একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন মোগল বাদশা তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন; তার এক-জায়গায় বেগম লিখেছিলেন, 'শাহেনশা, আর কেন—পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভুমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল—সকলি আল্লার ইচ্ছে! আজ অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী! হায় রে হায়, দিল্লির পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল!' বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ শিবির ওঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল!

তেরো বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে—দেশ প্রায় বীরশূন্য; নতুন-নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেই সব নতুন সৈন্য নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে পথে-পথে পাঠান সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে করতে একদিন আল্লাউদ্দিন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরর দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাঁবু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা, ভুমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিন মুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর-গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, 'কাকাজি, এতদিনে বুঝি চিতোব-গড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নেই! প্রজাসকল হাহাকার করছে সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত এখন কি নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?' ভীমসিংহ বললেন, 'চিতোরে এখনো বীরশূন্য হয়নি, এখনো আমরা এক বৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি!' লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, 'কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই। তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ -জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কি? না-হয় কিছুকাল পাঠান বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম।' ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল, তিনি মহারানার দুটি হাত ধরে বললেন 'হায় লছমন, মনে বেশ বুঝেছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন বাপ গেলেন তখন আমিই তোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনা-

চিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাতদিন সময় দে। আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি। এই সাতদিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাতদিন যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।'

লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুম মতো এক-একজন রাজপুত সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল—আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন—চিতোরের ঘরে-ঘরে হাহাকার উঠল! সেই হাহকার সেই হাজার-হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরানী পদ্মিনী শ্বেতপাথরের দেব মন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল। পদ্মিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার অনাথ শিশুর জন্যে সারা দিন, সারা সন্ধা কেবল কাঁদতে লাগল।

ভীম সিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, আর কতদিন যুদ্ধ চলবে? ভীমসিংহ বললেন, 'তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনো ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে, সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কি? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল!' পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন,'প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনোই উপায় নেই?' ভীমসিংহ বললেন, 'উবরদেবী যদি কৃপা করেন তবেই রক্ষে! হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এ দুর্দশা হল।' তারপর দু-একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলই বাজতে লাগল—হায় পদ্মিনী কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাতে করে উঠলেন, 'হায়, হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়া-রূপের জন্যে এ সর্বনাশ—তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনিত হল—'তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

ঠিক সেই সময়ে চৈত্র মাসের পরিস্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গে ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটিমাত্র প্রদীপের আলো। সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরানী পদ্মিনীকে বললেন, 'মহারানী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলঙ্কার একবার অঙ্গে পরলে তার নিস্তার নেই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে।' পদ্মিনী বললেন, 'হে মাতাজী, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্যে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।' ভৈরবী বললেন, 'তবে তাই হোক। বৎসে আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্য তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে মহাসতীর রত্ন-অলঙ্কার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।' রানী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবরদেবীর সমস্ত

রত্ন-অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেই দিন রাত্রে প্রায় আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়া শব্দ ছিল না—মহারানা নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল, সেই সময়ে সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষ্মণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না। রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন দূর দেশে সামান্য বেশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরো যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারানা অন্তঃপুরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল; তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিন-ঝিন শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তোরা? কি চাস?' চারিদিকে—দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল—'ম্যায় ভুখা হুঁ।' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, "আঃ, এতরাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?" আবার শব্দ উঠল—"ম্যায় ভুখা হুঁ।" তারপর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সেই শয়নঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্তি ধীরে-ধীরে উঠল! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তুমি, দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ?' লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলঙ্কারে অসংখ্য-অসংখ্য মনিমাণিক্যে হাজার-হাজার আগুনের শিখার মতো দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন—উবরদেবী!

ভয়-ভক্তি বিস্ময়ে মহারানার সর্বশরীর অবশ হয়ে এল—পরমানন্দে তাঁর দুর্বল হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপর সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখছেন, কি জেগে আছেন বুঝতে পারলেন না! তিনি যেন শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন—ম্যায় ভুখা হু। বড় ক্ষুধা, বড় পিপাসা, আমি মহাবলি চাই—রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই! মহারানা! ওঠ, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর—আমায় খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ কর!। রাজা-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ! না, হলে সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না।'

পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনি সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম-গম করতে লাগল।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল। উষাকালে সোনার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্ধান করলেন! অনেকদূরে পার্বতী মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী-রাগিনীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে লাগল।

প্রত্যুষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ

সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল, যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই রাত্রে মহারানর আদেশে মেবারের ছোট—বড় সামন্ত-সর্দারেরা দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার জন্য অন্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজা-হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ!' বলে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না—সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হল—আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোল-পাড় করতে লাগলেন—একি দেবী, না পদ্মিনী? পদ্মিনী, না দেবী?

তারপর, মহাবলির উদ্যোগ হল। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুতের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড় রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, 'হে ভগবান, দেবীর আদেশ শিরোধার্য কর। পাঠান-যুদ্ধে অগ্রসর হও। আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারানা। এই সমস্ত সামন্ত সর্দার তোমারই প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার? জয় হলে তোমার পুরস্কার—ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল—পরলোকে মহাদেবীর অভয় চরণ।' বৃদ্ধ রানা লক্ষ্মণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন—নতুন রানার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে রব উঠল—জ'য় মহাদেবীর জয়! 'জয় অরিসিংহের জয়!' লক্ষ্মণসিংহ বলতে লাগলেন, 'সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয়, আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয় মহারানাদের কাছে। এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃ-পুরুষেরা যাতে জল গণ্ডুষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশ যুগে-যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্যে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান।'

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড় হাত করে বললেন, 'পিতা আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মতো শিশু-সন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্বল, এমনি অক্ষম? লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'বৎস হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে কোনো রাজপুত সে-ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্যে প্রাণ পণ করতে হবে! আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কোনো বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখ, চিতোরের জন্যে প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ!' লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল। রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন, 'চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো!'

যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড় ভাইয়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোট-ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা; কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে। এই শেষ-দিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।' অরিসিংহ চামড়ায়-মোড়া একটি ছোট থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, 'অজয়, এ দুটি যত্ন করে রেখ, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব; নয় তো তুমি খুলে দেখ আমার শেষ ইচ্ছা কি।' তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বললেন, 'চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় নিই! সেইদিন শেষ রাত্রে যখন রাজ-অন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন—তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—যেদিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানা বলতে লাগলেন, 'প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধর, বুক বাঁধ, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শান্ত-মনে বহন কর।' তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণঢক্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল—যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানদের বিরুদ্ধে রাজপুতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল! একের পর এক, এগারোজন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নেই; আর উপায় নেই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীরহৃদয় এখনো অটল রইল।

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে মেবারের লক্ষ-লক্ষ সৈন্য-সামন্তের অবশেষ—ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশ-হাজার দেওয়ানী-ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল! তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা—পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেত না; কেবল মাঝে-মাঝে ঘোর দুর্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী—কি কুমারী, কি বিধবা, কি দশ বছরের কচিমেয়ে, কি ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী—চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহর ব্রত উদযাপন করত, যখন আর কোনো আশা, কোনো উপায় নেই, সেই সময় হতাশ রাজপুতের শেষ-উৎসাহের মতো দুর্ধর্ষ, দুদান্ত এই দেওয়ানী ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত। সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রানী-কর্মদেবী একদিন কুতুবদ্দিনের হাত থেকে ছেলের রাজ-সিংহাসন রক্ষা করবার জন্যে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন; সেইদিন একবার দেওয়ানী ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী-ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে

বারো-হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর-ব্রত আরম্ভ হল।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম-সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, 'হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এস। পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এস! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর কর, সন্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি!' পদ্মিনী নীরব হলেন। বারো-হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল—'লাজ হরণ! তাপবারণ!' হঠাৎ একসময় মহা কল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার-হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারো হাজার রাজপুতানীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন—চিতোরের সমস্ত ঘরের সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক-নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল। সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হাতে চিৎকার উঠল—'জয় মহাসতীর জয়!' আল্লাউদ্দিন নিজের শিবিরে শুয়ে চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষাণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরর পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মতো রাজপুত-সেনা হর-হর শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর তেজে পাঠান-সৈন্যের উপর এসে পড়ল।

আল্লাউদ্দিনের তাতার সৈন্য দেওয়ানী-ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে। আল্লাউদ্দিন নতুন নতুন সৈন্য এনে বারম্বার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন—স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হল।

আল্লাউদ্দিন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না, এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড়-বড় হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল; আল্লাউদ্দিন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহীর তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন—কোনটা থাকে কোনটা যায়! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দিন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে একসময়ে এই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ-লক্ষ হাতি ঘোড়া সেপাই-শাস্ত্রী প্রলয়-ঝড়ের মতো ধুলায়-ধূসর চারিদিক অন্ধকার করে দীন-দীন শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময়, সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোনখানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্যমূর্তিলেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তার পরেই শব্দ উঠল—'আল্লা হো আকবর, শাহেনশা কি ফতে!' পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজচ্ছত্র চূর্ণ হয়ে গেল! সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে-দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুললে; ধনধান্যে, মণিমুক্তায়, লক্ষ-লক্ষ তাতার ফৌজের বড়-বড় সিন্দুক পরিপূর্ণ হল! কিন্তু যে-রত্নের লোভে আল্লাউদ্দিন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন—পদ্মিনী আর নেই—চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে!

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার মন্দির-মঠ—ছাইভস্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল—কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানের রানী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল। আল্লাউদ্দিন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেতপাথরের বারান্দায়-ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে ধীরে-ধীরে দিল্লির মুখে চলে গেলেন। পাঠান-বাদশার প্রবল প্রতাপ হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর-একদিকে বিস্তৃত হল; আর সেই বারো হাজার সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নাম, বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্তি চিরদিনের জন্যে, জগত-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়; তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না—একটি অজগর সাপ দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

হাম্বির

চিতোর তখনো পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনো ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। অন্ধোয়া বনের ধারে উজালা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারীর দল রাজকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল—শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল—সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর তো ছোটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাশা দেখছিল—পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা। দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারীদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়সে মারা।?'

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে—'ইসিসে ঘায়েল কিয়া।' তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড় শোভা ধরেছিল। তার সুডৌল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে

রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে-তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে; কিন্তু এক সময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত—তারই মাঝে সেই নীল-আঙ্গিয়া, পীলা-ওড়নি কৃষক নন্দিনী।

পশ্চিম বাতাসে অড়রের খেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের আলো নিবু-নিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কালো কালো মেঘের সরু রেখা—রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুজনে আবার দেখা হল—বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে—সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভৈঁষ।

পরদিন উজালা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়—রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শীর দুয়ারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা-পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষা হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, 'তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে কখনোই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরীবের ঘরে গিন্নী হয়ে থাকে সে ভালো।'

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশি দিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানী লিখেছেন? 'আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।'

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমীর সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধুমে-ধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর-বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোন স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজালাগ্রামে উদয় হলেন—আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমীরানীকে আর এক মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজালাগ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তারে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজালাগ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রানী লছমী, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোট গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটি ছোট পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভীলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চারমাস এখানেই কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক! তারপর পাহাড়ি জাত

যখন ক্রমে অধীন হয়ে শক্রতা ছেড়ে বশ্যতা মানলে তখন আর বড় একটা এখানে আসার প্রয়োজন হত না। ক্বচিৎ দুই একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙে-চুরে বন জঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কি দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইন্দুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট—রাজার ছেলে রাজার বৌ তারই মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানী, রাজার ছেলে ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানীমা কোথায় দুই রাজকুমার আজিমসিংহ সুজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল। ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট-সিংহাসন, কিংখাবের সুজনী, জরির চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রূপার প্রদীপ, সোনার বাটা, শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষীর মেয়েরা তরি-তরকারি, ঘিয়ের মটকি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে-দেখতে সাজসরঞ্জামে কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানীর মুখে দুই রাজপুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনো পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হায়! সূর্য এখনো রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে!'

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝিবা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়? বড় আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ সুজনসিংহ বড় হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে—কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে-শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা-রানীতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানীমা এক-একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে-দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে-বারে জানলার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, 'তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?'

'কে জানে প্রাণটা কেমন করছে,' বলে রানীমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, 'এরা যে দুভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখানো এল না কেন?'

রানা বলে উঠলেন, 'সে কী? এখনো এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?' বলতে-বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্চে, রাজা রানী দেখলেন জন কয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, 'রানীমা, দেখুন গিয়ে বড়কুমার আজিম বাহাদুরের কি হয়েছে, 'বলতে-বলতে লোকজনে ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রানী শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমেই লড়াই বাধে। বড়কুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। রানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সুজন সিং কোথায় গেলেন।'

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন, আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!'

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!'

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রানী রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য আজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আঘাত সাংঘাতিক।' ভোরের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার 'মা' বলে ডাকলেন; তাঁরপর খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণ-পাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে দুঃখে নিরাশায় দিন-দিন ম্রিয়মান হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন-দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমন কি দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর—প্রজালোককে কে রক্ষা করে? একদিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে মুঞ্জ ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল—রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে বুঝি সুর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেই সময় উজালাগ্রাম থেকে লছমীরানী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়-স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, হাম্বির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন। হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ; দাদার মতো তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গম্ভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়

হলে এ দুটি তাকে দিও।'

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত-সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, পড়ে দেখ, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কি।' পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ শ্রী কলিঙ্ক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতু ঃ—

অতঃপর অজয়সিংহজী ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত-সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে—ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠান যুধ সঙ্কট সমরে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজী অজয়সিংহ একলিঙ্গজীর দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানী লছমীও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে উজালাগ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজালাগ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমি-জমা রানীর নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতো দেওয়ানীর বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজীর সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহা উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানীতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সুত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সঙ্কট অবস্থা—এ সময়ে গৃহ-বিবাদে বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সম্বৎ ১৩৩৩ চিতোরগড়।

পত্র পাঠ শেষ হলে রানা সকালের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন কি করা কর্তব্য। রাজ্যের সামন্ত-সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কি হাম্বিরের এ বিষয়ে একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নেই; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানীর ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির কর।'

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময় পেট-মোটা, নেশায় ঢুলু-ঢুলু রক্ত চক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুই দল হল। একদল বললে, সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেন না রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল বলে উঠল, শুধু কি বহুবলের কর্ম। রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দুটোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কি করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্য দল বলে উঠল, বাপু হে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে।

দুই দলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড়।

অজয়সিংহ বললেন, 'তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোনো। তোমরা তো জানো ভীল-সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই! সেই রাত্রে ডাকাত এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে। শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করেছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দুইজনেই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা, শীঘ্র আমি চাই নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে। রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ কর।' কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বন্ধু-বান্ধব সৈন্য সামান্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন বাহাদুরের ঘুম ভাঙত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী না উঠতে-উঠতে বড়কুমার সুজনসিংহ, দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, ছোট রাজকুমার গেলেন না?'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'তিনি একটু আরাম করছেন। চল আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন?'

অমনি একজন খোশামুদে রাজপরিষদ বলে উঠল, 'চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোট কুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।' অন্যজন বা বললে, 'হুঁ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একি যার তার কর্ম? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত—মঞ্জু ডাকাত। নামে যার দেশসুদ্ধ থরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোট কুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!' ওর মধ্যে কোনো এক মন্ত্রিপুত্র বলে উঠল, 'না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার বুঝলে কিনা।'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'না হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কি জানো, ছেলেমানুষ এখনো হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাঁকে রীতিমতো কুস্তি শেখবার বন্দোবস্ত করছি, দেখ না।'

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরোনো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শান-পাথরে ঘষে-ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলাগ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান পেয়ে অস্তর দুখানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে-বসে অস্তরে শান দিচ্ছেন, এমন সময় লছমীরানী সেখানে এসে বললেন, 'এখানে

বসে কি করছিস?'

হাম্বির বললেন, 'জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দুখানায় শান দিচ্ছি।' লছমীরানী বললেন, 'হা কপাল! তুমি এখনো অস্তর শান দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজনসিং সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোক কেবল তার মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলাম।'

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না? রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়চিনে।'

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান দিতে লাগলেন। রানীমা বললেন, 'যা যা বেলা হল—এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দুখানায় শান দিচ্ছি। হাম্বির উঠে গেলেন, লছমীরানী বসে-বসে অস্তরে শান দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দুখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানীমা তার হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি এটায় যেন ফাট ধরেছে, বোধ হয়। আঁকা-বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি। এখানায় তো কোনো কাজই হবে না।'

হাম্বির বললেন, 'বল কি মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কি? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।' হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটায় একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা-বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না!

হাম্বির বললেন, 'তাই তো এটা তো কিছু বোঝা গেল না। ভালো করে দেখতে হবে! মা তুমি অস্তর দুখানা আমার ঘরে রেখে দিও। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে!'

অজয়সিংহ আজ সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখে বললেন, 'সে কি, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন।'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।'

অজয়সিংহ তখন বললেন, 'লোকজন তো সব বড় কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন করে?'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা চাই।'

অজয়সিংহ বললেন, 'যা ভালো বোঝ তাই কর। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।' হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমীরানী এসে বললেন, 'কই তোর যাবার কি হল? তোর তো লড়াইয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই

যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস!'

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, 'রসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও। একি বুনো শুয়োর, যে যাব জনারের শিষে গেঁথে আনব।'

লছমীরানী বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে-মনে যেন কি একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে তোমার ওই পুরোনো তলোয়ার আর দাগী ছোরায় কতদূর কি কর! এখন বল দেখি তোর মতলব কি!' তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কি পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয়-হয়, রানী লছমী বললেন, 'তুই তবে প্রস্তুত হ—আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।'

হাম্বির বললেন, 'আর প্রস্তুত কি, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখ তো মা আমার ঘোড়াটা এল কিনা।'

রানী উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখা যাক মা, পুরোনো তলোয়ার, দাগী ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কি করতে পারি।'

মা আশীর্বাদ করলেন, 'জয়ী হও।'

হাম্বির সেকলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটর-খটর করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার! দুহাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি-নদীর পারে-পারে, ঘনবনের ধারে-ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে-গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যে সব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই—দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাম্বির সেই মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি—বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে-মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখ। আবার ওই যে বাঘের গর্জন ঘন-ঘন শোনা যাচ্ছে! এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনো দিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীব-জন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন, কিন্তু সকাল হল তো পাখি ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন দুজন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল! লোক দুটোর কথা বোঝা গেল না কিন্তু দু-একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে-আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়ীতে কথা হচ্ছে, 'ওরে ভাই বদরী, তুই এখনো মুঞ্জু-মুঞ্জু বলিস, তাই তো সে চটে যায়।'

'মুঞ্জুকে মুঞ্জু বলব না তো কি? সে কি জানো না যে আমি তার চাচা হলেম?'

'ওরে ভাই, সে কি এখনো চাচা-ফাচা মানে? যেদিন থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'

রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জু আর ভুঞ্জ।'

'তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই নাচ দেখতে চলেছিস কেন! সর্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে—তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।'

'ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টুক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।'

লোক দুটো হন-হন করে উত্তর-মুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুমহুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে! মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙিয়ে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনো খবর নেই। সকলেই বলছে নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছে। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজালাগ্রাম থেকে লিখেছেন—তিনি উজালাগ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছে। নতুন রানা হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশো খানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়। এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, 'দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দুমুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড় তার স্পর্ধা।'

অজয়সিংহ বললেন, 'হাম্বির কি এতদূর নীচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?'

রাজমন্ত্রী বললেন, 'কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার

মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কি করে বসে বলা যায় না।'

সুজনসিংহ বললেন 'তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠানো হোক।'

অজয়সিংহ বললেন, 'তাতে কাজ নেই। এ কি পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বল। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজালাগ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পার তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।'

সুজনসিংহ 'যে আজ্ঞে' বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড় অসুস্থ। কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?'

অজয়সিংহ বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে।'

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমীরানীর সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানীমার অন্দর-মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল—হাম্বিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজালাগ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করেছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজালাগ্রামের দু-এক জন পেট-মোটা জোতদার আর দু-চার জন কালো মুস্কো পাহাড়ি ভীল।

একজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে মুঞ্জরাজা হুকুম দিলেন, 'ওর মাথা কাট!' অমনি হাম্বির কানে-কানে বললেন, 'এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিশ দিতে হুকুম হোক।' অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরীব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে-মনে বললে, 'রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সর্দার, ওর কি দয়া মায়া আছে?'

এমন সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচ-পত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভীল রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছ-হাজার তন্‌খা ও চিতোরের কেল্লা জায়গীর দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন চুয়োমল একবারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত—কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, 'এ সব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।'

মুঞ্জবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের পিঠে হাতের ছাপ লাগলেন। সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জবহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, 'এ

তো বড় মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লীর বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?'

হাম্বির বললেন, 'আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লী পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁকজমক দেখে যাক।'

মুঞ্জরাজা বললেন, 'বন্ধু তুমি যেমন ভালো বোঝ কর, কিন্তু দেখ, মাদলের বাজনা আর মহুয়ার কলসীটা ভুলো না। এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না।'

হাম্বির ভারে-ভারে মহুয়ার কলসী, দলে-দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলাগ্রামে ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেই সঙ্গে এল শাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য! রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে; ভীলের দল মহুয়ার কলসী খালি করে যেখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলাগ্রাম থেকে বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল!

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, 'রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদযাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখ, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনো পাঠানের হস্তগত।' তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব কর গিয়ে। মনে ভেব না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও মনে রেখ, তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর কর, তবেই বড় হতে পারবে।'

হাম্বিরের রাজ্যলাভ

হাম্বির এখন শুধু হাম্বির নয়—ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির! নামটা শুনতে যতখানি, হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না। থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, আশে-পাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই। মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার। এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজীর হয়ে মালদেব

তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। কোনো-কোনো দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত।

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি —চিতোরদর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল, দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। হাম্বির বলতেন, 'ওই দেখ মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!'

রানীমা বলতেন, 'জাহাজ তো তৈরি আছে। তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয়!'

হাম্বির বলতেন, এ জাহাজ মারে কার সাধ্য।'

হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লছমীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন। সেদিন দেওয়ালির পুজো! সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, 'মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এস।'

রানীমা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তুই এত বড় হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনো গেল না? এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি? এ কি তোর চিতোর—যে ঘরে-ঘরে লোকে আলো দেবে?'

' দেখবে এস না মা' বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা—কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন। রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। হাম্বির হেসে বললেন, 'মা, কি চমৎকার বাহার দেখেছ। কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের —তোমারও নয় আমারও নয়। এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি—আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখ দেখি।'

রানীমা চেয়ে-চেয়ে দেখলেন—কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে- পাহাড়ে আলো জ্বলছে। গ্রামের পথে মাঠে-ঘাটে দিকে-দিকে লক্ষ-লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল! লছমীরানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল?'

হাম্বির বললেন, 'ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ এই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।' রানীমা বললেন, 'এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?'

হাম্বির বললেন, 'শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখ, কুমোর-পাড়ায় মশাল জ্বলছে, যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি-পাড়ায় ঢোল বাজছে; এখন সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবৎ বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বিরতালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।'

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি। আমি

বলি বুঝি তুই বসে-বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি।'

হাম্বির বললেন, 'তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?'

রানীমা বললেন, 'আর না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিনকতক সবুর কর।'

দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে—'আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি!'

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।'

হাম্বির বললেন, 'বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকে আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকে দাও।'

রানী হেসে বললেন, 'তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল—রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না,সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এস; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি!' রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি বল দেখি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারানা সভায় চলুন সমস্ত খুলে বলব।'

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল। এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো-বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—'মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনো মতেই উচিত নয়।' রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন।

লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন, 'বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।' কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল।'

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব—যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধিশ্বরী রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল। মঙ্গল শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোন নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন

ঠেকছে। মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হবে না।'

হাম্বির বললেন, 'নিজের কেল্লায় প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কি? চলে এসো—'

সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, 'মহারানা, আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জন্যে আবার অভ্যর্থনাই বা কি, বাজনা-বাদ্যিই বা কেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'মালদেব, তুমি কি জানো না, রাজপুতদের নিয়ম আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যা-কর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেননি কেন?'

মালদেব বললেন, 'মন্ত্রী, আমি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা? এটা যে মহারানার নিজেরই কেল্লা। নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে প্রবেশ করছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন?'

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'দেখছি বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন। লছমীরানীর হুকুম আজ রাত্রেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।'

হাম্বিরের পিতা পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাম্বিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হম্বিরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না। তাঁর মনে হল যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের একধারে চিতোরের শূন্য রাজসিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীরপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে। তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে কারু কথা নেই; হাম্বিরের সঙ্গে যত রাজপুত এসেছিল সবাইকার চোখ সেই সিংহাসনের দিকে! প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতোরের শূন্য সিংহাসনের উপরে সোনার রাজছত্র আলো পেয়ে একবার ঝলমল করছে আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচশো রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে যেমন উঠে দাঁড়ালেন অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন। চিতোরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূন্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন, আজ যেন কতদিন পরে চিতোরের রাজকুমার এসে তাঁকে হাত ধরে বরণ করে নিলেন!

কতদিন পরে চিতোরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গল শাঁখ বেজে উঠল। চিতোর গড়ের বড়-বড় তালা-বন্ধ ঘর যে এতদিন শূন্য পড়ে ছিল, আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচশো রাজপুতের তালোয়ারের ঝনঝনায় এক একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল; যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এল।

সেই দিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যি-সত্যিই হাম্বির এসে চিতোরের কেল্লা দেখল করে নিলেন। দিল্লীর নবাব মহম্মদ খিলজীর কাছে এ খবর পৌঁছাতে গেল মালদেবের পুত্র বনবীর। তার আশা ছিল মালদেবের পরে সে-ই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

শিঙ্গোলীতে পাঠান বাদশা ফৌজ নিয়ে তাম্বু গেড়েছেন। লছমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারী

আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেতসিংহকে আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাজপুত সৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবার মহম্মদ খিলজীকে আর দিল্লীর মুখে ফিরে যেতে হল না। হাম্বির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেল্লায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই দশা। কমলকুমারীর ভাই বলে সে যাত্রা হাম্বির তাঁকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাম্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী। এক-মাস, তিন-মাস যায় হাম্বির আর চিতোরে যাবার নাম-গন্ধ করেন না। একদিন লছমীরানী তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? যেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?'

হাম্বির বললেন, 'মা, চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কি চাই তো জানো? শুধু মুঞ্জ ডাকাতের হাত থেকে চিতোরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতোর গড়টা কেড়ে নিলে বাপ্পারাওর সিংহাসনে বসা যায় না! ভবানী মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না। আগে সেই খাঁড়াখানির পুজো দিয়ে তবে রাজসিংহাসনে বসা চাই। সে খাঁড়া যে এখন কেথায়, তা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।'

লছমীরানী বললেন, 'আমি এ দুটো কথার একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনো চিতোরেই আছে। কেবল, চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ দিই কেন? চিতোরের যে রাজা, তাঁরই যখন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কি গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান করে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয়।' সেই দিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, 'ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ!'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে, হাম্বির ও কমলকুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটি-গুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে। আকাশ দিয়ে কালো-কালো মেঘ হু-হু করে করে পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। ঝড়ের তাড়ায় বড়-বড় গাছের ডালগুলো মচমচ করে শব্দ করছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে!

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলকুমারী হাম্বিরকে বললেন,

'ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে; সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির। শুনেছি, সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি, কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি।'

হাম্বির বললেন, 'তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চল, সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভিতরে যাব।'

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা সুড়ি-পথ অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে! দুজনে সেই পথে পায়ে-পায়ে চললেন। কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা—আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরনার জল কলকল করে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা—পা রাখা যায় না।

হাম্বির কমলরানীকে দুই হাতে তুলে ধরে জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন একটা শব্দ আসছে। কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে। বটগাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন। সেখানটা এমনি নিস্তব্ধ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি।

সেই বটতলায় কমলরানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন। দুদিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে! একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না! নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির হেঁটে চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কি একটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা তুলে দেখলেন একটা মড়ার মাথা। কখনো তাঁর পায়ের চাপনে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকতে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে। কখনো তিনি দূর থেকে যেন ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, কখনো মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে; এক-এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ্ করে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে; কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে একবার জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে। আবার এক-এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাইছে! এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে, পা যেন তাঁর ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল; মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে তাঁর গোল পাথরের দেয়াল, কোনো দিকে আর যাবার পথ নেই! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশে-পাশে পাথরের দেয়াল, তারি মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় পাথরের দেয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাঁখ ঘণ্টার শব্দ আসছে!

দেখতে দেখতে হাম্বিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল দু-ফাঁক হয়ে সরে গেল; সেই ফাঁক দিয়ে হাম্বির দেখলেন, গেরুয়া কাপড় রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন

ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন। অনেকদূরে কারুণী দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে। হাম্বির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কেরে তুই! কী চাস?'

হাম্বির নির্ভয়ে বললেন, 'আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে। মা ভবানী বাপ্পাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন সে খাঁড়া এইখানে আছে, আমি তাই চাই! তারই জন্যে আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি চিতোরের রানা হাম্বির!'

ভৈরবীরা হাম্বিরের কথার উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন। হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন, অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল। হাম্বির দেখলেন ভবানীর খাঁড়া হাতে তিনি কমলরানীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আস্তে-আস্তে। হাম্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়জয়কার পড়ল। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজী সেদিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাম্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ জীবনে আর চিতোর-মুখো হবেন না; তবে তিনি ছাড়া পেলেন।

কমলকুমারী হাম্বিরকে ভবানীর খাঁড়াখানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাম্বির তাঁর কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন—কমলমীর।

লছমীরানী হাম্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলাগ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে নদীর পারে খেতের ধারে।

চণ্ড

হাম্বিরের নাতি লখারানা—লড়াই করতে-করতে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন। আর তাঁর তলোয়ার, সে শত্রুর মাথা কাটতে-কাটতে এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে কেবল মুঠসার একগাছা আখ কাটবারও ধার তাতে নেই। তলোয়ারের ধার না থাকুক লখারানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল; ঠাট্টা তামাশায় তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। বয়সের সঙ্গে রানার মসকরা করবার বাতিক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

সে একদিনের কথা—শাদা জামাজোড়া, শাদা দোপাট্টা পাকা চুলের উপরে ধবধবে পাগড়ি পরে লখারানা লক্কা পায়রাটি সেজে বসে আছেন। পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের খোলা ছাদ—আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে, আর আধখানায় কেল্লার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া বিছিয়ে গিয়েছে; রানার চারিদিকে সভাসদ পারিষদ, সকলের হাতে এক-এক খোরা সিদ্ধি। এখনি জলসা শুরু হবে—চাকরেরা বড়-বড় থালায় ফুলের মালা, পানের দোনা এনে রেখেছে, গোলাপ আর আতরের গন্ধ, ছাদের এক কোণে একদল নাচনী সোনার ঘুঙুর এ-ওর পায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রণমল্লের দূত এসে উপস্থিত—রুপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল হাতে।

মাড়োয়ারের দূত বেশ একটু মোটা; তার উপর এগারোগাজি থানের প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি বেঁধেছেন আর তাঁর আগে-আগে পেটটি এগিয়ে চলেছে। দূতকে দেখে লখারানা অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন, কিন্তু এই মানুষ-লাটিমকে নিয়ে একটু মসকরা করবার লোভ তিনি আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না।

রানা দূতের হাত থেকে রুপোয় মোড়া নারকেলটি নিজেই নিয়ে বলছেন, 'বা, বেশ তো, এটা বুঝি তোমার রাজা এই বুড়ো বয়সে আমার খেলার জন্যে পাঠিয়েছেন?'

দূতের বলা উচিত ছিল—আজ্ঞে না, এটি রাজকুমার চন্ডের জন্যে কেননা তাঁরই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছি, আপনার মতো পাকা দাড়ির খেলার জিনিস এটি নয়—কিন্তু রানার ভাবগতিক দেখে দূতের মুখে আর কথা সরছে না। এদিকে সভাসুদ্ধ মুখ টিপে হাসছে, ওদিকে লজ্জায় রাজকুমার চণ্ডের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূত তখন বিষম সমস্যায় পড়ে বলছেন, 'মহারানা বড় সুখের কথা যে আপনি নিজেই আমাদের রাজকুমারীকে চাইলেন, আমাদের দেশের রাজা গরিব, তাঁর এতদূর সাহস কেমন করে হবে যে বিয়ের সম্বন্ধ করে মহারানাকে নারকেল পাঠাবেন? তিনি চেয়েছিলেন রাজকুমারকে জামাই করতে, কিন্তু কি আশ্চর্য যা আশা করেননি তাই ঘটল! মহারানার যদি হুকুম হয় তবে আমি আমার রাজাকে গিয়ে এই সুখের খবর এখন পাঠিয়ে দিই'—বলেই দূত উঠতে যান—রানা তখন কি জবাব দেন, তাড়াতাড়ি দূতের হাত ধরে বললেন, 'বোসো, আমি তামাশা করছিলাম, ডাক কুমার বাহাদুরকে—' কুমার তখন সভা ছেড়ে উঠে গেছেন। রানার দূত চণ্ডের কাছে ছুটল কিন্তু চণ্ড বলে পাঠালেন—মহারানা তামাশা করেও যে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তিনি আজ থেকে আমার মায়ের তুল্য, আমি কিছুতেই তাঁকে বিয়ে করব না।

বুড়ো রানা বড়ই বিপদে পড়লেন। কি আশ্চর্য, ছেলেটা তামাশা বোঝে না! লোকের পর লোক রাজকুমারকে বোঝাতে ছুটল কিন্তু চণ্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। রানা নিজের কথার ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়লেন। এবারের তামাশা যে জাদুকরের আমগাছের মতো দেখতে-দেখতে এমন সত্যি হয়ে উঠবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি; বিয়ে করতে দুঃখ নেই কিন্তু তামাশাটা যে দূতকে ছেড়ে উলটে তাঁকে নিয়েই শুরু হল এইটেতেই তাঁর আপত্তি।

অনেক বোঝানোর পরেও যখন চণ্ড বিয়ে করতে রাজি হলেন না, তখন রাগে বুড়ো রানা পাকা দাড়িতে মোচড় দিয়ে বললেন, 'দেখ চণ্ড তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখ, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলেম, এবার আমার যে ছেলে হবে তাকেই আমি সিংহাসন দেব, সে-ই হবে রানা, আর তোমাকে তার একজন সামন্ত হয়ে থাকতে হবে।' চণ্ড একলিঙ্গ মহাদেবের নামে শপথ করে বললেন, 'তাই হবে!' সভাসুদ্ধ লোক চুপ হয়ে রইল। মাড়োয়ারের দূত রানার বিয়ের হুকুম নিয়ে বিদায় হল।

বুড়ো বয়সে বর সেজে যে তামাশা দেখাতে হল সেটা লখারানার বড়ই বাজল। তিনি চণ্ডকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। বিয়ের দু বছর পারে দু মাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কম্বল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন—কবে কোনখানে জীবনের বিষম তামাশার থেকে তাঁর নিষ্কৃতি হল তা জানা গেল না।

মকুল তখন ভারি ছোট, নেহাত কচি—কাজেই রাজার যা কিছু কাজ সবই চণ্ডকে করতে হয়, রাজা না হয়েও তিনি রাজা। দেশের লোকের মুখে চণ্ডের সুখ্যাতি আর ধরে না। চণ্ডকে তারা যেমন ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে, ভালোওবাসে এটা কিন্তু মকুলের মায়ের আর যত মাড়োয়ারী মামার দলের প্রাণে সয় না। চণ্ড কাউকে কিছু বলেন না—কিন্তু বোঝেন তাঁর আর বেশি দিন এ রাজ্যে থাকা চলবে না। এই যে রাজবাড়ি যেখানে চণ্ড মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন, বাপের আদরে বেড়ে উঠেছেন, এখানে তাঁর আপনার বলতে আজ কে আছে? পুরনো চাকর যারা ছিল মহারানী তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশ থেকে যত মাড়োয়ারী এনে কাজে রেখেছেন। তাঁর নিজের যে মহল সেখানে রানীর ভাইরা এসে ঢুকছেন, তাঁর যে সোনা-রুপোর খাট-বিছানা আসবাবপত্র সবই এখন মকুলের, রাজবাড়িতে নিজের বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর তলোয়ার! কিন্তু মকুল সেই হাসিমুখ ছোট ভাই মুকুল—যে এখনো চলতে শেখেনি, বলতে শেখেনি, সে কি তাঁর আপনার নয়? সকালে সন্ধ্যায় রাজসভাতে নিয়ে যাবার সময় সে যখন তার ছোট দুটি হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি আর চণ্ডের কোনো দুঃখ মনে থাকে? চণ্ড কত বার মনে করেছেন চলে যাই, কিন্তু এই ছোট ভায়ের ছোট হাতের বাঁধন—তাঁর সব দুঃখের উপরে কচি দুখানি হাতের পরশ—একে ছেড়ে যাওয়া, একে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া চণ্ডের আর হয়ে ওঠে না! তিনি বছরের পর বছর সব দুঃখ সয়ে এই ছোট ভাই মকুলকে একদিন মেবারের রাজসিংহাসনে বসাবার মতো উপযুক্ত করে, মানুষ করে তুলতে লাগলেন। দারুণ গরমের দিনে সকাল-সকাল সভা ভঙ্গ করে মকুলকে দিয়ে চণ্ড খোলা ময়দানে গোলা খেলা করতে যান, চণ্ড চড়েন এক ঘোড়ায় আর এক টাট্টুতে মকুল—মাথার উপরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, কোথাও একটু ছায়া নেই, এরি মাঝে দুই ভায়ের ঘোড়া বিদ্যুতের মতো গোলার পিছনে-পিছনে ছুটে-ছুটে চলেছে, মুখে চোখে আগুনের মতো বাতাস লাগছে, দুই ভায়ের মুখ রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে সূর্যের তাপে। আবার হয়তো কোনো দিন ঘোরতর মেঘ করে ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে—চণ্ড চলেছেন মকুলকে নিয়ে শিকারে—কাদা ভাঙতে ভাঙতে, জলে ভিজতে ভিজতে থৈ-থৈ করছে, নদীর জল, সাঁতার দিয়ে তা পেরিয়ে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি জঙ্গল আর জলার মাঝে। শীতের দিনে তাঁদের খেলা পাহাড়ে-পাহাড়ে, সেখানে বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে। এমনি করে মকুল মানুষ হচ্ছেন, দিন-দিন শক্ত হচ্ছেন, তাঁর খাওয়া পরা খেলাধুলা রাজার ছেলে বলে কিছু যে আরামের ছিল তা নয়—চণ্ড মেবারের একজন সামান্য রাজপুতের ছেলের সঙ্গে যে একদিন মেবারের সর্বময় কর্তা হবে তার কোনো বিষয়ে কিছু তফাৎ রাখলেন না, এমনি করে লখারানা চণ্ডকে মানুষ করেছিলেন, আর ঠিক তেমনি কন্দের চণ্ড তাঁর ছোট ভাইকে সিংহাসনের উপযুক্ত হবার, আপদে-বিপদে দুঃখ-কষ্টে বীরের মতো নির্ভয়ে থাকবার জন্যে ছোটবেলা থেকেই তৈরি করছেন। এটা কিন্তু মকুলের মায়ের ভালো লাগে না; তিনি চান গরমে মকুল পাখার বাতাসে, বাদলে ছাতার তলায় শীতে লেপ-তোষকের মধ্যে থেকে মোমের পুতুলটির মতো গোলগাল মোটাসোটা হয়ে উঠুক। এর জন্য মকুলকে আর কখনো কখনো চণ্ডকেও মহারানীর কাছে গঞ্জনা সইতে হয়। মকুল সে ছেলে মানুষ, মায়ের ধমকে কখনো রাগ করে, কখনো খানিক কাঁদে আবার একটু পুরেই সব ভুলে যায়—চণ্ডের প্রাণে

কিন্তু রানীর বাক্যবাণ তীরের মতো গিয়ে বাজে।

এক-একদিন তিনি আপনার খুব প্রাণের যাঁরা বন্ধু বুড়ো-বুড়ো সর্দার তাঁদের কাছে বলেন—'আর না, এখানে আর থাকা চলে না। সবাই বলে আমি আমার ভাইকে বশ করে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি; সে যখন আমার হুকুমে ওঠে-বসে,তখন আমিই হলেম সত্যি রাজা আর সে একটা সাক্ষিগোপাল—নামে মাত্র মেবারের রাজা। আপনারা আমায় ছুটি দিন, আমি অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকি!' বুড়ো সর্দারেরা বলেন, 'এখনো সময় হয়নি, যুবরাজ, আরো কিছু দিন থাক, মকুল আর একটু উপযুক্ত হয়ে উঠুক।'

চণ্ড চান কোনো সর্দারের হাতে মকুলকে মানুষ করবার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু কোনো সর্দার সে ভার নিতে চাইলে তবে তো! তাঁরা কেবলই বলেন—আমরা মকুলের জন্য সব করতে প্রস্তুত কিন্তু যুবরাজ, তবু আমরা পর মাত্র, আপনি তার ভাই। চণ্ড আর কোনো জবাব দিতে পারেন না। বাপ থাকলে কেউ তো চণ্ডকে মকুলের জন্য কষ্ট নিতে বলত না; কিন্তু এখন ভাই যদি তাকে না দেখে তবে মকুলকে রাজা হবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলে কে?

এমনি করে দিন কাটছে, ইতিমধ্যে একদিন—কাল বৈশাখের রাত দুপুরে অন্ধকার দিয়ে বড়-বড় শাদা মেঘ একখানার পর একখানা আস্তে-আস্তে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বড়-বড় পাল তুলে আকাশের এপার থেকে ওপারে, অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে একটির পর একটি নৌকা। একটি তারা নেই, একটু শব্দ নেই। চণ্ড সারাদিনের কাজ সেরে সেই দিকে চেয়ে আছেন ঘরের আলো নিবিয়ে একলাটি, রাজবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, কেবল চণ্ড জেগে একা। আজ চণ্ডের বুকের ভিতরে একটা বেদনা থেকে-থেকে দুই পাঁজরের হাড়গুলো মোচড় দিয়ে-দিয়ে যেন ভাঙতে চেষ্টা করছে! ব্যথা যে কিসের, বেদনা যে কতটা, চণ্ড তা বুঝতে পারছেন না; তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে মকুলকে একবার কাছে ডাকি কিন্তু উঠতেও পারছেন না, ডাকতেও পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যে একলাটি চুপ করে পড়ে রয়েছেন। চণ্ডের দেহ-মন সমস্ত অসাড় হয়ে মরে গেছে, কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলোটুকু টেনে নিয়ে প্রহরের পর প্রহর বর্ষা রাতের অন্ধকারে কি যেন সন্ধান করে ফিরছে। একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ! চণ্ড দেখেছেন, সে কিবা চোখ জুড়োনো শান্ত রূপ—যেন তাঁর মা! চণ্ড সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধানে, তাঁর মরা মায়ের সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন; তাঁর বুকের বেদনা, টানা-তার ছেড়ে দিলে যেমন, তেমনি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। সেই সারারাতে বাদল দিয়ে ধোয়া মেঘ, সেই মায়ের চোখের জলে জলভরা সেই সকালের মেঘ, তারই দিকে চেয়ে চণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে বেলা হয়েছে। রাজসভায় যাবার ঘণ্টা পড়েছে—মহারানী মকুলকে সাজগোজ করিয়ে বসে রয়েছেন এমন সময় মকুলের দাই এসে বললে, ‘রানীমা, আজ সভা বসবে না। বড়কুমার চণ্ডের শরীর খারাপ হয়েছে।’ সেখানে মহারানীর বাপ রণমল্ল বসেছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, কেন, বড়কুমার নইলে রাজসভা বন্ধ থাকবে, রানা মকুল কি কেউ নয়? দাই সে অনেকদিনের চণ্ডকেও সে মানুষ করেছে—রণমল্লের কথায় কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, রানী তাকে ধমকে বললেন, ‘যা, তোর তকরার করতে হবে না। বাবা এখুনি মকুলকে নিয়ে সভায় যাচ্ছেন; তুই সর্দারদের বসতে বলগে যা।’

মেবারের সিংহাসনে সেই দিন সূর্যবংশের কেউ না বসে, বসল কিনা পেটমোটা মাড়োয়ারী রণমল্ল নাতি মকুলকে কোলে নিয়ে! লজ্জায় সর্দারের মুখ লাল হয়ে উঠল। সেই সময় চণ্ড হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন আকাশে গ্রহণ লেগেছে, সূর্য একখানা কলঙ্ক-ধরা তামার থালার মতো দেখা যাচ্ছে, আর সেই বুড়ি দাই তাঁর পায়ের তলায় বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সেদিন সভাভঙ্গের পর বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ আঁধার করে রাজপুত সর্দারেরা যখন চণ্ডের কাছে এসে উপস্থিত, তখন চণ্ড তাঁদের হাত ধরে অনুরোধ করে বললেন, ‘দেখুন, মহারানীমা-র ইচ্ছা নয় যে আমি আর মেবারের কোনো রাজকার্য চালাই, কাল রাত্রে একথা মহারানীমা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আজ সকালে তাঁরই হুকুমে মাড়োয়ারের রাজা রণমল্ল মকুলের দেখশোনার ভার নিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যের কাজ তিনি চালাবেন, আমার এখন ছুটি। মায়ের আদেশ আজ সকালে আমার কাছে পৌঁচেছে, মকুলকে আর এই বাপ্পার সিংহাসন আপনাদের জিম্মায় রেখে আমি এখনি বিদায় হব, আমার ঘোড়া প্রস্তুত।

বুকের ভিতর কি বেদনা নিয়ে চণ্ড যে সারারাত কাটিয়েছেন তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না, তাঁরা কোনো কথা না কয়ে চণ্ডকে প্রণাম করে বিদায় হলেন।

চণ্ড তখন তাঁর দাই-মাকে কাছে ডেকে চুপি-চুপি বললেন, ‘মকুলের যাতে ভালো হয়, তার কোনো বিপদ না ঘটে দেখবে; আমার ছোট ভাই রঘুদেও কৈলোরে আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে মাণ্ডুর রাজার কাছে চললেম। মহারানীকে বলবে যদি কোনো দিন কোনো বিপদ আসে, রাজ্যে যদি কোনো গোলমাল হয় তবে আমি কাছেই রইলেম, আমাকে ডেকে পাঠালেই আবার আসব, আমার তলোয়ার মকুলের শত্রুর জন্যে আর মেবারের জন্যে আমার প্রাণ। দাই-মা, এরা কি যাবার আগে মকুলকে একবার দেখতে দেবে না।’

দাই ঘাড় নেড়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল; চণ্ড বুঝলেন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই; তিনি একটি কথা না কয়ে যেমন সাজে ছিলেন তেমনি, কেবল তালোয়ারখানা কোমরে বেঁধে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন—তখন মাথার উপরে দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মকুল যখন শিকার খেলতে যাবার সময় তার দাদাকে খুঁজতে লাগল, তখন রানী বললেন, ‘তোর দাদাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, সে আর আসবে না।’

সারাদিন মকুলের চোখ ছল-ছল করতে লাগল, সে শূন্য রাজপুরীতে কোথাও তার দাদাকে খুঁজে পেল না। রাত্রে যখন সবাই শুয়েছে তখন মকুল তার দাই-মা'র গলা জড়িয়ে

বললে, 'যে বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড় হয়ে নিশ্চয় মারব, তলোয়ারের এক কোপে তার মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেব, কেমন?'

দাই বললেন, 'রানাসাহেব, আমি সেই বাঘটা ধরবার একটা দড়ির শক্ত ফাঁদ কালই বানিয়ে রাখছি—বাঘটাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না।'

মকুল খানিক চুপ করে বললেন, 'দাই-মা, বাঘটা দেখতে কেমন? আমি তো বাঘ দেখিনি, তাকে চিনতে পারব তো?'

'ঠিক চিনতে পারবে, নয়তো আমি চিনিয়ে দেব। তোমার ওই মাড়োয়ারী দাদামশায়ের মতো তার পেটটা মোটা আর ঠিক এমনি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফও আছে।'

তার পরদিন সকালে যখন দাই মকুলকে সাজ পরিয়ে রাজসভায় তার বুড়ো দাদার কাছে দিতে গেল তখন রণমল্ল পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে চোখ পাকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'দাই, বাঘ ধরবার ফাঁদ তৈরি করতে সময় লাগবে, সেজন্যে আজ থেকে তোমায় ছুটি দিলেম। আমার দেশের এক ভালো দাই সে-ই রানীর কাজ করবে, তুমি বসে-বসে ফাঁদ বাঁধো গিয়ে জঙ্গলে।' দাই 'যো হুকুম' বলে খুব একটা বড় সেলাম রণমল্লকে দিয়ে মকুলকে বললে 'রানাসাহেব, বাঘটাকে চিনে রেখ—ঠিক তোমার বুড়ো দাদার মতো গোঁফ-দাড়ি, ওমনি মোটা পেট আর বড়ো-বড়ো দাঁত।' সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসতে লাগল। মকুল দুই চোখে একটা ভয় নিয়ে রণমল্লের দিকে চেয়ে এক দৌড়ে দাইয়ের কোলে গিয়ে উঠল।

দাই তার মুখে চুমু খেয়ে বললে, 'বেটা ডরো মাৎ, সেরকো দেখ ভাগনা কভি নেহি, মার তলোয়ার কী চোট, কাট লে শির।' সভাসুদ্ধ লোকের মুখে হাসি চাপা থাকে না দেখে রণমল্ল কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে দাইয়ের পিঠ চাপড়ে তার হাতে এক জোড়া সোনার বালা দিয়ে বললেন, 'ভালো-ভালো, আমি খুব খুশি হলেম, এমনি করে মকুলকে সাহস দিয়ে এখন থেকে বাঘ শিকারে মজবুৎ করে তোল; আজ থেকে তোমার তলব আরো দশ-তনখা বাড়িয়ে দেওয়া গেল, মকুলজী বড় হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার তদারক করবে।' সভাসুদ্ধ লোক বুঝলে রণমল্লকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যাঁরা রানীর খাতিরে রণমল্লকে ভয় করে একটি কথাও কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে-মনে তার সাহসের জন্যে তারিফ না করে থাকতে পারলেন না। রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট করে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোট ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব—রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটখাটো পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা—সে যেন ছোট-বড় সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজতো। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না—এমন কি যে মহারানী চণ্ডকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, প্রাণে ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

আর মকুল—সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানের ফল পেড়ে বনভোজন,

গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোট-ছোট ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ায় বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গান শেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনো ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দার কাছে যাবার জন্যে রোজ কাঁদছে, রানীর ইচ্ছে, তাকে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলই বাধা দিচ্ছেন। রানী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনবার কথা বললেন কিন্তু তাতেও আপত্তি। শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই বলে দিলেন, যে তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা কিংবা তাঁকে এখানে আনানো হতে পারবে না—রানীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর কোনো হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ির চারখানা দেয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল দুজনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এলো রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন; দেশের লোক হাহাকার করে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তাঁর মূর্তি ঘরে-ঘরে রেখে পুজো করছে আর মাড়োয়ারী শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর বলে অভিসম্পাত দিচ্ছে। বুড়ি দাই রানীকে এসে বললে, 'এখনও যদি ভালো চাও তো চণ্ডজীকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোন দিন রঘুদেওজীর মতো হবে।'

কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে; তার চর রানীর অন্দরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারদের বাসায়-বাসায়, গ্রামে-গ্রামে, প্রজাদের ঘরে-ঘরে পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কি করছে, কি বলছে, সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারী রাজা রণমল্ল ডাকাতদের সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে-ফাটকে কেল্লার বুরুজে-বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। রাগে ভয়ে দুঃখে রানী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কি ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। রানী বুড়ি দাই-এর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'হায়, আমার কি হবে?' যে রানী একদিন তাকে দুর-দুর করে তাড়িয়েছিলেন আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ির চোখে জল এল। সে রানীকে শান্ত করে বললে, 'আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; কিন্তু রানীমা, তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথা কেউ না জানতে পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড় বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতর এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।'

রানীর সঙ্গে কথা ঠিক করে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা সন্ধ্যেবেলা একটা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গের্দা ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুনে-গুনে চটের থলিতে ভরে-ভরে রাখছেন ঠিক বড়বাজারের মাড়োয়ারী এক-একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আস্তে-আস্তে এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো দুই থাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,'তবে—অসময়ে কি মনে করে?'

'আজ্ঞে, একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।'

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই রণমল্লের ভয়ে সারা কিন্তু রণমল্ল কাঁপেন দাইয়ের ভয়ে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি দাইকে বললেন, 'না, না, আগে তোমার কাজটাই সেরে নিই।'

দাই তখন বললে, 'আজ্ঞে মকুলজীর একটু ফরমাস আছে, তাঁর কবুতর পালবার শখ হয়েছে, তাই হুজুরের কাছে দরবার করতে এসেছি।'

"মকুলজীর পায়রা ওড়াবেন" বলেই বুড়ো হোঃ হোঃ করে খানিক হেসে বললেন—'তা ভালো, এসব শখ ভালো—পায়রা ওড়ান, ছাগল পালুন এতে আমার আপত্তি নেই; ঘোড়া চড়া, তলোয়ার খেলা এগুলো ছাড়লেই বাঁচি, রাজার ছেলে ও-সব কেন? খান-দান ঘুড়ি ওড়ান, সুখে থাকুন আর'—দাই বলে উঠল—'আর রাজার ছেলের দাদামশায় বুড়ো মাড়োয়ারী সিংহাসনে বসে কেবল মোহরের তোড়া বাঁধুন?'

'ঠিক বলেছ দাই, আমি তোমার উপর খুশি আছি; মকুলকে তুমি এরকম পায়রা আর ঘুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ আর দুটো বছর, তারপর দেখা যাবে সিংহাসন আমার কাছ থেকে কেমন করে এরা কেড়ে নেয়! এই নাও'—বলেই একটা মোহর বুড়ো অনেক কষ্টে থলি থেকে বের করে দাইয়ের হাতে দিতে গেলেন।

দাই হাত জোড় করে বললে, 'আপনার মোহর আপনার কাছেই থাক, মকুলজীর কবুতর কেনবার পয়সার অভাব নেই।'

হ্যাঁ, তা কি আর আমি জানিনে! তার মায়ের হাতে অনেক টাকা আছে, তা যাও তোমারই তবে কবুতর জোড়ার দাম দিও। প্রজাদের খাজনা অনেক বাকি পড়েছে, এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নেই—বলেই বুড়ো আবার টাকা গুনতে লাগলেন। দাই একটা মস্ত সেলাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

কেল্লার ছাদের এক কোণে পাথরের একটা টানা বারান্দার কার্নিস খানিক ছায়া ফেলেছে, তারই তলায় একটি বাঁশের খাঁচায় দুটি পায়রা সকাল বেলার দিকে চেয়ে গলা ফুলিয়ে চুপটি করে বসে আছে, এখনি মকুল এসে খাঁচাটি খুলে আকাশের আলোর মাঝে তাদের ছেড়ে দেবে এই আনন্দে তাদের শাদা রঙের ডানা দুখানি থেকে-থেকে উল্‌সে উঠছে এমন সময় মহারানীর সঙ্গে দাই এসে পায়রা দুটির ডানার নিচে দুখানি ছোট চিঠি বেঁধে দিয়ে আস্তে-আস্তে আবার খাঁচার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তখনো সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েনি, রাজকুমার মকুল নরম বালিসের উপরে মাথাটি রেখে একটি হাত পুবের জানালার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মুঠোয় এক টুকরো কাগজ ধরে। রানী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে করে দাইয়ের কাছে দিয়ে বললেন, 'তুই এখানো ঘুমচ্ছিস? বেলা হয়েছে, কখন আর তোর দাদার কাছে পায়রার গলায় বেঁধে চিঠি পাঠাবি?' মকুল কোনো কথা না বলে দাইকে টানতে-টানতে এক ছুটে ছাদে এসে উপস্থিত হল। দাই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'কই, মকুলজী তুমি যে বলেছিলে চিঠটা লিখে রাখবে, তা কই?' মকুল হাতের মুঠো খুলে দেখালে সেই হিজি-বিজি লেখা কাগজখানি। দাই কাগজটি এপিঠ-ওপিঠ উলটে-পালটে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, চিঠঠি পড় তো শুনি কুমার সাহেব, কি লিখেছ।' মকুল জানত কেমন করে চিঠি পড়তে হয়, তাই সে গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করল।

দাদা, আমি তোমার ছোট ভাই, তোমর জন্য কাঁদছি, একবার এস, খুব খেলা হবে; কবুতর দুটো চিঠি নিয়ে যাচ্ছে জবাব দিও। এদের ছানা হলে তোমায় একটা দেব। আমি খুব ভালো আছি। ইতি—

মকুল

তোমার ছোট ভাহ

পুঃ—মা আর দাই তোমার জন্য খালি কাঁদে।

'চিঠি যেমন হতে হয়'—বলে দাই কাগজখানা নিয়ে বেশ করে মুড়ে বললে, 'তবে এখন কোন দাদাকে চিঠিখানা পাঠাতে চাও বল।' এইবার মকুল মুশকিলে পড়ল, বড়দাদা আর ছোটদাদা দুই দাদার মধ্যে বেছে নেওয়া তার পক্ষে শক্ত হল, দুইজনকেই সে সমান ভালোবাসে, দুইজনকেই সে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতে চায়; কিন্তু হায়, চিঠি তার একখানি বৈ নেই! ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, তখন রানী আস্তে আস্তে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এক কাজ কর, আধখানা চিঠি বড়দাদাকে আর আধখানা ছোড়দাদাকে পাঠিয়ে দে।' তাই হল। প্রথম টুকরো ছোড়দাদার আর বাকিটুকু বড়দাদার জন্যে ছিঁড়ে মকুল দাইয়ের হাতে দিল।

শাদা ডানা দুই পায়রা সেই দু-টুকরো কাগজ গলায় বেঁধে আকাশে উড়ল, ডানার তলায় লুকানো রইল তাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে চণ্ডের কাছে রানী আর দাইয়ের দুখানি চিঠি। সোনামাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দুটি পাখি ছোট-বড় দুজনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দুজোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে শাদা পালে হাওয়ার মতো। চিতোরের কেল্লায় বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনায় মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোলা অন্ধকার আকাশ পার হয়ে যেদিন মাণ্ডুর কেল্লায় চণ্ডের কাছে এসে পৌঁছল, সেদিন চণ্ড সব দুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোণে-রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ তিনদিন ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় রাজস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে—তারই মধ্যে থেকে এক-একবার সকাল সন্ধ্যায় সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন রক্তমূর্তি! চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ তারা চণ্ডের হুকুম নিয়ে চিতোরে আবার ফিরছে ঝড়-জল বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে।

চিতোর থেকে খানিকটা দুরে গো-সুন্দ নগর, পাহাড়ের উপর একটা মজবুত কেল্লা আর তাকেই ঘিরে ছোট-ছোট বাড়ি, পাহাড়ের নিচে অনেকখানি ঘন বন, তার মধ্যে দিয়ে ছোট-ছোট নদী বয়ে চলেছে, এই বনে চণ্ড তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে রইলেন। কথা ঠিক হল যে, মহারানী সুন্দেশ্বরীর পুজো দেবার ছল করে মকুলজীকে নিয়ে এইখানে এসে দেওয়ালীর দিন চণ্ডের সঙ্গে মিলবেন।

এদিকে চণ্ডের অনুচর যত ভীল মেবারের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে রটিয়ে দিয়েছে—রণমল্ল মকুলজীকে মেরে ফেলেছে। লোকে সব গ্রামে-গ্রামে মাঠে-ঘাটে এই সব গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে—যদি একথা সত্যি হয় তবে পেটমোটা মাড়োয়ারের রাজা রণমল্লকে আর আস্ত রাখবে না। রণমল্ল এই

খবর পেয়ে ভয়ে কাঁপছেন, কি উপায় করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সেই সময় একদিন দাই এসে তাঁকে বললে, 'হুজুরের মেজাজ ভালো বোধ হচ্ছে না, একটা খবর শুনে আমারও ভয়ে গা কাঁপছে, শুনেছেন দেশের লোক তাদের রানা মকুলকে দেখবার জন্যে লাঠি-সোটা নিয়ে এই দিকে আসছে।' রণমল্ল খবরটা খুব ভালো করেই শুনেছিলেন তবু দাইকে ধমকে বললেন, 'যাও-যাও, মাড়োয়ারের রাজা আর মেবারের এখনকার সর্বেসর্বা দু-দশগাছা লাঠির ভয়ে কাঁপে না, আর কিছু খবর থাকে তো বল!'

দাই তখন চুপি-চুপি বললে, 'এবারে যে দল আসছে বড় শক্ত দল, মেবারের রাজপুতকে আপনি চেনেন না, এই বেলা যা হয় উপায় করুন।'

রণমল্ল মনে ভয় কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'কি উপায় করতে হবে শুনি।'

দাই বললে, 'মকুলজীকে একবার গ্রামে-গ্রামে শিকার খেলার জন্যে পাঠিয়ে দিন। লোকে দেখুক তাদের রানা বেশ সুখে বেঁচে আছে আর খেলে বেড়াচ্ছে। তাহলেই তারা ঠাণ্ডা হবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

রণমল্ল খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'মন্দ পরামর্শ নয়, কিন্তু হাতিয়ার বেঁধে গ্রামে-গ্রামে শিকার খেলে বেড়ানো তো হতে পারে না, শিকার থেকে লড়াই বাধতে কতক্ষণ?। অন্য কিছু উপায় থাকে তো বল।

'তবে রানীমা আর মকুলজীকে পালকি চড়িয়ে গ্রামে-গ্রামে দেবতাদের পুজো দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিন, কাজ একই হবে।' এ পরামর্শটা রণমল্লের মনোমতো হল, দাই রানীকে আর মকুলজীকে পালকিতে চড়িয়ে চিতোরের কেল্লা পার করে দিয়ে এল। যাবার সময় মকুল বললে, 'দাই মা, তুমি যাবে না?'

'না জী, বাঘ ধরবার সেই ফাঁদটা শেষ করে তবে আমি তোমার কাছে যাব'—বলেই দাই চিতোরের কেল্লায় ফিরে এল।

গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর আজ ভারি ধুম, মহারানী রানাজীকে নিয়ে কেল্লায় এসেছেন, খুব ঘটা করে আজ সুন্দেশ্বরীর পুজো দেওয়া হবে। ঘরে-ঘরে আজ প্রজারা পিদিম জ্বালিয়েছে, রাস্তায়-রাস্তায় দোকানীরা ঝাড়-লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কোমল গোলাপ জলের পিচকিরি দিচ্ছে। শহরের ছেলেগুলো রাস্তার মাঝে তুবড়ি পুড়িয়ে ছুঁচো-বাজি ছেড়ে মকুলজীর সঙ্গে যে-সব ঘোড়সওয়ার এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হাউই উড়িয়ে চরকি ঘুরিয়ে ফুলঝুরি, রংমশাল, বোমা, দোদমা ভুঁইপটকা, চিনে-পটকা পুড়িয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া আর খুব খানিকটা আমোদ করে নিচ্ছে।

মকুলের আর আনন্দের সীমা নেই। এক সোনার সাজ-পরা কালো ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহরময় ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালীর আলো দেখে বেড়াচ্ছেন। আর রানীমা, কেল্লার ছাদে একলা, তিনি চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন, যত রাত বাড়ছে ততই তাঁর মনে হচ্ছে চণ্ড বুঝি এলেন না। আজ যে এই গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর রাতে তাঁর দলবল নিয়ে আসবার কথা, কিন্তু কই? দেখতে-দেখতে শহরে আলো নিবে এল; মকুল তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে কেল্লায় এলেন, কিন্তু চণ্ডের আসবার কোনো লক্ষণ নেই, এই রাতের মধ্যে তাঁদের চিতোরে ফিরতে হবে, আর তো সময় নেই, রানী অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন,

দুই চোখের জল তাঁর বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে সুন্দেশ্বরীর মন্দির থেকে ঢং-ঢং করে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ছে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে চিতোর যাবার জন্যে পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মকুল রানীকে ডাকছেন যাবার জন্যে কিন্তু রানীর পা আর উঠছে না, তাঁর বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে অন্ধকারে ঘণ্টা বাজছে এক দুই, তিন, চার। রাত দশটার ঘণ্টা বেজে থেমেছে— অন্ধকার আকাশ বাতাস তারই শব্দের নেশায় এখনো রী-রী করে কাঁপছে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের নিচে বনের মাঝ দিয়ে দশটা হাউই আগুনের সাপের মতো ফোঁস করে ফেণা ধরে আকাশে উঠে দপ্ করে আলোর ফুল হয়ে আকাশময় ছিটিয়ে পড়ল—আলোয় চারিদিক দিন হয়ে গেছে, শহরের লোক আশ্চর্য বাজি দেখতে হৈ-হৈ করে রাস্তায় ছাদে যে যেখানে পেরেছে বেরিয়ে এসেছে! রানী মকুলের হাত ধরে বললেন, 'সময় হয়েছে, আর দেরি না, চল।' মকুলের ইচ্ছা আরো খানিকটা ছাদে দাঁড়িয়ে বাজি দেখেন। কিন্তু রানী তাঁকে জোর করে ধরে পালকিতে ওঠালেন, আকাশের হাউই তাঁদের মাথার উপরে লাল আলোর পুষ্পবৃষ্টি করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! মকুল পালকি থেকে আবার কখন হাউই ওঠে দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়ে বসে রইলেন কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রইল।

মকুল রাত্রির মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে-থেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রানীর পালকি নির্জন মাঠের পথে আস্তে-আস্তে চলেছে, মাটির উপরে আটটা পালকি-বেয়ারার খসখস পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ রানীর কানে আসছে না। রানী অন্ধকারের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয়েছেন। একবার মনে হল যেন একদল লোক খুব দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল, একবার দেখলেন রাস্তার ধারে একজন কে বল্লম হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে—পালকি কাছে আসতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গো-সুন্দ নগরে সেই দশটার তারাবাজি দেখে রানী চণ্ড এসে পৌঁচেছেন বুঝেছিলেন, তারপর থেকে কিন্তু চণ্ডকে স্পষ্ট করে দেখা এখনো তাঁর ঘটে ওঠেনি। চণ্ড যে তাঁর কাছাকাছি আছেন, সেটা কেবল এই ছায়া-ছায়া রকম দেখেছিলেন!

রাত গভীর—পালকি চিতোরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, দূর থেকে কেল্লার দেয়াল আকাশের গায়ে কালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে রানীর পালকি কেল্লার ফটকের দিকে উঠে চলল কিন্তু তখনো চণ্ডের কোনো দেখা নেই। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কি তলোয়ারের ঝনঝন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। রানীর বুক কাঁপছে, তাঁর চোখের সামনে কেল্লার ফটকের বড় দরজা দুখানা আস্তে-আস্তে খুলে গেল যেন একটা রাক্ষস অন্ধকারে মুখটা হাঁ করলে। আস্তে আস্তে রানীর পালকি কেল্লার মধ্যে ঢুকল, রানী একবার পালকি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে পিছনের দিকে দেখলেন ফটকের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলে, তাদের সর্দার প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়ায়—মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কালো সাজ নিমেষের মধ্যে এই ছবিটা রানী দেখতে পেলেন; চণ্ডকে চিনতে তাঁর বাকি রইল না। তারপর "জয় মকুলজী কি জয়! জয় চণ্ডজী কি জয়!" শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে উঠল, অমনি চিতোরের ছোট-বড়ো ছেলে বুড়ো তলোয়ার খুলে রাজপথে রানীর পালকির চারিদিক ঘিরে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। যত মাড়োয়ারী, যারা এতদিন বুক ফুলিয়ে রাজাগিরি ফালাচ্ছিল, সব আজ চণ্ডের নাম শুনেই ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোলো, কারো এমন সাহস হল না যে রণমল্লকে

গিয়ে খবরটা দেয়। আর খবর দিয়েই বা কি হবে? দেওয়ালীর রাতে খুব করে সিদ্ধি খেয়ে রণমল্ল খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দাই একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে আচ্ছা করে বেঁধে ছাদের উপর থেকে তামাশা দেখতে গেল। রণমল্লের ভোজপুরী আর মাড়োয়ারী দারোয়ানগুলো ঢাল তরোয়াল বেঁধে তালপাতার সেপায়ের মতো কেবল হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, লড়াই দেবার আর সাধ্য হল না।

চণ্ড জোর করে তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোলমালে রণমল্ল জেগে উঠে দেখেন তাঁর চারিদিকে খোলা তলোয়ার, নিজের হাত-পা বাঁধা; তাঁর সাহসও ছিল জোরও ছিল। হাজার হোক তিনি মাড়োয়ারের রাজা, আর তলোয়ার দেখে তাঁর সিদ্ধির ঘোরও কেটে গেছে। তিনি পিঠে বাঁধা খাটিয়াখানাসুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডকে বললেন, "আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর দেখা যাবে কে জেতে কে হারে! তুমি বীর, রাজার ছেলে—আমিও একটা দেশের রাজা, আমাকে জানোয়ারের মতো বেঁধে মারা তোমার উচিৎ হয় না।"

চণ্ড রণমল্লের বাঁধন খোলবার জন্যে ঘরে ঢুকবেন এমন সময় দাই ছুটে এসে বললে, 'সাবধান, ওকে একা পুড়ে মরতে দাও, সরে যাও, না হলে সবাই মরবে।' দুম করে একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয়ে ঘরের কোণে একরাশ বারুদ জ্বলে উঠল, তারপর দাউ-দাউ করে ঘরখানায় আগুন লেগে গেল। ছুঁচো-বাজি দিয়ে ঘরখানা দাই যে কখন ভর্তি করে রেখেছিল কে জানে? ছুঁচোর মতো রণমল্ল পুড়ে মোলেন—'খুলে দে! খুলে দে!' বলে চিৎকার করতে-করতে যাকে রাজাবড়ির দাসী বলে তিনি ঠাউরে ছিলেন, তারই হাতের বাঁধা দড়ির বাঁধ শেষ পর্যন্ত আগুনের নাগপাশের মতো তাঁকে জড়িয়ে রইল।

কোথায় মেবার মাড়োয়ার দুটো দেশ রণমল্ল দখল করে বসবেন, না এখন তার মাড়োয়াররে সিংহাসনটা পর্যন্ত মেবারের রানার হাতে এল। তাঁর ছেলে যোধারাও বাপের সিংহাসন হারিয়ে এখন সামান্য গুটিকতক সেপাই নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে চলল, অনেক দুরে লুনী নদীর ও-পারে।

মহাবীর হারোয়া শংকল রাজর্ষি—লুনী নদীর ও-পারের সমস্ত পাহাড় নদী বন তাঁর রাজত্ব। তাঁর নামে সবাই মাথা নোয়ায় এমন লোক নেই। বিপদে যে পড়েছে তাকে উদ্ধার করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, অনাথকে আশ্রয় দেওয়ায়ই তাঁর কাজ, তাঁর যত অনুচর সবাই সন্ন্যাসী বীর, গাঁজাখোর নয়, কাজের মানুষ। কেউ কারুর উপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাদের হাতে নিস্তার নেই, বনের ভিতর পাহাড়ের গুহায় তাদের সব কেল্লা, সেখানে জালা–জালা টাকা পোঁতা আছে, লোকে চাইলে, সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের দুঃখ ঘোচায়। মাটির নিচে বড়-বড় ঘর, সেখানে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকোনো থাকে, কেউ বিপদে পরে তাদের কাছে এলে সেই অস্ত্র দিয়ে তারা সাহায্য করে, এমনি দলের রাজা তিনি হারোয়া শংকল। লুনী-নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যোধরাও রাত দুপুরে এসে তাঁরই আশ্রয় চাইলেন, যোধরাও জানতেন চণ্ডও ইচ্ছে করলে এখানে এসে গোলমাল করতে পারবেন না।

হারোয়া শংকল আদর করে যোধরাওকে বসালেন। তাঁর ছোট ঘর, রাজকুমারের সঙ্গে অনেক সেপাই, কাজেই সবাইকে গাছতলায় বসতে হল, সন্ন্যাসী রাজা একটু ভাবিত

হলেন এত রাত্রে এত লোকের খাবার কেমন করে যোগাবেন, লোকেরাও অনেক পথ চলে এসে খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে! রাজর্ষি তাঁর দলবলকে ডেকে সকলের আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, কিন্তু ঘরে তাঁর একটু খুদও নেই; সেদিনের যা-কিছু চাল ডাল সব তিনি অতিথিদের বিলিয়ে দিয়েছেন! বিপদে পড়ে চেলারা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে রাজর্ষি বললেন, 'অতিথিকে তো খেতে দিতে হবে, এস দেখি ঘরে কি আছে।' ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীদের কাপড় রাঙাবার জন্য এক রাশ মুঁজলতা বোঝা বাঁধা ছিল, রাজর্ষি সেইগুলি দেখিয়ে বললেন, 'যাও, এইগুলো রেঁধে আনো।'

রাঁধুনী এক সন্ন্যাসী, সে হেসে বললে, 'প্রভু এইবার অতিথি সেবার ঠিক বন্দোবস্ত করেছেন। যে মুখে ঠাকুরের ভোগ খাবে সেই মুখে কাল সকালে দেশে ফিরে কাউকে এবার আর ঠাকুরের অতিথি সেবার নিন্দে করতে হবে না, এইবার ঠিক হয়েছে!'

রাজর্ষি হেসে বললেন, 'আজ আমি নিজের হাতে রাঁধব, তোমাদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে, নিমন্ত্রণ করছি, সব চেলাদের ডাক দাও।'

গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু হল, রান্নার গন্ধে বন আমোদ করলে কিন্তু তরকারী দেখে অবধি চেলাদের আজ আর মোটেই খিদে নেই, যদিও সকালে এক-এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ-পর্যন্ত কারো পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু প্রভুর নিমন্ত্রণ কারো অগ্রাহ্য করার জো নেই। রান্না শেষ হলে সবাই অতিথিদের জন্যে পাতা পেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে যোধারাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা-আটার রুটি আর মুঁজলতার সেই তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন, কেবল সেই রাঁধুনি চেলাকে অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ আনতে পারলে না, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে জঙ্গলের কোনখানে যে লুকিয়ে রইল তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। খাওয়া শেষ হলে সবাই রাজর্ষির রাঁধা তরকারির সুখ্যাতি করতে-করতে যে যার জায়গায় শুতে গেল। মুঁজশাকের এমন যে রান্না হয় তারা কেউ জানত না, এবার থেকে রোজ এই তরকারি দিয়ে তারা রুটি খাবে এই সব বলাবলি করছে এমন সময় সেই রাঁধুনী এসে উপস্থিত! সবার মুখে তরকারির তারিফ শুনে তার আর আপসোসের সীমা রইল না। সে ভেবেছিল ওই রঙ করবার পাতাগুলো খেয়ে সবাই মাথা ঘুরে মরবে কিন্তু দেখলে সবাই দিব্যি পেট ভরিয়ে আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমতে লেগেছে, কেবল শীতের রাতে খিদের জ্বালায় সে-ই মরছে কেঁপে।

শীতের রাত-সহজে কাটতে চায় না, রাঁধুনী ঠাকুরটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে রাত পোহাল। সকালে উঠে সে একখানা কুড়ুল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োয়ারী সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা; পাহাড়ের ঝরনার ধারে সে হাত-মুখ ধুচ্চে, তার দাড়ি-গোঁফ সব লাল রঙের ছোপ-ধরা। কাল সন্ধ্যায় যার দাড়ি ছিল শাদা, আজ লাল হয়ে গেল। এ ব্যাপার দেখে রাঁধুনী ঠাকুরটি আর হাসি রাখতে পারলে না, হোঃ-হোঃ করে হাসতে-হাসতে সঙ্গীদের কাছে এই মজার খবরটা দিতে এসে দেখে, যত পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা ছিল তারা নিজের-নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আর এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে, সবার দাড়ি-গোঁফে লাল রঙের ছোপ। ইতিমধ্যে রাজর্ষি বেরিয়ে এলেন, তাঁর কিন্তু শাদা দাড়ি ধবধব করছে। মুঁজপাতার যে রঙ লেগেছে, এটা কারুর মনে এল না। দাড়িতে রক্ত কোথা থেকে লাগল এই ভেবে সবার যখন ভয়ে

মুখ শুকিয়ে এসেছে তখন রাজর্ষি সবাইকে অভয় দিলেন, 'নির্ভয়ে থাক, তোমাদের সুখের সূর্য উদয় হতে আর দেরি নেই; দেখ না এখনি তার রাঙা আলো তোমাদের মুখে এসে পড়েছে; এখন কিছুদিন এইখানে বিশ্রাম কর, তোমাদের রাজত্ব ফিরে পাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।'

সেইদিন কাঠ কেটে রাঁধুনী ঠাকুর রাজর্ষিকে আর এক বোঝা মুঁজপাতা এনে দিয়ে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে আজ একটু সেই তরকারি রেঁধে দিতে হবে।' রাজর্ষি হেসে বললেন, 'তোমার কালো দাড়িতে লাল রঙের ছোপ তো খুলবে না, আগে দাড়ি পাকুক তবে একদিন মুঁজশাকের চচ্চড়ির ছোপ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, আজ ভালো করে অন্য তরকারি দিয়ে অতিথি খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর।' রাঁধুনী ঠাকুরটি খেতে যেমন মজবুত রাঁধতেও তেমনি, আর রাজ্যের আজগুবি গল্প তার কাছে; যোধারাও আর তাঁর সঙ্গীদের বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল, বনে আছেন মনেই হত না।

এদিকে হারোয়া শংকলের হুকুম চণ্ডের কাছে পৌঁছল—যোধারাওকে যেন মাড়োয়ারের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে নেওয়া হয়—এর উপর কোনো কথা নেই। চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জজী আর কণ্ঠজী মাড়োয়ার শাসন করছিলেন। তাঁদের উপর হুকুম হল যে হারোয়া শংকল কিংবা তাঁর কোনো লোক যোধারাওকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্র মাড়োয়ারের সিংহাসন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হারোয়া শংকল দূতের মুখে এই খবর পেয়ে নিজেই যোধারাওকে সঙ্গে নিয়ে মেবারে চললেন। সেখান থেকে চণ্ডকে নিয়ে মাড়োয়ার যাবার কথা। ঠিক সময়ে সবাই মেবার পৌঁছে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যোধারাওর রাজত্বে মুন্দরের কেল্লার দিকে চললেন; যোধারাও তখন ছেলেমানুষ—একরাত্রে সবাই মাঠের মধ্যে তাঁবু গেড়ে আছেন এমন সময় একটা বুড়ো মাড়োয়ারী যোধারাওর কানে-কানে বললে, 'দেশে তো এসে পড়েছি, তবে এখন আর চুপ করে থাকা কেন? চলুন, আজ রাত্রেই গিয়ে কেল্লাটা দখল করে বসি, নিজের সিংহাসন পরের কাছ থেকে চেয়ে না নিয়ে জোরসে কেড়ে নেওয়াই ভালো, কি বলেন?' যোধারাও এ কথায় সায় দিলেন, আস্তে-আস্তে মাড়োয়ারী সৈন্য সব মুন্দরের দিকে বেরিয়ে গেল।

চণ্ড আর হারোয়া শংকল এ খবর কিছুই জানেন না, সকালবেলা শিবির থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দেখলেন দূর থেকে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে—তার মাথার পাগড়ী খোলা, বুকের কাপড়ে রক্তের দাগ। সওয়ার যখন ছুটে এসে চণ্ডের কাছে দাঁড়াল তখন চণ্ড তাঁকে নিজের ছেলে কণ্ঠজী বলে চিনতে পারলেন। হারোয়া শংকল তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন, অমনি কণ্ঠজীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। কে তাঁকে এমন করে মারল এই দেখবার জন্যে তাঁরা এদিক-ওদিক দেখছেন এমন সময় যোধারাও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো ক্ষমা করবেন। বাপের সিংহাসন আমি কারু কাছে ভিক্ষা বলে চেয়ে নিতে পারলুম না, নিজের জোরে ফৌজ পাঠিয়ে দখল করেছি, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডজীর হাতে আমার বাপ পশুর মতো মারা পড়েছে, তারই ধার তাঁর দুই ছেলেকে যুদ্ধে বীরের মতো মেরে শোধ দিলেম, এতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তো শাস্তি দিন।'

চণ্ডের মুখে কোনো কথা সরল না। হারোয়া শংকল খানিক ঘাড় হেঁট করে রইলেন, তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'যোধারাও ভুল করেছ, চণ্ডের কোনো দোষ ছিল না, তুমি

বালক বলে এবার তোমায় শাস্তি দিলেম না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আর এই মাটিতে যেখানে এই বীর কণ্ঠজী পড়ে রয়েছেন, এই পর্যন্ত মেবারের রাজ্যের সীমা ঠিক হল, এর পর থেকে তোমার রাজত্ব।'

চণ্ড চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যেখানে তাঁর কণ্ঠজীর প্রাণশূন্য দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠ জুড়ে সোনার ফুলের মতো আঁওলার কচি ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি হারোয়া শংকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়, যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, প্রভু আমাকে এখন আপনার সঙ্গী করে লুনী নদীর পারে তপোবনে আশ্রয় দিন।'

রাজর্ষি বললেন, 'তথাস্তু।'

রানা কুম্ভ

রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন—চাচা আর মৈর। যদিও দুজনে রাজার ছেলে, কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে; সেইজন্য রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো! মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি—মকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজী যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র করে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোনো গোলাই হত না; তা না, একদিন দুই খুড়োকে সাতশো করে সেপাইয়ের সর্দার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দুজনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্র আফিং খেয়ে ঝিমনো। হঠাৎ সর্দার বোনে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না-জানি কি বিপদেই পড়বেন—কোথায় থাকবে আফিং, কোথায় বা তামাক? দুধের পুরু সর রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না; উলটে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে! মাদোরিয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেক দিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশো সেপাইয়ের সর্দারের মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না।'

কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা ক্রমেই একটু কড়া-রকম হতে লাগল। এমন কি, আফিং খোর হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ করে ঝিমানো দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চালাবার অন্য উপায় ছিল না। কাজেই মনের রাগ তাদের মনেই জমা হতে লাগল! আর কোনো-কোনো দিন মুখ ফসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজীর আমোদ আরো বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা লখারানার মতো মকুলেরও কম ছিল না। একদিন দুই চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন যে বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন, নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনদিন বা তাঁকে হারাতে হয়! চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটল না। খুড়োদের ক্ষেপিয়ে তিনি

তামাশা করেই চললেন।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রের মধ্যে রাঙা ফুল এত ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে। মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব।'

মকুল তাঁর দই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'গাছটার নাম কি আপনারা জানেন চাচা?'

শাদা কথা। কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে, কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে পাওয়া সম্ভব—এইটেই রানা ইশারায় জানালেন। মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে! সেইদিন দুই বুড়ো মকুলের কাছে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন। রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, টাকা-কড়ি, লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া সব পড়ে রইল; কেবল একটি মা-হারা মেয়ে, যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন, তাকেই কোলে করে সেপাই সর্দার সবার মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন—একেবারে বন ছেড়ে।

দুই খুড়োর উপর কতটা অন্যায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন। মাপ চেয়ে দুই খুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুই খুড়ো আর ফিরলেন না! অনুতাপে মকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন। নিতান্ত ভালোমানুষ নিরুপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলি ব্যথা দিতে লাগল। তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন! সর্দারেরা রানার মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ সঙ্গে যেতে সাহস পেল না। সবাই তফাতে-তফাতে রইল। বনের তলায় আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এ-সময়ে যখন চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না ভেবে যখন সব সর্দার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সে সময়ে মনে হল যেন অনেকগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা ছুটে পালাল। তারপরই সর্দারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুই দিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালা জপ করছিলেন, এখনো তাঁর ডান-হাতের আগায় মালা জড়ানো। রানার মতো রানা ছিলেন মকুল—মেবারে হাহাকার পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, এ কাজ সেই দুটি খুড়োর না হয়ে যায় না। মাদোরিয়ার বনে বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার অসম্ভব বোধ হল।

পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেইখানে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন। ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের যোধারাও এসে মিলেছেন; গ্রামে-গ্রামে পরগণায়-পরগণায় তাঁদের লোক চাচা মৈর—দুই ভাইকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম চিতোর থেকে বহুদূরে। ক'ঘর ছুতোর-কামার, জনকতক জোতদার কিষান, বেশির ভাগই গরীব গুর্বো। চাচা আর মৈর দুজন সর্দার তাদের মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল করে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা তারা খুব খুশি হল। প্রথম-প্রথম দু-একবার তাদের

সবারই পালপার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সর্দার হাত গোটাতে লাগলেন। শেষে এমন দিন এল যে দুই সর্দারের কথা কেউ আর বড় একটা মুখেই আনত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লার দুই বুড়োর নামে নানা-রকম গুজব রটতে লাগল। কেউ বললে, তাদের অনেক টাকা; কেল্লার মধ্যে তারা সেই সব ধন -দৌলত এনে পুঁতে রেখেছে; রোজ তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে উঠছে সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, দুই সর্দার কেল্লার মধ্যেকার একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে দিল্লী যাওয়া-আসা করে, নবাবও মাঝে-মাঝে কেল্লায় এসে নাচ-তামাশা খাওয়া-দাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার সময় সারঙ্গীর আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন কামার কবে কেল্লায় দু-একটা মর্চে-ধরা দরজার খিল মেরামত করে এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে, দুই বুড়োতে একটা আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহাচুর ফেলছে, আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা রক্তে ভরা; দুটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবল মাটি শুঁকে-শুঁকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ঙ্কর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোক আনাগোনাই আর করত না, দিনে দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে থাকল, আর সন্ধ্যার সময় দেখতে লাগল—যেন কারা ঘোড়া পিঠে থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে—ঝম-ঝম।

দুই সর্দার মাসে-দুমাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়-চোপড় আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারা-গ্রাম হপ্তাখানেক ধরে সরগরম থাকে। সে নানা কথা—আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের, তার দামই কতই বা? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রীর গলায় হঠাৎ রুপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে দুটো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে বলে! এদিকে গ্রামের ঘরে-ঘরে এই চর্চা, ও দিকে পাহাড়ের উপরে দুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ, সেই ভাঙা কেল্লা সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন রাত ভরে রয়েছে।

তার হাতে লাগানো ফুলের লতা ভাঙা দেয়াল বেয়ে উঠে সকাল-সন্ধ্যায় ফুল ফোটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশ-ছাড়া এই দুটো বুড়োর জন্যে। একলা কেল্লায় এই তিনটি প্রাণী। আর আছে—এক পাহাড়ী কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দারোয়ান, সাস্ত্রী, পাহারা—অজানা লোক যে হঠাৎ কেল্লায় ঢুকবে, তার যো নেই! শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসড়া বেঁধে বাচ্চা নিয়ে থাকে, তেমনি শাদা-চুল দুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন—অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কি বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ওই বুড়ো

সর্দার দুটো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করেছে। মেয়ের বাপ পাগলের মতো হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেল্লার আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরিয়া তার ঐ কেল্লাতেই আছে। কেননা একদিন সকালে সত্যিই সে একটি মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেরে বেড়াতে দেখেছে—খুব দূর থেকে যদিও কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, 'যাও, রানা কুম্ভের কাছে নালিশ কর গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে ভয়ানক লোকদের হাতে পড়েছে, কুম্ভ ছাড়া কারো সাধ্যি নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।' বুড়ো দফাদার চলল। মরচে-ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে চলল সে।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিন-রাতের পথ তা কে জানে, দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে-ফিরে রাতকোটের কেল্লাটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় দফাদারের মুখে মেয়ে-চুরির খবর শুনে তিনজনেই বললে, 'চল, দফাদার-সাহেব, এর জন্যে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে সেই দুই বুড়োর দফা রফা করে আসছি, চল! শুনে দফাদার ঘাড় নেড়ে বলল, 'চেনো না সেই দুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ। মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা। যদি কেউ সে-কেল্লা মারতে পারে তো রানা কুম্ভ। পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে—রাস্তা নেই। বনে জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না; এমনি ভয়ানক পাহাড়ের চুড়োয় রাতকোটের কেল্লা। আর তারি মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক দুই বুড়ো বসে!' বলে দফাদার হাউমাউ করে মেয়ের জন্যে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব-ছোট যে সেপাই, সে বললে, 'ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এস।' ছোট সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই!'

ছোট সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুম্ভ নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান করে শাস্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, 'কেউ যদি কেল্লায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো দুটো তোমার মেয়েকে নিয়ে সেখানে গেল কোথা দিয়ে? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বললে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বললে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে এদিকে আসি? নিজেই গিয়ে বদমাস দুটোর মাথা কেটে আমার মেয়েকে—বলেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সেপাই তাকে ঠাণ্ডা করে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাই-বেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুম্ভ যখন উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে—আকাশে কালো মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে যে বুড়ো দুটি আছেন, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো—চাচা আর মৈর। রাগে কুম্ভ লাল হয়ে উঠে বললেন, 'চল আর দেরি নয়, এখনি সেই দুটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব!' রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া ছোটালেন দেখে সঙ্গের দুটো সেপাইও চলল—পিছনে। দফাদার অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে

হাঁ-করে চেয়ে থেকে 'পাগল! পাগল!' বলে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ-সোঁ ঝড় বইতে লাগল তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক-একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা—কালো অন্ধকারে একটা ঢেউ যেন আকাশ জুড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভিজে মাটিতে তিনটে ঘোড়ার পায়ের ছপ-ছপ শব্দ হতে থাকল। রানা বললেন, 'ঘোড়া এইখানে ছেড়ে পায়ে হেঁটে চল।' বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন!

এদিকে পাহাড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দুটি বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত-একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন; আর কেল্লার ফটকে সিংহের মতো কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙা দরজার চৌকাঠে মস্ত থাবা দুটো পেতে মুখটি বাড়িয়ে দুই কান খাড়া করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে—কেউ আসে কিনা! ভিজে বাতাসে শিকারী কুকুরের কাছে রাতে-ফোটা একটা বনফুলের গন্ধ ভেসে এল। তার পরেই কাদের পায়ের তলায় বনে কুটো-কাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল। কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে-আস্তে বার হল—জঙ্গলের পথে। বনের মধ্যে ভিজে পাহাড়ের তাত উঠছে। অন্ধকারে দু-চারটে জোনাকি পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে চুপটি করে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের শব্দ শুনে শিকারী কুকুরের চোখ দুটো জ্বলছে। কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারও কম সজাগ নেই—পাকা শিকারী পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চরণ, আর মাড়োয়ারের যোধারাও। জানোয়ারের চোখ জ্বলছে, কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির আলো বলে ভুল করলে না। রানার হাতের ছুরি সাঁ-করে গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুক ধুক করছে ঠিক যেখানে! শিকারীর ছুরিতে কেল্লার একটি মাত্র রক্ষক, দুটি বুড়ো, একটি কচি মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়—সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া মরল—একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে। সে যেন বলে গেল—'সাবধান।' ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ-ডাক ছেড়ে দিয়ে কুকুর স্তব্ধ হল! রানার বড় স্ফুর্তি হয়েছিল যে তিনি কেল্লা নেবার মুখেই একটা সিংহ শিকার করলেন। সঙ্গীরাও বললেন, 'রানা, এ বড় সুলক্ষণ।' কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চুড়োয় কেল্লার দিকে একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল। দেখলেন একটা কুকুর পড়ে আছে। তিনজন আস্তে-আস্তে আবার চললেন। মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন; তাঁর ছোট ভাই আর-এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমোচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে; 'আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোট। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে-কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে চললেন—এতটুকু ওকে বুকে করে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল, তুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি তার মনে আছে? মিছে চিতোরে যাওয়া! মা ঘাড় নাড়লেন; তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোট ঘরখানা, সেই সবুজ মাঠের ধারে, সেই মস্ত তেঁতুল তলার দিকে চেয়ে আমার মনটা

কেমন কেমন করতে লাগল। আমি কেবলি ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম! মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না—সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে, বরাবর সেই দিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে কোনো দিন গাছ তলায় কোনো দিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনো দিন কোনো গাঁয়ে আসি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই। কোনো দিন কিছু পাইও না, খাইও না! এইভাবে মা আমাদের চলেছেন—চিতোরের রানার দুঃখিনী কাটুকুড়োনি রানী! কতকাল পথে-পথে কাটল তার ঠিক নেই। সারা বর্ষা চলে গেল—ভিজতে-ভিজতে পথ চলতে-চলতে! শীত এল। মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের দুঃখিনী মা-রানী মা! আমি এক-একদিন বলতেম, মা, ঘরে চল! মা বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতেম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠাণ্ডা নীল ঢেউ! মা সেই নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক-একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ত। এমনি সে কত দিন, কত দূরে চলে একদিন আকাশে আজকেরই মতো বাদল লাগল, বাতাস বইল, বিদ্যুৎ চমকাল; মেঘের ছায়া পড়ে সামনের পাহাড় সেদিন যেন কালো হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে বোধ হল, মা আমার পথের ধারে চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা চেয়ে দেখ পাহাড়ের উপর কত বড় বাড়ি! মা একবার চোখ মেলে দেখে বললেন, ওই আমার ঘর! খানিক পরে আস্তে-আস্তে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, 'তারপর? কি হল?'

কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর দিলেন, 'তারপর আর কি? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে ডেকে নিলেন—নিজের ঘরে!'

'আর তোমাদের?' মেয়েটি শুধালো।

চাচা আস্তে বললেন, 'আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কত কাল কাটালেম সুখে-দুঃখে দুই ভাই একলা। অতবড় রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দুজনে একলা থাকি আর মায়ের জন্যে কাঁদি—'

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, 'রানার ঘরে মাকে পেলে না?'

চাচা ঘাড় নাড়লেন, 'না। কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন করে জানব? সে অনেক দিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন এক দিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব, এমন সময় দেখলেম, পথের ধারে মা আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব বলে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেক দিনের হারানো মাকে ফিরে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেম।

মেয়েটি শুধোলো, 'রানা আবার কাঠকুড়োনি রানীকে কেড়ে নিতে এলেন না?' চাচা, মৈর দুজনেই বলে উঠলেন, 'খুঁজে পেলে তো রানা?আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি, রানার সাধ্যি কি, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন?' গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে, 'আমাকে

একদিন তোমাদের মাকে দেখাবে?' চাচা আস্তে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আর একটু বড় হও, তারপরে সেই নিরালা ঘরে একটি পিদিম জ্বালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপি-চুপি চলে যাব।' মেয়েটি ঘুমের ঘোরে দরজার দিকে চেয়ে বললে, 'হিঙ্গুলিয়া?' চাচার ভাই আফিমের ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যা, হ্যাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।' যারা গল্প বলছিল, আর যারা শুনছিল, সবাই আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো-অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর-ঘষা একটুখানি সোনালী রঙ।

কোন সময়ে ঝড় বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না। কখন রানা কুম্ভ তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘ গর্জনের সঙ্গে কড়-কড় করে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপরে ঝকঝক করছে। রানা কুম্ভ ডাকলন, 'ওঠ!' দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন—মেয়েটির হাত ধরে। কুম্ভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানাকে খুন করেছ, রাজপুতের মেয়েকে চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে!'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'রানাকে?'

মৈর আস্তে-আস্তে বললেন, 'মকুলজীকে?'

কুম্ভ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই খুনের শাস্তি এই নাও।' দুখানা তলোয়ার একই সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি 'মা! বলে একবার ডেকে অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিবিয়ে দিলে! কুম্ভ জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজস্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাঠকুড়োনি রানীর দুই ছেলে, যাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানলেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন! আর সেই মেয়েটি জানলে না দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই বা সকালে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে—এ-তো নয় সে-তো নয়! এমনি নানা কথা কয়ে সবাই মিলে সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে-যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই বা সারা রাত চাচা, চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া বলে কেঁদে ডাকলেও কেউ সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেল্লা অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল, খুঁজে-খুঁজে চলে-চলে পা ধরে গেল, তবু তো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না!—কেন? কেন?

তারপর রানা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রানী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমনি। রতিয়া-রানার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে রূপ দেখে রানা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রানী স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে—রণছোড়জীর মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে—এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণছোড়জীর মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!'

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারি লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, 'মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ কর।'

এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তাঁর গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই এক-মনে কান-পেতে প্রাণ ভরে মীরার গান শুনতে থাকে—তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না। কাউকে মানেও না।

জোছনা-রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে-রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লির বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে, কে-এক উদাসীন কেউ বা আরো কত কি! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে যে রণছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু কুম্ভ-রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'এবারে ভক্তেরা আসুন মন্দিরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।' এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল!

মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন-দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুমধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুদ-শাকে তাঁর মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরাার মন রানা জয় করতে পারলেন না। মীরা বললেন, 'রানা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ করো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—'মীরা আয়!' আমাকে ছেড়ে দাও রানা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবন চলে যাই।' রানা রেগে বললেন, 'রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে—যেখান খুশি—আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।' সেই দিন চিতোরেশ্বরী মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিণীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রানীর খোঁজে।

মন্দুর-রাজকুমারের সঙ্গে ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের মেয়ের বিয়ে, বর আসছে ধুমধাম করে, এমন সময় রাণা কুম্ভ এসে ঝলকুমারীকে সভার মধ্যিখান থেকে কেড়ে নিয়ে চিতোরে আনলেন। একে মহারানা, তাতে কুম্ভ তাঁর উপর কথা কয় রাজস্থানে এমন তো কেউ নেই! কেবল বৃন্দাবনে মীরা যখন শুনলেন, মন্দুর-রাজকুমারের মুখে, রানা দুই প্রাণীর ভালোবাসার উপরে কি বিষম ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝলকুমারীর বরকে নিয়ে চিতোরে চললেন! রানার কাছে খবর পৌঁছল মীরা আসছেন। আর কেন আসছেন সেটাও শুনলেন কুম্ভ। রানা কড়া হুকুম দিলেন, 'ঝালোয়ান বাগানের মধ্যে ঝলকুমারীকে কড়া পাহারায় যেন বন্ধ রাখা হয়।' তারপর কুম্ভ

মীরাকে এক চিঠি পাঠালেন—চিতোরেশ্বরী মীরা, চিতোরেশ্বর তাঁকে পেলে সুখী হবেন। তিনি যা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, সেই স্ত্রী-রত্ন যেখানে বন্ধ আছে, সেই ঝালোয়ানের চাবিও রানা পাঠালেন! ইচ্ছা করলে বাগানের দরজা খুলে রানী মীরা ঝালকুমারীকে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মন্দুরের রাজকুমার যদিও বা কোনো উপায়ে ঝলোয়ানের বাগানে প্রবেশ করেন, কুমারীর দেখা পাবেন না নিশ্চয়। কেননা, রানার অন্দরে রানীর ছাড়া কোনো পুরুষের যাবার হুকুম নেই। যদি যায়, তবে মাথা বাইরে রেখে যায় এটা জানা কথা!

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আকাশে একটিমাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে, পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে, মন্দুরের রাজকুমারের উপরে ঝলকুমারীর জ্বলন্ত ভালোবাসা। ঠিক সেই সময় রানার চিঠি মীরা পেলেন। চিঠি পরে মীরা বুঝলেন, উপায় নেই। তিনি দুটি কথা রানাকে লিখলেন— 'প্রেম না করলরে, বিনা প্রেমসে প্রেম না মিললরে!' মীরা মন্দুরের রাজকুমারের হাতে ঝালোয়ানের চাবি দিয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন, আর মন্দুর-রাজকুমার ঝলকুমারীকে শেষ-দেখা দেখে নিতে বাগানে ঢুকলেন—আলো নিশানার দিকে চেয়ে।

সেই রাতকোটের কেল্লায়, অন্ধকার-রাতে দুটি বুড়ো আর একটি কচি মেয়ের ভালোবাসার প্রদীপ যেমন করে হঠাৎ নিবেছিল, আজও আবার তেমনি করে রানা কুম্ভ নিজের অন্দরে ঝলকুমারীর ভালোবাসার প্রদীপটি তলোয়ারের চোটে নিবিয়ে দিয়ে সকালে রাজসভায় এসে বসলেন! কারিগর এসে জোড় হাতে বলল, 'মহারানার কীর্তিস্তম্ভ শেষ হয়েছে! স্তম্ভের নাম কি, জানতে চাই। পাথরে খোদাই করতে হবে।'

কুম্ভরানা খানিক ভেবে বললেন, 'লেখগে যাও—কুম্ভশ্যাম।'

সংগ্রামসিংহ

রানা কুম্ভ অনেক লড়াই করেছিলেন, অনেক দেশও জয় করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুনঝুনের লড়াই যেমন, তেমন আর কোনো লড়াই হল না আর লড়াই ফতে হবার পর নাচ-তামাশা গান-বাজনা, আতসবাজি, আলো যেমন হতে হয়। একমাস চিতোর শহর রাতে দিন হয়ে গেল। কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটল। লড়াই জিতে আসবার পরদিন থেকে কুম্ভ হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে ফার্সি না আরবীতে কি জানি কি সাপের মন্তর না ব্যাঙের মন্তর আউড়ে তবে নিজের সিংহাসনে বসতে লাগলেন। শধু এক-আধ দিন নয়, এই কাণ্ড বরাবর চলল! রানা বুড়িয়ে গেলেন তবু তলোয়ার ঘোরানো আর মন্তর পড়া একটি দিন কামাই গেল না। রানার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ অবাক হয়ে যেত, কিন্তু কেন যে রানা এমন করেন সে কথা জানতে কেউ চেষ্টাও করত না। একবার রানার বড় ছেলে সভার মাঝে রানাকে শুধিয়েছিলেন—মাথার উপর তিনবার তলোয়ারখানা ঘোরাবার কারণটা কি, আর ওই সাপের মন্তরগুলোরই বা মানে কি? সেই দিন রানা কুম্ভ জবাব দিলেন, 'বারো ঘন্টার মধ্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাও, বাপ কি করেন, না করেন, সে খোঁজ ছেলের রাখবার কিংবা জানবার দরকার নেই।' তারপর তিনবার করে

ঠিক নিয়মিত রানার তলোয়ার মাথার উপরে ফিরতে লাগল কিন্তু হুকুম আর ফিরল না। রানার বড়-ছেলে রায়মল নির্বাসনে গেলেন, রইলেন কেবল ছোট-ছেলে সুরজমল আর মেজ-ছেলে—তার নাম রাজস্থানে কেউ কখনো করে না—'ঘাতীরাও' 'হাতিয়ারো' এমনি নানা নামে সে লোকটাকে ডাকে। এই 'ঘাতীরাও' বিষ খাইয়ে বুড়ো রানা কুম্ভকে মেরে চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজপুত প্রজারা এই বিষম ঘটনায় একেবারে খাপ্পা হয়ে খুনের শোধ খুনই ঠিক বলে স্থির করে রায়মলকে আবা সিংহাসন দেবার ফন্দি করলে। দিল্লিতে তখন প্রথম পাঠান সুলতান বহলোললোদী। তাঁর সঙ্গে 'ঘাতীরাও' কুটুম্বিতা করে, নিজের মেয়ের সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেবার ফন্দি করে, খুব শক্ত হয়ে চিতোরের সিংহাসনে বসে থাকার মতলব করছে, এমন সময় ইদর রাজ্য থেকে রায়মলকে রাজপুত সর্দারেরা খুঁজে বার করলেন। 'ঘাতীরাও' বড়-বড় সর্দারদের বড়-বড় জমিদারির লোভ দিয়েও নিজের দলে টানতে পারলে না। যে নিজের বাপকে খুন করতে পারে, রাজপুতের মেয়েকে পাঠানের বেগম করে দিতে চায়, তার দলে কোন রাজপুত থাকতে পারে? 'ঘাতীরাও' কাজেই গতিক খারাপ দেখে একদিন রাতারাতি সুলতানের দরবারে গিয়ে মেয়ের বিয়ের সব পাকা করে চুপি-চুপি আবার চিতোরে এসে বসবার মতলবে ঘোড়া ছুটিয়ে একা আসছে, এমন সময় পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হল।

এই অবসরে রায়মল চিতোর দখল করে বসলেন।

সুলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায়-বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে!

রায়মল, তাঁর তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল, আর একটি মাত্র ছোট ভাই সুরজমল এই চারজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন—তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়, দেশে রয়েছে শান্তি, আর সুখে রয়েছে রাজা-প্রজা সবাই—তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুর-বেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজী ভীম তালাওয়ের মাঝখানে জলের উপরে শ্বেত-পাথরের তাওখানায় আরাম করছেন। রাজকুমার তিনজন ছোট-খুড়ো সুরজমলের বাগান-বাড়িতে আড্ডা করেছেন আর তাশ, দাবা, গোলাপ-জলে ভিজানো খসখসের পাখা এমনি সব নানা কুড়েমি ও আয়েসির সরঞ্জামের মাঝে বসে এ-গল্প সে-গল্প চলেছে, কিন্তু বাইরে বইছে গরম বাতাস—এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই, ঘরের মধ্যেকার দেয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা রইলেন না।

এ-কথায় সে-কথায় কজনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে করে কোন-কোন পরগণা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কি বলে এমনি নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে পেলে প্রজারা সুখী হয়, দেশের ভালোও হয়—এই তর্ক উঠল! রানার মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরষ তেমন সাহসী; বড়ছেলে সঙ্গ দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন—শাদাসিদে ছোটখাটো মানুষটি ধীর-গম্ভীর বড়-

বড় টানা চোখ। ছোটছেলে জয়মল কাটখোট্টা, মোটা-সোটা যেন চেয়াড়ে গোছের, আর রানার ভাই, সুরজমল খুব সুপুরুষ নন খুব কদাকারও নন—অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক চোখ। তিন ভায়ে বিষম তর্ক বাধল সিংহাসন নিয়ে। পৃথ্বীরাজ বললেন, 'প্রজাদের হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পরে তো দেখে নিও আমাকেই রাজপুতেরা রাজা করবে।' জয়মল বলে উঠলেন, 'ওসব বুঝিনে। দেখছ এই হাতখানা। জোর যার মুলুক তার!' সঙ্গ, তিনি সবার বড়, একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চল চারণীদেবীর মন্দিরে গুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।' সুরজমল তিনজনকে ধমকে বললেন, 'আঃ এ সব কি কথা হচ্ছে? দাদা শুনলে রক্ষা থাকবে না। হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে নাড়াচাড়া কেন বাপু! একি সতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখনি রাজা উজীর মারছ? নাও, একটু গোলাপ-জল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা হও, থাক ওসব কথা।' কিন্তু বাইরের গরম তখন রাজকুমারদের মগজে চড়েছে ঠাণ্ডা হবে কে! সবাই উঠে বললেন, 'চল খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া, চারণীর কাছে গণিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা।'

বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ—গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্তুর, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা আর-একজন বেজায় সাহসী; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে-বলতে, ' শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার হুকুমে, নয়তো দুদিন পরে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে।'

পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, সেইজন্যে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি, তোমারও কপালে কি আছে দেখা চাই তো?'

সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক-একবার টোকা মেরে বললেন, 'গুণে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝছি সব ফোঁপরা।'

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানেই এক পাহাড় তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকারে গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যা পুজোর যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন, মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, 'কেমন, বলেছিলাম তো কপাল ফোঁপড়া! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল।' পৃথ্বিরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা হবে না, এখানে বসতে হবে, আরতির পর হাত গুণিয়ে তবে ছুটি!' একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ করে শব্দ করেই চুপ করল সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপর মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবার আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন চার মূর্তি। সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না—তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতদুটো কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠল না, নমস্কারও দিলে না, বসে-বসেই বললে, 'মাতাজী, গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে?'

সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালে হাত বোলাতে লাগলেন আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন দেখে পৃথ্বিরাজ বলে উঠলেন—'ভাবেন কি? বড় জরুরী কথা। বেশ করে ভেবে-চিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।' সঙ্গ বললেন, 'আগে চারণীর পুজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ওসব করো।'

'সেই ভালো। বলে সিদ্ধিকরী পুজোয় বসলেন।

তারপর চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথায় পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'রাজকুমারেরা একটা ইতিহাস বলি শোনো—পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা—বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসলেন, এমন সময় লক্ষ্মী সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, দেবী আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুইজনেই রাজাকে আর্শীবাদ করে বললেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার করো দেখি আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়?' বীণা হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, 'আমি বড়, না ও বড়?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বললেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়?' রাজা দেখেন বড় গোলযোগ—'এঁকে বড় করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন। রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোট রানী বলে উঠলেন—'ঠাকরুণরা রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার করে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন করে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন।'

রাজা বললেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' বলে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে বসে ছোটরানীকে বললেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে কিন্তু কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রানী ভিরঘুটি করে বললেন, 'বিচারের আমি কি জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী, তাঁদের শুধোও না। রাজা মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন। সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির-ধনন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুই প্রহর বাজাল কিছুই মীমাংসা হল না, দুই দেবীর বিচার কি হিসাবে করা যায়? সরস্বতীকে বড় বললে চটেন লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়। নবরত্নের মাসহারাও বন্ধ হয়! আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোট, লক্ষ্মীই বড়, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা,

বরাহমিহিরের পাঁজি পুঁথি, খনার বচন সবই মাটি। রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রানী দেখেন, রাজার নিদ্রা নেই, কেবল এপাশ-ওপাশ করছেন, যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তারপর—'

এমন সময় পৃথ্বিরাজ বলে উঠলেন—'ও গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রুপোর খাটে, ছোট-বড় বিচার আপনি হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার করে, আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?'

সিদ্ধিকরী একবার চারজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজের বিচার শেষ করে বসে আছ! সঙ্গ—যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে উনি ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন—রাজ্যেশ্বর! সুরজমল রয়েছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন—হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার। পৃথ্বিরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই!' এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন। চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল!

সর্ব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন, 'তাহলে?'

'তাহলে সিংহাসন কার এখানেই স্থির হয়ে যাক আজই! বলেই পৃথ্বিরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের চোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভাইয়ের রক্তপাত ঘটল। সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিনে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর এক দিকে—এঁর পিছনে উনি তাঁর পিছনে তিনি; অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথ রাঠোর সর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়ালে ঘেরা খামার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু মেঘে-ঢাকা আকাশে তখনো আলোর টান একটিও পড়েনি।

উঠোনের মাঝে মস্ত তেঁতুল গাছটার আগায় পোষা ময়ূরটা ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে আছে। গাছের তলায় হালের গরু দুটো মাটিতে পড়ে আরামে ঝিমচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কেবল সর্দারের ঘোড়া নিয়ে দরজার কাছে একটা ছোকরা-রাজপুত দাঁড়িয়ে আছে, সেই ঘোড়া এক-একবার ঘাড় নাড়ছে আর তারই মুখের লাগামে পরানো লোহার আংটা আর কড়াগুলো এক-একবার আওয়াজ দিচ্ছে—টিংটিং ঝিনঝিন। বিদা দূরগ্রামে পুজো দিতে যাবেন, তাই ভোর না হতেই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বার হবেন, এমন সময় দূরে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল—কে যেন তেজে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দেখতে-দেখতে রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ 'রক্ষা কর' বলে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, 'একি!

এমন দশা আপনার কে করলে?' সঙ্গ দু-কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দুজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন, কিন্তু জয়মল এখানো পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।' ওদিকে জয়মল আসছেন, একটা ঝড়ের মতো—মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছা তখনই তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে! সঙ্গ ইতস্তত করছেন দেখে বিদা বললেন, 'কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখব।' তাই হল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোট একটা কালো ফোঁটার মতো আস্তে-আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানি দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রাইলেন—তারপর ঘাড় নিচু করে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষানরা সকালে খেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বিরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন—তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে ঘোড়া পালকি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে, কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দুজনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেল, আর দুজন যে কোথায় তার খবরই হল না।

পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশি, অনেক তদবিরে তিনি সুস্থ হলেন।

মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, 'এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে কোরো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই চাও তো বড়-ভাইয়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করগে, তবে বুঝব, তুমি বীর-যাও!'

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, 'তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাক, চিতোরমুখো হয়ো না।'

সুরজমল তো নির্বাসনে যান।

এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিকবিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার

কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও প্রজারা পথ্বীরাজকে সত্যিই ভালোবাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না! দু-একজন করে ক্রমে একটি ছোট-খাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো। এমনি এদেশে-সেদেশে দল নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা-কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল গেল ফুরিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটানো ভার!। এখন একটা ছোট-খাটো রাজ্য জয় করে না বলতে পারলে আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহুরীর কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহুরী তাড়াতাড়ি টাকা-কড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বিরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'এ কি দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তা একটু লিখে পাঠালে হত, আংটিটা বাঁধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন?' পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, 'ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনো সম্বল নেই যে তোমার টাকা দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে। আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছো তো! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে!' পৃথ্বীরাজের দুঃখের কাহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল। সে দুইহাত জোড় করে বললে, 'কুমার, এই নিন টাকা। আমি আংটি চাইনে। আপনি আপানার প্রজা মহারানার নুন চিরকাল খাচ্ছি।' পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু এর পরে কি হবে? উঝা পৃথ্বীরাজেকে চুপিচুপি বললে, 'দেখুন মীনা-সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল করে বসুন। রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে।'

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা-সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন। রাজস্থানের মীনারা জংলী, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজে। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে, নদালা বলে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী—যশ, সিন্ধিয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় আর জহ্নুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন। সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন—এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সে আনন্দের দিনে মীনারায় বড়-বড় মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ করে তাদের ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বন-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথ্বীরাজ গদাওয়ারের শাসনকর্তা করে নিজের ধার শুধে আবার দিকবিজয়ে বার হলেন—রীতিমতো ফৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময় বেদনোরে টোডার রাজা রায় শুরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমা সুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই

যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাঁকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন—ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞ-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না। উলটে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপিচুপি শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে! বেশিদূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধরে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না। তিনি তলোয়ায় খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত ধরে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে, তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমতো। জয়মল মহারানার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত। কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন সবাই ভাবল এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, 'জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, চোর নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালেই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও শূরতানকে বল গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।'

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দুজনেই সমান সুন্দর, সমানে-সমানে মিলল। ইনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই। পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই। আর সেইদিন তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডাশহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক-নিশান আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুলদুল, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে! স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়া সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে-করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন ছজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে! আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখতে হল না। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে

প্রাণটা শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল—আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উলটে পড়লেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল—মুসলমানদের সঙ্গে। সেই অবসরে সুলতানের যত আমীর-ওমরা লুঙ্গি ছেড়ে, দাড়ি ফেলে, বিবি আর মুরগির খাঁচা লুকিয়ে নিয়ে রাতারাতি শহর ছেড়ে আজমীরের দিকে চম্পট দিল। সকালবেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল, নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ—ছেলের মতো ছেলে; মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন। মেবারের একেবারে শেষ সীমায় কমলমীর। এ সেই কেল্লা যেখানে লছমীরানী এতটুকু হাম্বিরকে নিয়ে বাস করতেন। কতদিন কেটে গেছে, কেল্লা শূন্য পড়েছিল; আর আজ আবার কত পুরুষ পরে পৃথ্বীরাজ-তারাবাই—বর আর বৌ—হাসি বাঁশি গান দিয়ে সেই পুরোনো কেল্লার শূন্য ঘরগুলি পূর্ণ করে দেখা দিলেন। এই বাপেতে-ছেলেতে বরেতে-বধুতে মিলন আর আনন্দের দিনে একসময় চিতোরে পৃথ্বীরাজ মহারানার সভায় বসে আছেন, সভা প্রায় ভঙ্গ হয়, মহারানা উঠি-উঠি করছেন—এমন সময় মালোয়া থেকে দূত এসে খবর পাঠালে এখনি মহারানার সঙ্গে দেখা করতে চাই! একসময় ছিল, যখন চিতোরের মহারানার সঙ্গে দেখা করতে হলে দিল্লীর বাদশার দূতকেও অন্তত পনেরো দিন মহারানার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কিন্তু আজ মালোয়ার দূত এসেই বুক-ফুলিয়ে, কোনো হুকুমের অপেক্ষা না রেখে মহারানার দরবারে ঢুকল। শুধু তাই নয়, লোকটা একেবারে মহারানার গা-ঘেঁসে বসে যেন সমানে-সমানে কথাবার্তা শুরু করে দিলে। দূতের এই আস্পর্ধা দেখে পৃথ্বীরাজ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খানিক বাজে বকে দুত বিদায় হবার পর পৃথ্বীরাজ ঐ মালোয়ার দূতকে এত ভয় আর খাতির করবার কারণটা মহারানাকে শুধোলেন। বুড়ো রানা পৃথ্বীরাজের পিঠে হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, 'বুঝলে না, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই দণ্ডহীন সিংহের মতো গাধাও আমাকে লাথি মারতে চাচ্ছে। তোমরা নিজেদের মধ্যেই ভায়ে-ভায়ে লড়তে ব্যস্ত রয়েছ, তাই আমাকে সবদিক ঠাণ্ডা রেখে, খুশি রেখে কোনো রকমে শান্তিতে নিজের আর প্রজাদের জমিজমা জরু-গরু সামলে চলতে হচ্ছে—আজ ক'বছর ধরে।'

পৃথ্বীরাজ বাপের কথার কোনো জবাব দিলেন না, কিন্তু বাপের কত যে দুঃখ, তা বুঝতে আজ তাঁর দেরি হল না! তিনি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে সভা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিজের দলবল নিয়ে সোজা মালোয়া রাজার রাজ্যে গিয়ে হাঁক দিলেন, 'যুদ্ধং দেহি।'

দুই দলে লড়াই বাধল। মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে মহা ধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময় ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন। মজলিস ভেঙে গেল—ঝাড়লণ্ঠনগুলোর সঙ্গে চুরমার হয়ে! নাচনী, গাইয়ে সবাই হাঁ-করে চেয়ে রইল—পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত সাহস দেখে।

রানার সেনাপতি তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজাচ্ছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ মালোয়াররাজেরই লিখন সেনাপতির কাছে দিয়ে পাঠালেন, 'আমি চিতোর চললে,—বন্দী হয়ে। কিন্তু খবরদার আমাকে ছাড়াবার চেষ্টাও কোরো না। তাহলেই আমার প্রাণ যাবে, এখনি এসে তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর, যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।'

রাজা-রাজড়ার কথা—সেনাপতি সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে শুকনো-মুখে একা পৃথ্বীরাজের শিবিরে হাজির হলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'রাজার প্রাণের জন্যে কোনো ভয় নেই; আমি ওঁকে চিতোরে নিয়ে যাচ্ছি, খুব যত্নেই রাখব আর সুস্থ শরীরেই ফিরিয়ে দেব? তোমাদের রাজার সেই হামবড়া দূতটাকেও ফিরে পাবে। মহারানা দূতকেও চান না বন্দীকেও নয় কেবল মালোয়ার কাছ থেকে যে নমস্কারটা তাঁর প্রাপ্য তাই তিনি আমাকে আনতে হুকুম দিয়েছেন। তাই তোমাদের রাজার একবার স্বশরীরে চিতোর যাওয়া দরকার। কিন্তু এখান থেকে কিংবা পথের থেকে যদি রাজাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কর, তবে ওঁর ধড়টিই শুধু ফিরে পাবে, মাথাটি গিয়ে পড়ে থাকবে চিতোরের মহারানার সিংহাসনের নিচেই—পা রাখবার পিঁড়িখানির ঠিক সামনেই!'

মহারানা সভায় বসে আছেন, পৃথ্বীরাজ মালোয়াকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল! সেই সময় একজন পৃথ্বীরাজের চর দূতের ঘাড় ধরে এনে বললে, 'শিখে নাও মহারানার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়—তোমার নিজের দেশের রাজার কাছে।'

দূত থরহরি কাঁপতে লাগল; তার কপাল বেয়ে কালঘাম ছুটল। মহারানা ব্যাপার বুঝে খুব খাতির করে মালোয়াকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর কিছুদিন চিতোরে আরামে থাকার পর মালোয়ার রাজা আর রাজদূত দুজনেই ছুটি পেয়ে দেশে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে কমলমীরে; সওযার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল—মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। সদ্‌রী, বাটেরা, নায়ি আর নিমচ, এর মধ্যে যত পরগণা সমস্ত দখল করে চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেখিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেইদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলের লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে-দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে। সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে পট্টি-বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন, যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পট্টিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলেম।'

সুরজমল একটু হেসে বললেন, 'হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম! যা হোক, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করনি?' পৃথ্বীরাজ হেসে বললেন, 'কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।' এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, 'আরে দেখচিসনে কে এসেছে। যা দৌড়ে আর এক থালা নিয়ে আয়!' দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বললেন, 'বুঝেছি সারংদেব এই একথালা বই আর কিছু পাঠায়নি; খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।' শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনেরবেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল। বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, 'আমাদের পুরানো ঝগড়াটা তাহলে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল?' সুরজমল হেসে বললেন, 'বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।'

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন—একটার পর একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে-করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন। দুই বিদ্রোহী তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিমচের জঙ্গলে বড়-বড় গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে খুব মজবুত-রকম বরোজ বানিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রইল। একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বনে গল্পগুজব করছেন—দুপুরবেলা বাইরে বনের মধ্যেটা শুনশান, কোনখানে ঘনপাতার আড়ালে বসে দুটো নীল পায়রা কেবলি বকম-বকম করছে—এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পৃথ্বীরাজ ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন। দুজনে ধস্তাধস্তি চলল। পৃথ্বীরাজ খুড়োকে কাবু করেছেন, এমন সময় সারংদেব দুজনের মাঝে পড়ে পৃথ্বীরাজকে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'কর কি! দেখছ না তোমার খুড়োর অবস্থা? কি রকম কাহিল, এক চড়ে উলটে পড়েন! দাও, ছেড়ে দাও বেচারাকে! সারংদেবের মোড়লি সুরজমলের মোটেই ভালো লাগল না, তিনি বুক ফুলিয়ে বললেন, 'দেখ সারংদেব, যে চাপড়টার কথা বললে সে চাপড়টা এখন আমার এই ভাইপোর হাত থেকে এলে আমি কাবু হব বটে, কিন্তু তোমাদের কারু হাত থেকে এলে এই কাহিল শরীরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, আর এক চাপড়ের বদলে তোমার নাকে দশটা ঘুঁষি বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। সরে দাঁড়াও, লড়তে হয় আমরা খুড়ো-ভাইপোতে পড়ব। মিটমাট করতে হয় তো আমরাই করব—বুঝেচ?' সুরজমলের তেজ দেখে পৃথ্বীরাজ অবাক হলেন, সারংদেব রেগে কটমট করে চাইতে-চাইতে বেরিয়ে গেলেন, ঝনাৎ করে সুরজমল নিজের তলোয়ার খাপে বন্ধ করে বললেন, দেখ পৃথ্বীরাজ, তোমাতে-আমাতে লড়াই—এতে আমি যদি মরি তোমার হাতে, তাতে কোনো দুঃখও নেই, ক্ষতিও নেই—ছেলে দুটো আমার উপযুক্ত হয়েছে, কিছু না জোটে তো মহারানার ফৌজে গিয়ে ভর্তি হবে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার মতো তারা অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে মর তবে শুধু যে আমার লজ্জার উপর লজ্জা, দুঃখের উপর দুঃখ পেতে হবে, তা নয়; দাদার পরে তুমি না থাকলে চিতোরের দশাটা কি হবে ভেবেছ কি? আমি লড়ব না। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু বন্দী করে যে আমায় নিয়ে যাবে তা হবে না।' সুরজমল যে চিতোরের সঙ্গে প্রাণে-প্রাণে এক, তা বুঝতে পৃথ্বীরাজের দেরি

হল না। তলোয়ার বন্ধ করে তিনি খুড়োকে প্রণাম করলেন। সুরজমল ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতদিনে আমার অদৃষ্টের লিখন একটু ফলল—তোমার হৃদয়-সিংহাসনের খুব কাছে আমি এলেম; এখন বাকি শুধু যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির এক টুকরোতে মাথা রেখে মরার ব্যবস্থা করে নেওয়া।' পৃথ্বীরাজ খুড়োর পাশে বসে সেই আগেকার মতো আবার হাসিমুখে শুধোলেন, 'আমি আসবার আগে তুমি কি করছিলে খুড়ো?'

'ছেলেদের রাজস্থানের ইতিহাস আর গল্প শুনিয়ে খানিক বাজে সময় কাটাচ্ছিলেম'—বলে খুড়ো হাসলেন।

পৃথ্বীরাজ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তাড়া করে আসতে পারি জেনেও সেজন্য সতর্ক না থেকে বেশ আরামে শুয়ে গল্প করছিলে?'

সুরজমল হেসে বললেন, 'লড়াই করা কি পালানো—এদুটোই করবার পথ তুমি বন্ধ করেছ, কাজেই ছেলেদের নিয়ে খোশগল্প করে সময় কাটানো ছাড়া করবার আর কি আছে বল?'

পৃথ্বীরাজ শুনে বললেন, 'কেন আমার সঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটা করে নেবার চেষ্টা কর না কেন!'

সুরজমল খানিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আগে হলে যেতেম কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে মাথা-গোঁজবার জায়গা চিতোরের বাইরে করে নেওয়াই ঠিক; আর তা হলেই ধড় এবং মাথা—দুটো নিয়ে কিছুদিন আরাম করা যেতে পারবে।' পৃথ্বীরাজ খানিক ভেবে বললেন, 'তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা হাজির না করে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে—তার কি বল।'

সুরজমল পৃথ্বীরাজের কানে-কানে বললেন, 'সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ না! বেশি সুখ্যাতি পাবে ওই মাথাটা নিলে।'

পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বরোজের মধ্যে সারংদেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি চোখ-রাঙিয়ে খুড়োকে বললেন, 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ?'

সুরজমল খানিক ভেবে বললেন, 'এস আমার সঙ্গে বাইরে, বড় মাথা না পাও, ছোট মাথাই নিও।' বনের মধ্যে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুরজমল একটা ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বললেন, ' দেখছ মন্দিরটা, ওখানে এক সময় নরবলি হত! বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে; দেবীও মানুষের কাঁচা মাথা অনেককাল পুজো পাননি, ওইখানে সারংদেব আমাকে পুজো করতে যেতে আজ ডেকে গেছে, কিন্তু আমার হয়ে ওখানে যেতে তোমার সাহস হবে কি?'

'খুব হবে!—বলেই পৃথ্বীরাজ সুরজমলকে নিজের পাগড়ি দিয়ে কষে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্দিরে ঢুকলেন। বেশি দেরি হল না, সারংদেবের কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে খুড়োর বাঁধন খুলে দিয়ে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে চিতোর চলে গেলেন। যে-সব পরগনা জয় করতে-করতে সুরজমল ফৌজের পায়ের তলায় প্রজার সুখ-শান্তি চূর্ণ করে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন, সেই নায়ি, বাটোরা, নিমচের রাস্তা ধরেই হেরে ফিরতে হল—

তাঁকে ঘাড় হেঁট করে। তিনটে বড়-বড় রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল, রইল কেবল একটুখানি সদ্রিপরগনা। কিন্তু সেটুকুও বেশিদিন থাকবে কি না সুরজমল ভাবছেন—এমন সময়ে একদিন দেখলেন গাঁয়ের ধারে মন্দিরের সামনে একটি ডালকুত্তা ছোট একটি ছাগলছানা শিকার করাবার চেষ্টা করতেই একটা রামছাগল তাকে টুঁ মেরে তাড়িয়ে ছানাটাসুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে সেঁধল। কুকুরটা মন্দিরের সামনে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল—কিন্তু ভিতরে ঢোকবার সাহস করলে না।

সুরজমল ঠিক করলেন এখানেই নিরাপদে থাকা যাবে—এই মন্দির হবে আমার ঘর, কেল্লা, সমস্তই। সেইদিন সুরজমল সদ্রি থেকে কারিগর ডাকিয়ে সেই মন্দির ঘিরে ছোট এক কেল্লা তুললেন তার চারিদিকে বাজার হাট বসালেন; সবশেষে 'দেওলা' গ্রাম মায় সমস্ত সদ্রিপরগনা আর কনখল পাহাড়ের উপর তাঁর কেল্লাটি পর্যন্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করে সমস্তটার নাম রাখলেন দেউলগড়। দেবতার কেল্লা তার উপর চড়াও হতে রানারও সাধ্য নেই, ষাট হাজার বছর নরকের ভয় আছে। সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে মরবার সময় পেলেন। তাঁর কপালের লিখন এমনি করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দুইজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে—সঙ্গ বেঁচে আছেন। শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদযোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনি নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধরবার জন্যে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্যে বার হবেন, এমন সময় শিরোহী থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছে, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাঁর ছোটবোন মারা যাবে। ছোটবোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি পড়ে, পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরে, বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে—কিন্তু যাওয়া হল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহীর মুখে—বোনকে রক্ষা করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক থেকে ঠিক উলটো মুখে—অনেক দূরে।

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহীর রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহীর রাজাকে ভুঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরলেন, 'দাদা থাক, প্রাণে মের না।' পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, 'এত বড় ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে। জানে না তুই মহারানার মেয়ে। ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।'

শিরোহীর তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা কর।'

পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নে, আমার বোনের জুতোজোড়া

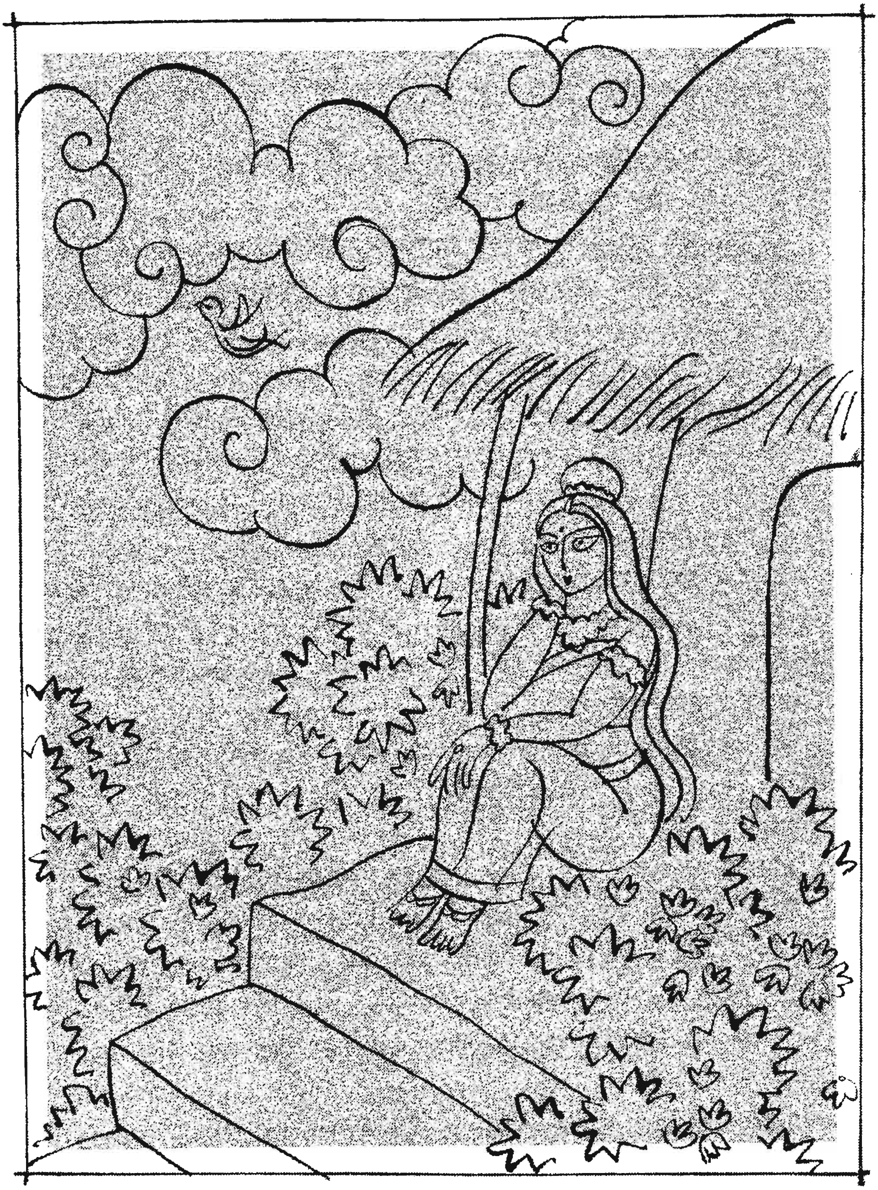
মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা—তবে রক্ষে পাবি।'

'একথা আগে বললেই হত' বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, 'থাক এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।'

রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা নাড়ু গুটিকতক আর জল খেতে দিলেন। শিরোহীর খাসা নাড়ু—অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না; শিরোহীর মতিচুর আর হীরেচুরে সেঁকোবিষ মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল—জুতো-তোলার শোধ নিতে!

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দুর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গে অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় বসে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে—'ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।'





শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়-বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো! তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট-ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে-ডালে গান গাইত, কোটরে-কোটরে বাসা বাঁধত। দলে-দলে হরিণ, ছোট-ছোট হরিণ-শিশু কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী-কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতকগুলি ঋষি-কুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতাদের অঞ্জলি দিত।

আর কি করত?

বনে-বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো-গাই ধলো-গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়ার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণু বাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত-কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল আঁধার ঘরের মাণিক ছোট মেয়ে—শকুন্তলা! একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল। বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে-বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে

নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে-তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে মা-গৌতমীর কোলে পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত-কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত-কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষি বালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন-কি—লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণ শিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকার মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবী লতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবী লতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কি কাজ ছিল?—হরিণ-শিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতা-বিতানে গুন গুন গল্প করা, নয়তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে-দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিনীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল দুষ্মন্ত।

সেকালের এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তর-দেশের রাজা, দক্ষিণ-দেশের রাজা—সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র-তের-নদী সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা রুপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস-দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার

রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল। যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল সেই দিন সাত-সমুদ্র তের-নদীর রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল-থাল লুচি-মণ্ডা, ভার-ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কি, রাজার আড্ডা।

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারি এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারের সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর দোলাতে-দোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে-বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হটহট করে চললেন। ক্রমে ক্রমে এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে-বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল সৈন্যসামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে-গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে-ফাঁকে কচিপাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফুলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল। মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল, তাড়া খেয়ে-শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভাল্লুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর

দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল-ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা-হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিলঃ আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন-গুন করে গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণ-শিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—উর্দ্ধশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজা অমনি ধনুঃশ্বর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা—দুজনে দেখা হল।

এদিকে মাধব্য কি বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক-পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়! পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়? বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সবাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রায়ে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়—ওই ভাল্লুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে!

ভয়ে-ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যের রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন। মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে-বনে 'হা শকুন্তলা! যো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তৃণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে। রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরচে।

আর শকুন্তলা কি করছে?—

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্ম-পাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর

করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায়-পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে-গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালা-বদল হল।

দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কি হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজে মোহর-আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কতদিন গেল, কত রাত গেল, দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না। পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটির দুয়ারে—দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথায় রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা-হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে-বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি রূপে এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলেন না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী,

একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সবাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্য আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতেই না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে, কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পরে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবে; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন। দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন। বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না।

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত-কণ্বের আনন্দের আর সীমা রইল না, তখনি, শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আহ্লাদের সীমানা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না; সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তার কি এই সাজ?—হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা খোঁপায় মল্লিকার ফুল পরনে বাকল!—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে?

—না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণ-শিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণ-শিশুকে তার-কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেখান থেকে তাত-কণ্ব ফিরলেন! দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—'দেখিস ভাই যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত-কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার জলে গা ভাসিয়ে নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক-কোণে থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারল না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে-ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত-ক্রোশ জুড়ে রাজার সাতমহল বাড়ি, তার এক-এক মহলে এক-এক রকম কাজ চলছে!

প্রথম মহলে রাজসভা—সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির—সেখানে সোনার দেয়ালে মাণিকের পাখি, মুক্তোর ফল পান্নার পাতা! মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অথিতিশালা—সেখানে সোনার থালায় দু-সন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে। তারপর, নৃত্যশালা—সেখানে নাচ চলছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া

তালে-তালে নাচছে।

সঙ্গীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজা-দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ,-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে, শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায় দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়-বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কি চাও? টাকা-কড়ি চাও, না, ঘর-বাড়ি চাও? কি চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, এ কি কথা? তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা?

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সে কি কথা? আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজ, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুনগুন গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে, কিছুতেই এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—দুইজনেই বনের প্রাণী কি না তাই এত ভাব! —শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে-বনে রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কতদিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জবনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে?

'যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে তোমার আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণ-শিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি

কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য! রাজার সেই সাত রাজার ধন এক-মানিকের বরণ-আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না।

'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী-মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল। অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমের স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল। শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রুপোলি রঙের সরলপুঁটি, চাঁদের মতো পায়রাচাঁদা, সাপের মতো বানমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটাভরা বাটা কত কি জালে পড়ল সোনালি রুপোলি মাছে নদীর পাড়, মাছের ঝুড়ি যেন সোনার রূপোয় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাচ পড়ল, তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল, জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে, জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ-পার ও-পার দু-পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিকরে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরিব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া-জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল। জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিল। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায়

হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে-কাঁপতে, কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে-নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলে। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকুন্তলা।—হা শকুন্তলা!' আহারে, বিহারে শয়নে স্বপনে কিছুতেই সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, অন্তঃপুরে সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই—কোথাও সুখ নেই।

সঙ্গীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবেন উৎসব বন্ধ হল।

রাজর দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোল-ভরা ছেলে নিয়ে হেমকুটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজা-দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধুলায় ধূসর হয়ে পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে, দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে রাজা রাজ্যে ফিরলেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়ই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত-ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তার রাজসিংহাসন। দুদিকে দুই হাতি। পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল, আর ছিল—শুক-পাখি তার প্রিয়সখা, কত মজার-মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশেরর গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালো বাসত। রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুণছিল। তাকে কোলে-পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত

ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহ-শিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজ-শিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজ-শিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ-শিশু তাঁরই পুত্র।

ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপরে কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ-অদিতিকে প্রণাম করে রাজরানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন। তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানী সেই তপোবনে তাত-কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণ-শিশু কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস-তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।





ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানী দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায় চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুকে-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ।

আর দুওরানী—বড়রানী, তাঁর বড় অনাদর অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুওরানী—ছোটরানী, তাঁরই ঘরে রাজা বারো-মাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস হয়ে গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটরানী—সুওরানী রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটরানীকে বললেন—রানী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কি আনব?

রানী ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন,—হীরের রঙ বড় শাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানী, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানী রাঙা-পা নাচিয়ে-নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানী গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো বড় ছোট, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারি এক ছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কি আনব রানী?

তখন আদরিনী সুওরানী সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন, —মা গো,

শাড়ি নয় তো বোঝা। আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানী, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানী হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটরানী হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন—মনে পড়ল দুঃখিনী বড়রানীকে।

দুওরানী—বড়রানী,ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়রানী, আমি বিদেশ যাবো। ছোটরানীর জন্য হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্য কি আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানী বললেন—মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়! তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার-হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানী হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারীর পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায়, সোনার শাড়িতে কি কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরিয়ে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাত মহল বাড়ি তো ফিরিয়ে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন—না রানী, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কি সাধ?

রানী বললেন—কোন লাজে গহনার কোথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্য পোড়ামুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানী, বিদায় দাও।

তখন বড়রানী—দুয়োরানী ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুওরানী নীল সাগরের পানে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিনী সুওরানী সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে-শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়রানীকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটরানীর

সেই হাসি-হাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানী কি করছেন? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানী কি করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন! এবার রানী সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানী, মালা গাঁথছেন, আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে-ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানীর চক্ষে ঘুম এল না।

সুওরানী—ছোটরানী রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়রানী রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো-মাস কেটে গেল।

তেরো-মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের সান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুওরানীর চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝঙ্কার—মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানী সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পারেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রূপো দিয়ে সুওরানীর গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে ছ'মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুওরানীর শখের শাড়ি কিনে নিলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটরানীর মানিকের চুড়ি সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন

রাজার মনে পড়ল বড়রানী বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর বড় ভুল হয়েছে। বড়রানীর বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে, লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটরানীর সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটরানী সাত-মহল বাড়ির সাত-তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানী ছোটরানীর সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানীর পাশে বসে বললেন,—এই নাও, রানী! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে! দেশের রানী সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানী, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানী, এক দেশে রাজার মেয়ে এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, এক দিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানী, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ!

রানী তখন দু'হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানীর হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানী তখন দু'পায়ে দশ গাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল; দু'পায়ে যেতে দশ-গাছা মল সানের উপর খসে পড়ল। রানী মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানীর গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানী ব্যথা পেলেন!

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে-বহরে কম পড়ল। রানীর চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটরানী আট-হাজার মানিকের আট-গাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশ-গাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা, শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন,—ছাই গহনা! ছাই এ-শাড়ি! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন দেশের ধুলো বালিতে এ-মল গড়ালে? ছি,ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই।

রানী অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন-মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকান-পাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানা-কড়ি দিয়ে একটা বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটরানীর গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে-শাড়ি, সে-গহনা রানীর গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি পরতে পারে না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ, যাকে বৌ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী, বানরটা বলে কি? ছেলেই হল না বৌ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটরানীর নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানীর নতুন শাড়ি বুনতে দাওগে। এ-গহনা এ-হাড়ি রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ; যদি বৌ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটরানীর নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়রানীর কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়রানী, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কি আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানীর কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়রানীর কোলে বাঁদর-ছানা দিয়ে বললেন—মহারানী, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটরানীর সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। তোমার এ-ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে, সেখানে তা তো নেই। রানী, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনে শাড়ি দিয়েছি, ছোটরানী পায়ে ঠেলেছে; আর কানা-কড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানী, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও। আমি আবার আসব রানী। কিন্তু দেখো, ছোটরানী যেন জানতে না পারে! তোমার কাছে এসেছি শুনেলে আর রক্ষে রাখবে না। হয় তোমায়, নয়তো আমায় বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়রানীকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন। আর বড়রানী সেই ভাঙা ঘরে দুধ-কলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটরানীর সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন-যায়; আর বড়রানীর ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল! বড়রানীর যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটাচালের ভাত, মোটাসুতোর শাড়ি আর ঘুচলো না। বড়রানী সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথী বনের বানরকে কোলে নিয়ে ছোটরানীর সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়রানীকে যখন দেখে তখনি রানীর চোখে জল, একটি

দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কিসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানী বললেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটরানী আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে যাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমায় কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বৌ হলুম সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাধ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এজন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানীর গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনী হয়েছি! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে-বলতে রানীর চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানীর কোলে উঠে বসে, চোখের জল মুছে দিয়ে রানীকে বললে—মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাবো, তোর সাতমহল বাড়ি দেবো, সাতখানা মালঞ্চ দেবো, সাতশো দাসী ফিরিয়ে দেবো, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানী করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেবো, তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানীর চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানী কেঁদে-কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে-তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কি তপস্যা করে কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানী করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক, আমার সতীন সুখে থাক, আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্য-সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে—না মা, আমার কথা না-শুনলে ঘুম যাব না।

রানী বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি—শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে ঘুম যা।

বানর রানীর বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানী ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটরানীর সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়রানীর জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নহবৎ বাজল, রাজারানীর ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজালে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে রাজ-দরবারে নেবে গেলেন—আর ছোটরানী সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়রানী কি করলেন?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানী উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন ওপাশ দেখলেন—বানর নেই, ! রানী এ-ঘর খুঁজলেন, ও -ঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন,—বানর নেই! বড়রানী কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানীকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজ-দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানীর বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাই-সান্ত্রীর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কি? একথা কি সত্য? বড়রানী দুওরানী, তার ছেলে হবে? দেখিস এ-কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুওরানীকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন। বানর নাচতে নাচতে—ভাঙা ঘরে দুওরানী পড়ে-পড়ে কাঁদছেন—সেখানে গেল।

দুওরানীর চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে—এই দেখ মা, তোর জন্যে কি এনেছি, তুই রাজার রানী, গলায় দিতে হার পাসনে কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর।

রানী বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন—এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার! যখন রানী ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ-হার কোথায় পেলি? বল বানর, রাজা কি এ-হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললে—না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানী বললেন—তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি?

বানর বললে—ছি-ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সু-খবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানী বললেন—ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কি সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না-পোয়াতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি!

বানর বললে—মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম—রাজামহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইতো রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানী বললেন,—ওরে, রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন। হায় হায়, কি করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কি সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি!

বানর বললে—মা তোর ভয় কি, ভাবিস কেন? এ দশমাস চুপ করে থাক। সবাই জানুক—বড়রানীর ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানী বললেন—চলো বাছা চলো। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানী ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটরানীর ঘরে গেলেন।

ছোটরানী কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে-বসে ভাবছেন এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন—আরে শুনেছ ছোটরানী, বড়রানীর ছেলে হবে! বড় ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে সে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানী, বড় ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানী বললেন—পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন—সে কি রানী? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, একথা শুনে মুখ-ভার করে? রানী, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানী বললেন—আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে সিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচলো তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে-বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটরানী আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড় রাগ হল রাজকুমারকে ছোটরানী মর বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানীতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটরানীর মুখ দেখলেন না, বড়রানীর ঘরেও গেলেন না—ছোটরানী শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়রানীকে প্রাণে মারে! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন

একমাস গেল, দুমাস গেল, দুমাস গিয়ে তিনমাস গেল, রাজা-রানীর ভাব হল না। ঝগড়ায়-ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুওরানীর পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন—কি হে বানর, খবর কি?

বানর বললে—মহারাজ, মায়ের বড় দুঃখ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন—একথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনি সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন সোনার থালে সোনার বাটিতে বড় রানীকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়রানীও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে গেলেন। আর রানীর বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানীর কাছে এল।

রানী বললেন—আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধবো কখন? খাব কখন?

বানর বললে—মা, আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানী নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলোজন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে ষোলোশো বাঁশ নিলে। সেই ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুওরানীর বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানীর ভাঁত নিয়ে এল; ষোলো মোহর বিদায় পেলে।

দুওরানী নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন—নতুন ঘর। ঘরের চাল নুতন! চালের খড় নতুন। মেঝেয় নতুন কাঁথা। আলনায় নুতন শাড়ি! রানী আবাক হলেন। বানরকে বললেন—বাছা,ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বললে—মা, রাজা-মশায় মোহর দিয়েছেন! সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল।

রানী খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানী রাজভোগে খান আর ভাবেন—আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন,কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে-ভয়ে এক মাস, দুমাস, তিন মাস গেল। বড়রানীর নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন—কি বানর, কি মনে করে?

বানর বললে—মহারাজ, ভয়ে কবো না নির্ভয়ে কবো?

রাজা বললেন—নির্ভয়ে কও।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড় দুঃখ পান, ঘরের দুয়ার ফাটা, চালে খড় নেই, শীতের হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে কাপড় পান না, আগুন জ্বালাতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন—তাইতো তাইতো! একথা বলতে হয়। বানর, তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে—মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটরানী বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন—সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানীকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটরানী আসতে পারবে না। সে মহলে বড়রানী থাকবেন, বড়রানীর বোবা-কালা দাই থাকবে, আর বড়রানীর পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে—মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন—যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গো।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিন বড়রানীর নতুন মহল সাজালেন।

দুওরানী ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটরানীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী—ছোটরানীর 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটরানী বলে পাঠালেন—মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে।

রানী ডেকেছেন—ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানী বললেন, —এস ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটরানীর পাশে বসে বললে—কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার-ভার চোঠের কোণে জল, হয়েছে, কি?

রানী বললেন—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সতীন আবার ঘরে ঢুকেছে, সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানী হয়েছে! ভিখারিনী দুওরানী এতদিনে সুওরানীর রানী হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতীনের এ আদর প্রাণে সয় না।

ব্রাহ্মণী বললে—ছি! ছি! সই। ও কথা কি মুখে আনে! কোন্ দুঃখে বিষ খাবে? দুওরানী আজ রানী হয়েছে, কাল ভিখারিনী হবে, তুমি যেমন সুওরানী তেমনি থাকবে।

সুওরানী বললেন—না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুওরানীর ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য পাবে! লোকে বলবে, আহা দুওরানী রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুওরানী মহারাজার সুওরানী হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারা দিন উপোস যায়! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে—চুপ কর রানী, কে কোনদিকে শুনতে পাবে! ভাবনা কি? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুওরানীকে খেতে দিও। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানী বললেন—যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে-না-খেতে বড়রানী ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে—ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়রানীকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুঁজে-খুঁজে ভর সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটরানী সেই বিষে মুগের নাড়, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়লেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন—ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়রানীকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়রানীর নতুন মহলে গেল।

বড়রানী বললেন—আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুওরানী বলে কি ভুলে থাকতে হয়?

ডাকিনী বললে—সে কি গো! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কি ভুলতে পারি? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানী দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দুহাতে দুমুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে-হাসতে চলে গেল।

রানী ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন—ব্রাহ্মণী আমায় কি খাওয়ালে! গা-কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে—চল্ মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানী উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানী চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা সানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানীর মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে—রানী অজ্ঞান, অসাড়!

বানর সোনার প্রতিমা বড়রানীকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কি লতাপাতা, কোন্ গাছের কি শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়রানীকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল—বড়রানী বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে পড়তে রানীর মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লস্কর, দাসী-বাঁদী যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে—মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়রানীর মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন, তিন রাত বড়রানী অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়রানী চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে—মহারাজ, বড়রানী সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন—চল বানর, বড়রানীকে আর বড়রানীর ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে—মহারাজ, গণনা করেছি—ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়রানীকে দেখে এস ছোটরানী কি দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন—বিষের জ্বালায় বড়রানীর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, পাতাখানার মতো পড়ে আছেন, রানীকে আর চেনা যায় না!

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটরানীকে প্রহরী-খানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন—মন্ত্রীবর, আজ বড় শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে-পথে আলো জ্বালাও, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়াও দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারী না থাকে।

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে-পথে আলো দিলেন, ঘরে ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পুজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন—দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও!

বানর বললে—মহারাজ, আগে ছেলের বৌ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটোয় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল! কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু—বাঁকাধনু, দুটি চোখ টানা-টানা, দুটি ঠোঁট হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।

বানরকে ডেকে বললেন—ছেলের বৌ ঠিক করেছি, কাল শুভদিন শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে—মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন—দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানীর ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন-মহলে বড়রানীর কাছে গেল।

বড়রানীর ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন—ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কি ছলে ভোলাব!

বানর এসে বললে—মা গো মা, ওঠ, চেলীর জোড়, মাথার টোপর আন, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানী বললেন—বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কি ছলে ভোলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতীন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে-ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কোন আর পাপের বোঝা বাড়াস! তুই রাজাকে ডেকে আন, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে—রাজাকে পাব কোথা? দু-দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড় অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস যেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানী বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলীর জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন, জরির জুতো পায়ে দিলেন।

বানর চুপি-চুপি ক্ষীরের বর পালকিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু'খানি ছোট পা, দু-পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল। ষোলো জন

ষোলো জন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানী আঁধার পুরে একলা বসে বিপদ-ভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঢাকি-ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী—সারারাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগনগরে এসে পড়ল।

দিগনগরে দীঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে-পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে-ছুটে বেদম হল, কাহার পালকি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দীঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলেন। দীঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে—মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম—বরকে যেন কেউ না দেখে। আজকের দিনে বর দেখলে বড় অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন, দীঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টার গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুণের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুণ কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুণের কালো বেড়াল মিউ মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পালকির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠী ঠাকরুণ ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! ছটফটি রেখে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পালকির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগনগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগনগরে ষষ্ঠীরদাস যেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগনগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকরুণ, দিন-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুণ বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দীঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানীর বানর! আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদবেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগনগরে দীঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে-ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে—ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও, চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখ পোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দীঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোন দিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে—কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীরদাস যেঠের বাছাদের দেখতে পাব! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে পথে-ঘাটে, গাছের ডালে সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী! একদল কাঠের ঘোড়া টকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দীঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়াচ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো মারামারি, হাসিকান্না! সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য। সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো। সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে-গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু-নাচেন! নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে-মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদুং ঝাঁঝর বাড়ি গিয়ে ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে-ঝাঁকে টিয়ে পাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচমেচ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সেই দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এসেছে। কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে।—এমন সময় টাপুর-টুপুর বৃষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের

দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে কোন্ পাড়ার ছেলের কোলে করে গেল পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোন বাগে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন আর সেই টিকটিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকো বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন, বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন; বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছেন, কালো-কালো, চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে, ঘাটের দু-পাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি ন্যাজে ভর দিয়ে টিয়ে আসছিল, সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে-নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে—ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে। অমনি ষষ্ঠীতলায় সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুবে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিনসে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আমকাঁটালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে-যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদরগুলো নাচতে-নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল—দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল।

বানর দেখলে—কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুণ, কোথায় কে? বটতলায় দীঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পালকি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যেবেলা দিগনগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে-বসে রাজা ভাবছেন—বানর এখনো এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে—না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে—আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে। রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে—কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু-গুরু ঢোল বাজিয়ে পোঁ-পোঁ বাঁশি বাজিয়ে টক্‌বক্ ঘোড়া হাঁকিয়ে ঝমমক আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শী বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে—বর কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বৌ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানী দু-দিন দু-রাত কেঁদে-কেঁদে ভেবে-ভেবে ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন—ষষ্ঠীঠাকরুণ বলছেন, রানী, ওঠ চেয়ে দেখ, তোর কালের বাছা ঘরে এল। রানী ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে—ওঠ গো

রানী ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বৌ-বেটা বরণ করগে!

রানী পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বৌ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষিরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন, ছেলের জন্য ভেবে-ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটরানী বুক ফেটে মরে গেল।





জন্ম ৭ আগস্ট ১৮৭১ জোড়াসাঁকো, কলকাতা।
রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্যতম প্রতিভাবান পুরুষ। প্রিন্স দ্বারকানাথের প্রপৌত্র, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ। চিত্রশিল্পী হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত।
রেখায় ও লেখায় তাঁর স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করেছে।
সাহিত্যের ধারায় বয়স্ক পাঠকের জন্য যেমন ঘরোয়া ভাষায় স্মৃতিকথা লিখে গেছেন (ঘরোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারে), তেমনই শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখেছেন অজস্র মণিমুক্তোর মতো গল্প, নাটক, রূপকথা, কবিতা, যাত্রাপালা। তাদের মধ্যে বুড়ো আংলা, নালক, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই—ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারত-শিল্প, শিল্পায়ন প্রভৃতি।
প্রয়াণ ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১।

প্রচ্ছদ **সুব্রত মাজি**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ

নালক। বুড়ো আংলা। রাজকাহিনী। শকুন্তলা। ক্ষীরের পুতুল



শ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ভারতী